মাসুদ রানা

আদিম আতঙ্ক

কাজী আনোয়ার হোসেন

NAEEM

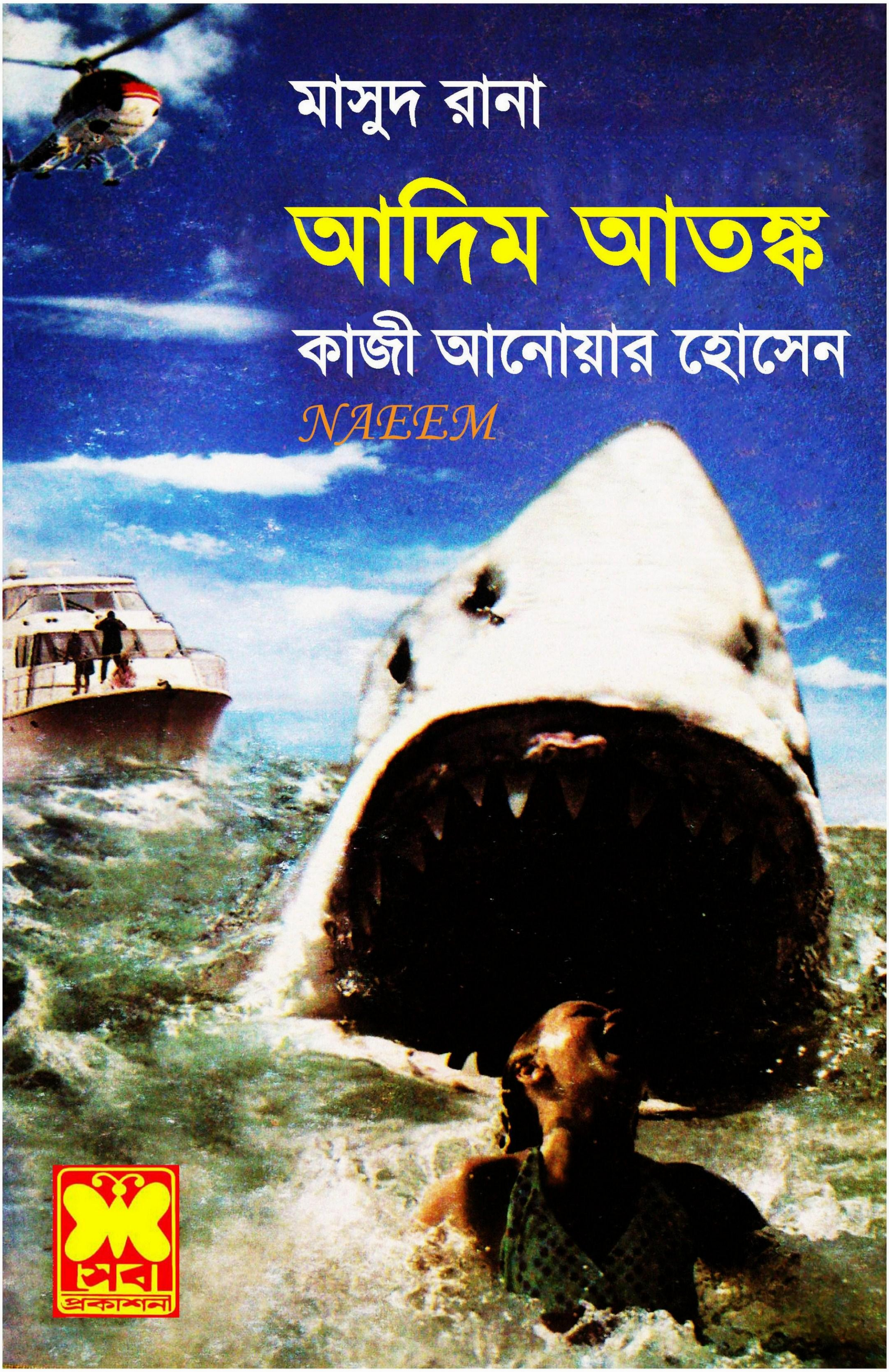

সেবা প্রকাশনা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Banglapdf.net EXCLUSIVE

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

SCANNED BY NAEEM

EDITED BY NAEEM

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৪৩০

আদিম আতঙ্ক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7430-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-430
ADIM ATANKA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

এক শ' চোদ্দ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোন ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

ফুরিয়ে এল মেসোযোইক আমল, উর্বর মাটিতে ঘন হয়ে গজিয়ে ওঠা লতাগুলো ফুটতে শুরু করেছে হরেক রঙের ফুল

সত্তর মিলিয়ন, মানে, সাত কোটি বছর আগের কথা।

এশিয়ামেরিকার উত্তর প্রান্ত।

এখানে শক্ত জমির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে উত্তাল মহাসাগর।

ভোরের মৃদু হাওয়ায় কেটে যাচ্ছে ভারী, ধূসর কুয়াশা।

সাগরতীরে চরছিল একপাল শান্টুংগোসরাস – হঠাৎ করেই ওদের মনে হলো, কে যেন তাকিয়ে আছে হিংস্র, লোলুপ দৃষ্টিতে। বড় ভয় ওদের, যদিও ওরাই তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে বিশাল সরীসৃপ, হ্যাড্রোসর। পদে পদে বিপদ এই অতিকায় প্রাণীদের।

হাঁসের ঠোঁটের মত চঞ্চুর প্রান্ত থেকে শুরু করে লেজ পর্যন্ত জানোয়ারগুলো লম্বা ঝাড়া চল্লিশ ফুট। ব্যস্ত এখন মস্ত পেট ভরানোর কাজে। সৈকতে ভেসে আসা বাদামি কেল্প ও সামুদ্রিক শৈবালের অভাব নেই, প্রতিটা জোয়ারের সঙ্গে এসে জমছে ওগুলো।

একপাল হরিণের মতই কয়েক সেকেণ্ড পর পর খাওয়া ছেড়ে মাথা তুলছে হ্যাড্রোসরগুলো, ভীষণ নার্ভাস। কান পেতে শুনছে চারপাশের আওয়াজ, চট্ করে দেখে নিচ্ছে একটু দূরের গহীন অরণ্য। ওখানে কালচে রঙের প্রাচীন সব প্রকাণ্ড গাছ, নীচে ঘন ঝোপঝাড়। ওদিকে আবারও কিছু নড়ে উঠলেই বিপদ সম্পর্কে নিশ্চিত হবে ওরা, দেরি না করে ছুট লাগাবে প্রাণপণে।

সৈকতের কাছে ঘন অরণ্যে, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু মেলে ওদের দিকে চেয়ে আছে আরেক ডাইনোসর—টির‍্যানোসরাস রেক্স। খিদে লেগেছে তারও।

ওটা স্থলভূমির ভয়ঙ্করতম মাংসাশী প্রাণী। ওর হাত থেকে রক্ষা নেই কারও। এখন জঙ্গল থেকে লোভী চোখে দেখছে হ্যাড্রোসরগুলোকে। উচ্চতা তার বাইশ ফুট। মুখ থেকে ঝরঝর করে ঝরছে লালা। বিপুল অ্যাড্রেনালিন প্রবাহ থরথর করে কাঁপাচ্ছে ওটার পিছনের পাদুটোর শক্তিশালী মাংসপেশিগুলোকে।

এইমাত্র বড়সড় দুটো হ্যাড্রোসর নেমেছে অগভীর পানিতে, চঞ্চু ডুবিয়ে দিয়েছে ঘন কেল্পের স্তূপে।

আর তর সইল না আট টনি খুনির, ঝোপ ডিঙিয়ে এক লাফে বেরিয়ে এল খোলা জায়গায়, মাটি কাঁপিয়ে ধুপধাপ আওয়াজ তুলে ছুটল নিরীহ প্রাণীগুলোর দিকে।

পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে পড়িমড়ি করে সৈকতের দুইদিকে ছুটল হ্যাড্রোসরগুলো, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল ওরা। কিন্তু অগভীর পানিতে নামা দুই সরীসৃপ একটু দেরিতে টের পেল, ওদের লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে ভীতিপ্রদ আততায়ী।

মস্ত হাঁ করেছে টি. রেক্স, বেরিয়ে এসেছে তীক্ষ্ণধার দাঁত, সামনের ছোট দুই পায়ের থাবায় ক্ষুরের মত ধারালো নখ। হৃৎপিণ্ড জমিয়ে দেয়া বিকট এক গর্জন ছাড়ল, চাপা পড়ল তীরে ঢেউ ভাঙার আওয়াজ।

ইন্দ্রিয় জানিয়ে দিল দুই হ্যাড্রোসরকে, যেভাবে হোক এর নাগালের বাইরে থাকতে হবে। ঝট্ করে ঘুরে গেল ওরা, জান বাঁচাতে ছুট দিল গভীর পানি লক্ষ্য করে। অল্পক্ষণ পরেই পায়ের নীচ থেকে হারিয়ে গেল মাটি, সাঁতার কাটতে লাগল দীর্ঘ ঘাড় সোজা করে। পানির ওপর তুলে রেখেছে মাথা।

দুই তৃণভোজীর পিছনে ঝপাস্ আওয়াজে সাগরে নামল টি.

রেক্স, এগুতে লাগল গভীর পানির দিকে। প্রায় পৌঁছেই গেছে শিকারের কাছে, এমনসময় সাগরের কাদাটে জমিতে আটকা পড়ল ওটার পিছনের দুই ভারী পা। হ্যাড্রোসরের মত ভাসতে পারে না সে, অতি ওজনের কারণে সাঁতারও কাটতে পারে না।

নরম কাদার ভেতর আটকে গেছে সে।

তিরিশ ফুট গভীর পানিতে সাঁতরাচ্ছে দুই হ্যাড্রোসর। কিন্তু নৃশংস এক শিকারির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এখন পড়তে চলেছে আরেক দানব শিকারির খপ্পরে।

খুব ধীরে সাগরের বুকে ভেসে উঠেছে ছয় ফুট উঁচু ধূসর ডরসাল ফিন, হ্যাড্রোসরগুলোর দিকে মসৃণ গতিতে এগিয়ে আসছে ওটার মালিক। প্রকাণ্ড শরীরের কারণে পানিতে তৈরি হয়েছে জোরালো স্রোত, সে স্রোতের টান আরও গভীর পানিতে নিয়ে যাচ্ছে হ্যাড্রোসরগুলোকে।

হঠাৎ করেই টের পেল ও-দুটো, ক্রমেই মন্দের দিকে চলেছে পরিস্থিতি। আত্মা চমকে গেল দুই হ্যাড্রোসরের। বুঝে গেল, ভাগ্য ভাল থাকলে হয়তো টিরানোসরাসের কবল থেকে রক্ষা পাবে, কিন্তু গভীর পানিতে অপেক্ষা করছে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর সত্যিকারের নিশ্চিত মৃত্যু।

ঝট্ করে বাঁক নিল দুই হ্যাড্রোসর, জান বাজি রেখে সাঁতার কাটতে লাগল। কয়েক মিনিটে পৌঁছেও গেল পরিচিত পরিবেশে। পায়ের নীচে এখন মাটি।

বজ্রপাতের মত রক্ত হিম করা হুঙ্কার ছাড়ল টির‍্যানোসরাস রেক্স, ডুবে গেছে বুক পর্যন্ত। সাগর তলের নরম কাদা পিছলে দিচ্ছে ওকে, ক্রমেই চলেছে আরও গভীর পানির দিকে।

দু'পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল দুই হ্যাড্রোসর, টি. রেক্স থেকে পনেরো গজ দূরত্ব রেখে। লাফিয়ে গিয়ে একটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল টি. রেক্স। খটাৎ-খটাৎ আওয়াজ তুলছে শক্তিশালী

চোয়াল, রাগে পাগল হয়ে একের পর এক গর্জন ছাড়তে লাগল ওটা। চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তার সাধের শিকার!

ছোট সব ঢেউ ডিঙিয়ে সৈকতে উঠল দুই হ্যাড্রোসর। এতই ক্লান্ত, ওখানেই শুয়ে পড়ল উষ্ণ বালিতে। চোখ রাখল টি. রেক্সের উপর। পরিষ্কার জানে, আরেকটু হলেই মারা পড়ত ওই হিংস্র জানোয়ারের কবলে পড়ে।

এখন পানি থেকে জেগে আছে শুধু টির‍্যানোসরাস রেক্সের প্রকাণ্ড মাথা। প্রচণ্ড খেপেছে সে, কাদা থেকে দুই পা তুলতে আছড়ে চলেছে পুরুষ্টু লেজ। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর হঠাৎ করেই থেমে গেল সে, ভীত চোখ রাখল সাগরে। কালো পানি চিরে ধূসর কুয়াশার ভিতর দিয়ে আসছে মস্ত এক ডরসাল ফিন।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা কাত করল টি. রেক্স, জমে গেল বরফের মূর্তির মত। দেরিতে বুঝেছে, চলে এসেছে তারচেয়ে ঢের বড় এক শিকারির রাজ্যে। জীবনে প্রথম ও শেষবারের মত প্রচণ্ড ক্ষমতাধর টির‍্যানোসরাস টের পেল, ভীষণ ভয় লাগছে তার।

স্থলভূমির সবচেয়ে শক্তিশালী দানব সে, কিন্তু সাগরে যে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাধর, আরও হিংস্র শিকারী আছে, জানে সে। ডুবে মরার থেকেও বেশি ভীতিকর সেটা।

পৃথিবীর সত্যিকারের সম্রাট সে, কারকারোডন মেগালোডন।

টির‍্যানোসরাসের লাল দুই ভীত চোখ অনুসরণ করছে ধূসর ডরসাল ফিনকে। পানির নীচের টান থেকে টের পেল, আসছে সে বিশাল শরীর নিয়ে। কাদাটে পানির কাছে এসে ডুবে গেল পাখনা। চাপা গর্জন ছাড়ল টি. রেক্স, কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখতে চাইছে ওদিকটা। তারপর আবারও দেখা দিল উঁচু ডরসাল ফিন, এবার সোজা ছুটে এল টি. রেক্সকে লক্ষ্য করে।

ভয় পেয়ে গর্জন ছাড়ল টি. রেক্স, কাদা থেকে ছুটিয়ে নিতে চাইছে দুই পা, বারবার খপাৎ-খপাৎ খুলছে ও বন্ধ করছে

চোয়াল।

সৈকত থেকে দেখছে দুই শান্টুংগোসরাস, ওগুলোর চোখের সামনে কীসের যেন ঝট্‌কা খেয়ে উড়াল দিল টি. রেক্স, পরক্ষণে ঝপাস্ করে পড়ল গভীর পানিতে। ঢেউয়ের নীচে ডুবে গেল ওটার প্রকাণ্ড মাথা। পরক্ষণে আবারও ভেসে উঠল ডায়নোসর, শুরু করেছে ভীষণ করুণ আর্তনাদ। মস্ত শিকারির চোয়ালের চাপে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে তার পাঁজরের খাঁচা। তাজা রক্তের ধারা ছিটকে বেরুল টি. রেক্সের খোলা মুখ দিয়ে।

শক্তিশালী টির‍্যানোসরাস রেক্স টুপ করে ডুবে গেল লালচে পানির নীচে। দীর্ঘ এক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল, শান্ত রইল সাগর।

সৈকতের বালি ছেড়ে উঠে পড়ল দুই হ্যাড্রোসর, রওনা হলো অরণ্য লক্ষ্য করে। আর ঠিক তখনই আবারও ঝট্ করে ঘুরতে হলো ওদেরকে, সাগরে তৈরি হয়েছে জোরালো এক বিস্ফোরণ। চোয়ালে টি. রেক্সকে নিয়ে উঠে এসেছে প্রকাণ্ড ষাট ফুটি শ্বেত-হাঙর। নিজ দেহের এক তৃতীয়াংশ আকারের শিকার মুখে নিয়ে ভাসতে চাইছে ঢেউয়ের উপর। ওটার শক্তি অকল্পনীয়, চোয়ালে ধরে ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁকাতে শুরু করেছে মৃত সরীসৃপকে। নয় ইঞ্চি ক্ষুরধার দাঁতগুলো থেকে নানাদিকে ছিটকে গেল লালচে ফেনা ও ছিন্নভিন্ন মাংসখণ্ড। এক সেকেণ্ড পর মৃত শিকার নিয়ে আবারও ঝপাস্ করে সাগরে নামল মেগালোডন, চারপাশে তৈরি হলো উঁচু ঢেউ।

উষ্ণ জলের ভিতর আরাম করে টি. রেক্সের লাশ চিবুতে শুরু করেছে মেগালোডন, কারও সাহস নেই ওই মড়ির ভাগ চাইবে। কোনও সঙ্গী নেই তার, শাবকও নেই, চিরকালের একাকী প্রাণী কারকারোডন মেগালোডন। প্রয়োজনে সঙ্গী খুঁজে নিয়ে মিলিত হবে, আর শাবক জন্ম নিলেই দেরি না করে ব্যস্ত হয়ে উঠবে সেটাকে খুন করার জন্যে। তার রাজ্যে সে সম্রাজ্ঞী। একমাত্র ভয়,

আরও বড় কোনও মেগালোডনকে। সে সম্ভাবনা যদিও খুবই কম। খাবারের অভাব নেই, তাই নিজেরা মারামারি ওরা কমই করে।

ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা পরিবেশ পাল্টে যাওয়ার কারণে নিশ্চিহ্ন হয়েছে প্রকাণ্ড সব সরীসৃপ ও আদিম স্তন্যপায়ীরা। কিন্তু সংখ্যায় স্বল্প হলেও হয়তো নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়েছে কারকারোডন মেগালোডন, হারিয়ে যায়নি পৃথিবীর বুক থেকে। হয়তো আজও দূর-সাগরে গভীর জলের নীচে রয়েছে তাদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য।

দুই

হেমন্তের শেষ। নভেম্বর মাস।

সন্ধে সাতটা পঁয়তাল্লিশ।

জন্স ইন্সটিটিউট, গ্রেগ রনসন অডিটোরিয়াম।

লা জোলা, ক্যালিফোর্নিয়া।

এখনও উপস্থিত হননি আজকের বক্তা। যার যার সিটে বসে আছে ছয় শ' শ্রোতা, চেয়ে আছে মঞ্চের দিকে, অথবা আলাপ করছে পাশেরজনের সঙ্গে।

সামনের সারিতে বসে আনমনে কী যেন ভাবছে সুঠামদেহী, এক বাঙালি যুবক। পাশে বসা এক জাপানি সুন্দরী। একই সঙ্গে অডিটোরিয়ামে আসেনি ওরা। স্রেফ কপাল তাদেরকে বসিয়ে দিয়েছে পাশাপাশি। এবং একমিনিট পেরুবার আগেই ওরা টের

পেয়েছে, চুম্বকের মত কাছে টানছে দুজন দুজনকে। যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ চলছে ওদেরকে ভিতর।

যুবক ঘুরে তাকালেই চট্ করে মুখ সরিয়ে অন্যদিকে চাইছে মেয়েটি। আবার যুবক মুখ সরিয়ে অন্য দিকে চাইলে কয়েক মুহূর্ত পরেই টের পাচ্ছে, ওর ওপর চোখ সুন্দরী তরুণীর।

ওরা এসব নিয়ে ভাবছে বলেই খেয়াল করল না, মঞ্চে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বক্তা, ডক্টর নাসিম আহমেদ।

'একবার ভাবুন: বিশাল এক শ্বেত-হাঙর, দৈর্ঘ্যে ওটা পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুট। ওজন চল্লিশ হাজার পাউণ্ড।' একটু থামলেন তিনি, চোখ রাখলেন শ্রোতাদের উপর। হঠাৎ স্থির হলো তাঁর চোখ, দেখতে পেয়েছেন প্রথম সারিতে বসা পরিচিত কাউকে।

'আমারও ভাবতে কষ্ট হয়, সত্যিই একসময় ছিল ওই দানব,' আবারও শুরু করলেন তিনি। 'ওটার প্রকাণ্ড মাথা ছিল ডজ র‍্যাম পিকআপের চেয়েও বড়। চোয়ালে একসঙ্গে পুরে নিতে পারত পূর্ণবয়স্ক চারজন মানুষকে। এবং এখনও বলিনি তার দাঁত সম্পর্কে: ওগুলো ছিল ক্ষুরের মত ধারালো, দৈর্ঘ্যে ছিল সাত থেকে নয় ইঞ্চি। উপর অংশ ছিল খাঁজ-কাটা স্টিলের স্টেক নাইফের মত।'

ডক্টর নাসিম আহমেদের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে বাঙালি যুবক। আর সেই সুযোগে মুগ্ধ চোখে ওকে দেখে নিল জাপানি মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত পর লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে গেল ওর দুই ফর্সা গাল। চট্ করে চোখ ফেরাল বক্তার দিকে। জানল না, আড় চোখে ওকে দেখে নিয়েছে যুবক। মনে মনে প্রশংসা করছে তার মোহনীয় রূপের।

সাঁইত্রিশ বছর বয়সী বাঙালী প্যালিয়োনটোলজিস্ট ডক্টর নাসিম আহমেদ চুপ হয়ে গেছেন। বুঝতে দেরি হয়নি তাঁর, কেড়ে নিয়েছেন ছয় শ' শ্রোতার পূর্ণ মনোযোগ। গত দু'বছর এই

ইন্সটিটিউটে বক্তৃতা দেননি। আশা করেছিলেন একের পর এক প্রশ্ন উঠবে। কিন্তু একটা কথাও বলছে না কেউ। তাঁর থিয়োরি নিয়ে প্রচুর মতানৈক্য রয়েছে। যেমন আছে সমালোচক দল, তেমনি আছে সমর্থক দলও। আবারও কথা শুরু করবার আগে সামান্য ঢিল করে নিলেন শার্টের কলার, তাতে একটু স্বস্তি পেলেন।

'পরের স্লাইড, প্লিয? ...হ্যাঁ, ধন্যবাদ। ...এটি শিল্পীর আঁকা ছবি। এতে দেখছেন ছয় ফুট দৈর্ঘ্যের ডাইভার, পাশে ষোলো ফুট দৈর্ঘ্যের এক শ্বেতহাঙর। আরেকদিকে ষাট ফুটি কারকারোডন মেগালোডন। আশা করি বুঝতে পারছেন, কেন বিজ্ঞানীরা ওই প্রজাতিকে অন্য শিকারি প্রাণীর রাজা বলে মেনে নিয়েছেন?'

পডিয়ামের একপাশে রাখা পানির গ্লাস নিয়ে চুমুক দিলেন নাসিম, ওটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'সাগরে পাওয়া ফসিল হয়ে যাওয়া মেগালোডনের দাঁত প্রমাণ করে দিয়েছে, কেন সত্তর মিলিয়ন বছর আগে সাগরগুলোতে রাজত্ব করত ওই প্রজাতি। অবাক হওয়ার কিছু নেই: সাড়ে ছয় কোটি থেকে সাড়ে চার কোটি বছর – এই দুই কোটি বছরের মধ্যে পৃথিবীর বুকে যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় এসে অসংখ্য প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, সে দুর্ভাগ্য কোনভাবে এড়িয়ে গেছে এরা। সত্যি বলতে, আমাদের হাতে মেগালোডনের এমন দাঁত আছে, যা থেকে আঁচ করা যায় এই প্রজাতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে মাত্র এক লক্ষ বছর আগে। জিয়োলজিকাল দৃষ্টিতে পৃথিবীর আয়ু মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা ধরলে, তার মাত্র এক সেকেণ্ডও নয় এই এক শ' হাজার বছর।'

মাথার উপর হাত তুলেছে পঁচিশ বছর বয়সী এক গ্র্যাজুয়েশন ছাত্র। 'প্রফেসর আহমেদ, সত্যিই যদি মেগালোডন এক শ' হাজার বছর আগে পর্যন্ত টিকে থাকে, তো হঠাৎ করেই বিলুপ্ত হলো কী করে?'

মৃদু হাসলেন নাসিম। 'খুবই ভাল প্রশ্ন। সত্যিই, প্যালিয়ো-জগতে এটা মস্ত এক রহস্য। একদল বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন, মন্থরগতি বড় মাছগুলো মারা পড়ায় খাবারের অভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে ওরা। আজকের ছোট এবং দ্রুতগামী মাছের সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় জিততে পারেনি মেগালোডন। আরেক থিয়োরিতে বলা হয়েছে, সাগরের তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় ঝাড়ে-বংশে শেষ হয়েছে ওই প্রজাতি।'

সামনের সারিতে মাথার উপর হাত তুললেন বয়স্ক এক ভদ্রলোক। তাঁকে চিনতে পারলেন নাসিম। জন্স ইন্সটিটিউটে যখন চাকরি করতেন, ইনি তখন কলিগ ছিলেন। এ লোক তাঁর থিয়োরির সত্যিকারের কট্টর সমালোচক।

'প্রফেসর আহমেদ, আমরা বরং শুনি আপনার থিয়োরি। আমাদেরকে খুলে বলুন কীভাবে হারিয়ে গেল কারকারোডন মেগালোডন।'

ভদ্রলোক থেমে যেতেই গুঞ্জন উঠল অডিটোরিয়াম জুড়ে।

শার্টের কলার আরেকটু ফস্কা করে নিলেন নাসিম। আজকাল সুট ব্যবহারই করেন না। এখন যেটা পরেছেন, এটার বয়স প্রায় বারো বছর। গলা খাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন তিনি, 'যাঁরা আমাকে চেনেন, বা আমার কাজের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানেন, বেশকিছু বিষয়ে বেশিরভাগ প্যালিয়োনটোলজিস্টের সঙ্গে আমি একমত নই। বহু প্যালিয়োনটোলজিস্ট প্রচুর সময় ব্যয় করে থিয়োরি দাঁড় করান, কেন নির্দিষ্ট একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমি আমার থিয়োরি অনুযায়ী কাজ করি। আমি ধরে নিই, বিলুপ্ত প্রাণী এখনও জগতে টিকে থাকতে পারে।'

এবার উঠে দাঁড়ালেন বয়স্ক প্রফেসর। 'স্যর, তা হলে কি আপনি বলতে চান, কারকারোডন মেগালোডন এখনও সাগর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে?'

জোর গুঞ্জন উঠল অডিটোরিয়ামে।

বিজয়ীর ভঙ্গিতে চারপাশ দেখে নিয়ে সিটে বসলেন প্রফেসর।

নীরবতার জন্য অপেক্ষা করলেন নাসিম, তারপর বললেন, 'না, প্রফেসর, আমি শুধু বলতে চাই, সমস্ত বিলুপ্ত প্রাণীর বিষয়ে বিজ্ঞানী হিসেবে আমরা নেতিবাচক ভঙ্গিতে তদন্ত করছি। ধরা যাক কয়েক দশক আগের কথা। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলেন, লোব-ফিনড্ সিলাকান্থ মাছ সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু আপনি জানেন, উনিশ শ' আটত্রিশ সালে এক জেলে দক্ষিণ আফ্রিকায় গভীর সাগর থেকে তুলে আনল জীবিত সিলাকান্থ। আজকাল এসব বিলুপ্ত প্রাণীর 'জীবিত ফসিল' দিব্যি চলেফিরে বেড়াচ্ছে বিজ্ঞানীদের চোখের সামনেই, তবু মেনে নিতে তাঁদের কষ্ট হয়।'

গুঞ্জন শুরু হতেই আবারও উঠে দাঁড়ালেন বয়স্ক সমালোচক প্রফেসর।

'প্রফেসর আহমেদ, আমরা সিলাকান্থ আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচিত, কিন্তু পানির মাত্র পাঁচ ফুট গভীরে বিচরণ করা কোনও মাছের সঙ্গে বিস্তর তফাৎ আছে ষাট ফুটি মস্ত শিকারি মাছের!'

চট্ করে একবার হাতঘড়ি দেখে নিলেন নাসিম আহমেদ। ধক্ করে উঠল বুক, শিডিউলের অনেক পিছনে পড়ে গেছেন। 'আপনার কথা ঠিক, প্রফেসর, কিন্তু আমি জোর গলায় বলব: আমাদের উচিত নয় নেতিবাচক ভাবে চিন্তা করা। কেন একটি প্রজাতি বিলুপ্ত হবে না, এটা না ভেবে চিন্তা করা উচিত: বিশাল সাগরের কোথাও না কোথাও ওরা রয়ে যেতে পারে।'

হাল ছাড়বার লোক নন বয়স্ক প্রফেসর। 'আবারও আপনার কাছে জানতে চাই, স্যর, আপনি মেগালোডন সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করেন।'

আবারও শুরু হয়েছে গুঞ্জন।

হাতের চেটো দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছলেন ডক্টর নাসিম আহমেদ। বুঝতে পারছেন, তাড়াতাড়ি সারতে হবে বক্তৃতা, বেশি দেরি করলে ওঁকে খুন করবে অ্যানি। 'বেশ, আপনি যখন জানতে চাইছেন,' বললেন তিনি। 'বিজ্ঞানীদের থিয়োরি সঠিক বলে মনে করি না আমি। দ্রুতগামী মাছ ধরতে ব্যর্থ হয়ে হারিয়ে গেছে মেগালোডন, এ আমি বিশ্বাস করি না। আদিম মেগালোডনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় শ্বেত-হাঙরের কনিকাল টেইল ফিন পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই, ওটার সৃষ্টিই হয়েছে পানির ভিতর দিয়ে তীব্র গতি তুলে ছুটবার জন্যে। এ ছাড়াও আমরা জানি, মাত্র এক শ' হাজার বছর আগেও সাগরে ছিল মেগালোডন। আমরা জানি, সাগরে রয়েছে নানান ধরনের মন্থর-গতি তিমি; তো কেন খাবারের অভাব হবে মেগালোডনের?

'অবশ্য, আমি অন্যদের সঙ্গে একমত, সাগরের তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই ভয়ঙ্কর খুনি প্রজাতি। ...এবার, প্রফেসর, আপনার কোনও আপত্তি না থাকলে পরের স্লাইড দেখব আমরা। ...আমি দুঃখিত, কিন্তু আরেকটা চিত্র।'

এবারের স্লাইডে দেখা গেল গত তিন শ' মিলিয়ন বছর জুড়ে কয়েকটা আলাদা মানচিত্র।

'এই ম্যাপগুলো দেখিয়ে চলেছে প্রধান সাতটি টেকটোনিক প্লেট। ওগুলোর উপর ভর করে ক্রমেই সরছে এ গ্রহের মহাদেশগুলো। এখন এই ম্যাপে...' মাঝের ডায়াগ্রাম দেখালেন ডক্টর আহমেদ, 'এটাতে দেখা যাচ্ছে কেমন ছিল চল্লিশ মিলিয়ন বছর আগের পৃথিবী। এই যে, দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে সরে দক্ষিণ পোলের দিকে চলেছে অ্যান্টার্কটিকা। ওটা যখন সরে যেতে লাগল, পোলের কাছের সাগরে ভীষণ বাধাগ্রস্ত হলো স্বাভাবিক তাপ। পানিতে ছড়িয়ে গেল তাপ, আর কমতে লাগল

মহাদেশের মাটির তাপ। শীতল হতে লাগল জমি, এরপর জমতে লাগল জমির ওপর তুষার ও বরফ। ফলে কমে যেতে লাগল প্রতিটি সাগরের তাপমাত্রা। আপনাদের অনেকেই জানেন, তাপমাত্রার কারণে বদলে গেছে সাগরের মাছ প্রজাতির বাসস্থান।

'আর এবার সাগরের তাপ কমে যেতেই ভারী হয়ে উঠল ট্রপিকাল স্রোতগুলো, হয়ে উঠল আরও লবণাক্ত। বইতে লাগল অনেক গভীর দিয়ে। ফলে আরও শীতল হয়ে উঠল সাগরের উপরের অংশ।

'এখন, ফসিলাইয্‌ড্ মেগের দাঁত দেখে আমরা জেনেছি, ওই প্রজাতি বাস করত উষ্ণ জলে। এমন হতেই পারে, শীতল জলে মানিয়ে নিল তাদের খাবার অর্থাৎ মাছ, চলে গেল তারা গভীর সব ট্রপিকাল স্রোতে। আমরা জানি, পঁয়ষট্টি থেকে চল্লিশ মিলিয়ন বছরের ভেতর আবহাওয়ার পরিবর্তনে বিলুপ্ত হয় ডায়নোসর, সেই সঙ্গে অনেক প্রজাতির মাছ। কিন্তু সে-সবই এড়িয়ে গেল কারকারোডন মেগালোডন।

'অবশ্য, দুই মিলিয়ন বছর আগে, নতুন করে আবারও শুরু হলো বরফ-যুগ। এই ডায়াগ্রাম দেখুন, যে গভীর ট্রপিকাল কারেন্টের কারণে প্রচুর খাবার পেত মেরিন স্পিশিযগুলো, হঠাৎ করেই তাদের খাবারে ভয়ঙ্কর টান পড়ল। আর এ কারণে দ্রুত মরতে লাগল আদিম সব মাছ। তাদের সঙ্গেই বিলুপ্ত হলো কারকারোডন মেগালোডন, নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারল না কোনওভাবেই। আর এসব হলো শুধু সাগরের তাপমাত্রা কমে যাওয়ায়।'

সিট থেকে গলা উঁচিয়ে বললেন বয়স্ক প্রফেসর, 'তা হলে, প্রফেসর আহমেদ, আপনি বিশ্বাস করেন পরিবেশ ও তাপ পাল্টে যাওয়ায় বিলুপ্ত হয়েছে মেগালোডন।' তৃপ্তি নিয়ে হাসলেন তিনি।

'আমি ঠিক তা বলিনি,' বললেন নাসিম। 'আমি আমার

থিয়োরি থেকে সরিনি একচুল। আমাদের চোখের আড়ালে রয়ে যেতে পারে যে-কোনও প্রজাতি। আজ থেকে আট বছর আগে আমি যোগ দিই এক বৈজ্ঞানিক টিমে, তাদের কাজ ছিল সাগরের গভীর খাদে গবেষণা করা। সাগরের গভীরে এসব খাদ ছিল হেইডাল যোনে। আমরা বিজ্ঞানীরা ওই এলাকা সম্পর্কে খুব কমই জানি। ওখানে আমরা আবিষ্কার করি, গভীর সাগরের ওসব খাদ ছিল দুটো সামুদ্রিক প্লেটের মাঝে। ওই দুই প্লেটের একটা মিশে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে। এমন হলে তাকে বলা হয় সাবডাকশন। এসব খাদের ভিতর ছিল লক্ষ লক্ষ হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট। ওখান থেকে বেরোয় নানান ধরনের মিনারাল। কোথাও কোথাও পানির তাপমাত্রা সাত শ' ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্তও দেখা গেছে। আমরা ওখানে আবিষ্কার করলাম, প্রশান্ত মহাসাগরে এমন সব গভীর এলাকা রয়েছে, যেখানে তলদেশ ছুঁয়ে ছুটছে ট্রপিকাল স্রোত। আর এসব জায়গায় হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের কারণে দেখতে পেলাম অকল্পনীয় সব নতুন জীব। এমন সব মাছ ও প্রাণী, যাদেরকে অনেক আগেই বিলুপ্ত বলে ঘোষণা দিয়েছি আমরা বিজ্ঞানীরা।'

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন মাঝবয়সী এক মহিলা। 'আপনারা কি ওখানে মেগালোডন আবিষ্কার করেছেন, প্রফেসর?'

মৃদু হাসলেন নাসিম।

হাসতে শুরু করেছে শ্রোতারাও।

সবার গুঞ্জন মিলিয়ে যাওয়ার পর নাসিম বললেন, 'না, ম্যাম। কিন্তু আপনাকে দেখাতে পারি অন্য কিছু। ওটা পাওয়া গেছে মাত্র এক শ' বছর আগে। হয়তো আগ্রহী হবেন।' এবার পডিয়ামের পিছন থেকে বের করলেন জুতোর বাক্স আকৃতির একটা কাঁচের কেস। 'এই দেখুন কারকারোডন মেগালোডনের ফসিলাইযড় একটা দাঁত। বিচকমার ও স্কুবা ডাইভাররা প্রায়ই এসব পায়।

কিছু আছে যেগুলো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর আগের। তবে অন্য কারণে বিশেষত্ব আছে এর, এটিই মেগালোডনের দাঁতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আগে আবিষ্কৃত হয়। আঠারো শ' তিয়াত্তর সালে পাওয়া গেছে এটা। বিশ্বের প্রথম সত্যিকারের এক্সপ্লোরেশন ভেসেল ব্রিটিশ এইচএমএস চ্যালেঞ্জার আবিষ্কার করে। খেয়াল করলে দেখবেন, এই দাঁতের ম্যাংগানিস নডিউল অন্যরকম।' জিনিসটার উপর লেপে আছে কালো কী যেন। 'কিছুদিন আগে এই দাঁতের ম্যাংগানিস অ্যানালিসিস-এ দেখা গেছে, প্লেইসটোসেন আমলের শেষে বা হলোসেন আমলের শুরুর দিকে বেঁচে ছিল এটার মালিক। অন্য কথায় এই দাঁত মাত্র দশ হাজার বছর আগের। পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর খাদ ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের চ্যালেঞ্জার ডিপ থেকে তুলে আনা হয়েছে এটা।'

হৈ-চৈ শুরু করে দিয়েছে শ্রোতারা।

'প্রফেসর! প্রফেসর আহমেদ!'

সবার চোখ চলে গেল অডিটোরিয়ামের প্রথম সারির দিকে। ওখানে হঠাৎ করে উঠে দাঁড়িয়েছে সুন্দরী সেই জাপানি মেয়ে।

ওর দিকে চাইলেন ডক্টর আহমেদ, তাঁর মনে হলো মেয়েটি পরিচিত। ওর পাশে যে যুবক বসে আছে, তাকে তো ভাল করেই জানেন, স্নেহও করেন ছোট ভাইয়ের মত।

'হ্যাঁ, বলুন,' বললেন নাসিম। সবাইকে চুপ করতে হাতের ইশারা করলেন।

'প্রফেসর, তবে কি আপনি বলতে চান এখনও বিলুপ্ত হয়নি মেগালোডন?'

এ কথাই জানতে চাইছে সবাই। চুপ হয়ে গেল প্রত্যেকে।

'থিয়োরেটিক্যালি, দুই মিলিয়ন বছর আগেও ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে বিচরণ করত মেগালোডন প্রজাতি। টিকে ছিল হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের উত্তাপের কারণে। যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলে যে-কেউ

বুঝবে, ওদের এখনও টিকে থাকা মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। দশ হাজার বছর আগের এই ফসিল অন্তত তা-ই বলছে।'

ছোট একটা ছেলেকে পাশে নিয়ে বসেছেন এক মাঝবয়সী লোক, হাত তুললেন তিনি। 'প্রফেসর, সত্যিই যদি এসব দানব জীবিত থাকে, তো আমরা তাদেরকে দেখতে পাই না কেন?'

'খুবই ভাল প্রশ্ন,' মাথা দোলালেন ডক্টর নাসিম, কিন্তু আর কিছু না বলেই হঠাৎ করেই চুপ হয়ে গেলেন।

অডিটোরিয়ামের মাঝের আইল ধরে সূর্যের মত জ্বলতে জ্বলতে আসছে অপূর্ব রূপসী স্বর্ণকেশী এক শ্বেতাঙ্গিনী, যেন পাগল কোনও কবির প্রথম প্রেমের কবিতা। রাধার ভরাট স্তনের বর্ণনা দিয়ে অমর হয়েছেন আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাস, সেই তাঁর কলমও যেন হোঁচট খেয়ে থেমে যেত ওই মেয়ের গিরিখাদের চিত্র আঁকতে গিয়ে। বয়স হবে তার পঁচিশ থেকে সাতাশ। ক্ষীণ কটি, প্রতি পদক্ষেপে ভীষণ দুলে উঠছে গুরুনিতম্ব। ক্লাসিক টোপায ইভনিং গাউনের চেরা অংশ দিয়ে হাঁটার সময় বেরিয়ে আসছে দীর্ঘ, ফর্সা, সুডৌল উরু।

যুবতীর পিছনে এক লোক, চকচকে চুলগুলো পনিটেইল করা। পরনে দামি টুক্সেডো।

প্রথম সারির রিযার্ভ করা দুটো খালি সিটে বসে পড়ল ওরা।

স্ত্রী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে সিটে বসতে দেখে চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডক্টর নাসিম আহমেদ। আবারও মনোযোগ ফিরিয়ে আনলেন মাঝবয়সী ভদ্রলোকের দিকে। 'সরি, আপনার প্রশ্ন ছিল: আমরা কেন দেখতে পাই না মেগালোডন। জবাবে আমি বলব, ওরা বাস করে সাগরের সবচেয়ে গভীর অঞ্চলে, ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে। ট্রপিকাল পরিবেশ থেকে উঠে আসতে পারে না। কারণ, ওপরে রয়েছে বরফের মত ঠাণ্ডা পানি, পুরো ছয় মাইল।

'তা ছাড়া, অন্য মাছ বা স্তন্যপায়ীদের মত মারা গেলে

ভেসেও ওঠে না মেগালোডন বা হাঙর। সাগরের পানির চেয়ে ভারী ওদের দেহ। শরীরের কাঠামো হাড় নয়, কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি। তলিয়ে যাওয়ার পর পচে যায়, পড়ে থাকে শুধু দাঁতগুলো। সে কারণেই কোনও মেগালোডনের হাড় পাই না আমরা। বহুকাল পরে স্রোত ও ঢেউয়ের ধাক্কায় ধাক্কায় ওদের ফসিলাইয্ড্ দাঁত উঠে আসে সৈকতে।'

স্ত্রীর চোখে চোখ পড়ল নাসিমের। রাগে জ্বলছে অ্যানির নীল দুই চোখ। 'ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ সম্পর্কে আরও একটি কথা না বললেই নয়। মাত্র দু'বার ওই খাদে নেমেছে মানুষ। ওই দুই এক্সপিডিশন্ হয়েছিল উনিশ শ' ষাট সালে। ব্যবহার করা হয় ব্যাথিসক্যাফ। তার মানে, ডাইভাররা সরাসরি নেমেছেন, তারপর আবারও উঠে এসেছেন। চারপাশ ঘুরবার বা দেখবার উপায় ছিল না তাঁদের। সত্যিকার অর্থে দেখা হয়নি খাদ।

'আমরা দেখতে পাচ্ছি বহু হাজার কোটি মাইল দূরের গ্যালাক্সিগুলোকে, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের ওই সাত মাইল গভীর ও সাড়ে পনেরো শ' মাইল দীর্ঘ এলাকা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি আমাদের পক্ষে।'

স্ত্রীর দিকে চাইলেন নাসিম। উঠে দাঁড়িয়েছে অ্যানি, হাতঘড়ি দেখিয়ে ইশারা করল।

'লেডিজ অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, এবার আমাকে ক্ষমা করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে একটু দীর্ঘ হয়ে গেছে এই বক্তৃতা। এবার আমাকে...'

'এক্সকিউয মি, ডক্টর আহমেদ,' আবারও মুখ খুলল জাপানি সুন্দরী। যেন বেশ বিরক্ত। 'শুনেছি, আপনি মেগালোডন নিয়ে গবেষণা শুরু করার আগে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে মার্কিন নেভির হয়ে সাগরের গভীরে সাবমারসিবল নিয়ে যেতেন। ওটাই ছিল আপনার নেশা, টাকাও পেতেন মেলা। ছড়িয়ে পড়েছিল

সুনাম, তারপর একদিন হঠাৎ করেই ওই কাজটা ছেড়ে দেন। ...আপনি কি আমাদের বলবেন কী কারণ ছিল সরে আসার?'

সরাসরি প্রশ্নে বিব্রত বোধ করছেন নাসিম। নিচু স্বরে বললেন, 'কাজটা ছেড়ে দেয়ার ব্যক্তিগত কারণ ছিল।' সবার উপর চোখ বুলালেন। কেউ হাত তুলতে পারে।

'একমিনিট, ডক্টর, আমি জানতে চাই,' আবারও বলল মেয়েটা, 'কোনও কারণে কি ভয় পেয়েছিলেন আপনি? যে জন্যে আর কখনও সাবমারসিবলের ককপিটে ওঠেননি?'

'আপনার নাম কী, মিস?'

'মানামি সিনোসুকা। আপনি বোধহয় চেনেন আমার বাবা তামেশু সিনোসুকাকে। উনি সিনোসুকা ওশনোগ্রাফিক ইন্সটি-টিউটের প্রধান।'

'হ্যাঁ, ভাল করেই চিনি,' মাথা দোলালেন নাসিম। 'কয়েক বছর আগে লেকচার সার্কিটে পরিচয় হয়।'

'হ্যাঁ, উনিই।'

'ঠিক আছে, মিস মানামি, এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করতে পারছি না। তবে এটা বলতে পারি, আমার মনে হয়েছিল সাগরের গভীরে সাবমারসিবলের পাইলটিং বাদ দিয়ে মেগালোডনের মত আদিম আতঙ্কের উপর রিসার্চ করাই ভাল।' নিজের নোটগুলো গুছিয়ে নেয়ার ফাঁকে বললেন, 'ঠিক আছে, আর কারও কোনও প্রশ্ন?'

'ডক্টর আহমেদ,' তৃতীয় সারিতে উঠে দাঁড়িয়েছে টাকমাথা এক লোক, চোখে-ওয়ায়ার-রিম চশমা। ঘন ঝোপের মত ভুরু, ঠোঁটে চালিয়াতি হাসি। 'প্লিয স্যর, আর মাত্র একটা প্রশ্ন। আপনি বলেছেন, ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে উনিশ শ' ষাট সালে দু'বার এক্সপিডিশন হয়। কিন্তু, প্রফেসর, এটা কি ঠিক নয় যে অনেক পরে চ্যালেঞ্জার ডিপে আরও কেউ নেমেছে?'

‘ক্-কী বললেন?’ চম্‌কে গেলেন নাসিম।

‘লুকাতে চাইছেন কেন, প্রফেসর? আপনি নিজেই তো কয়েকবার ওখানে নেমেছেন।’

চুপ করে কী যেন ভাবছেন নাসিম, খুবই বিব্রত।

শ্রোতাদের ভিতর শুরু হয়েছে গুঞ্জন।

ঝোপের মত ভুরু নাচাল লোকটা, চোখ থেকে নামিয়ে ফেলল চশমা। ‘দুই হাজার নয় সালে, প্রফেসর। তখন আপনি নেভির হয়ে কাজ করছিলেন।’

‘এ... এ কথা কীভাবে... আপনি কী বলতে চান, স্যর?’ চট্‌ করে স্ত্রীর দিকে চাইলেন নাসিম।

‘আপনিই তো প্রফেসর আহমেদ, নাকি?’ তৃপ্ত ভঙ্গিতে হাসছে লোকটা।

হাসতে শুরু করেছে শ্রোতারাও।

‘সরি, এখন জরুরি কাজে যেতে হচ্ছে আমাকে,’ বললেন নাসিম। ‘এমনিতেই দেরি করে ফেলেছি। আপনারা আমার কথা শুনতে এসেছেন বলে অনেক ধন্যবাদ।’

মাত্র আট-দশটা হাততালি পড়ল।

নিজেদের ভিতর গুঞ্জন শুরু করেছে অনেকে।

পডিয়াম থেকে নেমে পড়লেন নাসিম। প্রশ্ন নিয়ে তাঁর দিকে ছুটে এল ছাত্ররা, সঙ্গে কয়েকজন বিজ্ঞানী। এঁদের নিজস্ব থিয়োরি আছে, সেসব নিয়ে আলাপ করতেই এসেছেন। এ ছাড়া, রয়েছেন পুরনো কলিগরা, একবারের জন্য হ্যালো জানাতে চাইছেন।

দু'হাত বাড়িয়ে সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক শুরু করলেন নাসিম, বারবার ক্ষমা-প্রার্থনা করছেন এভাবে চলে যেতে হচ্ছে বলে। চট্‌ করে একবার ভাবলেন, রানা কোথায় গেল? ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলে ভাল হতো। মনে জমে আছে অনেক কথা। দেশে যাননি অনেক বছর, খোঁজখবরও নেয়া হয়নি কারও। খুব নিঃসঙ্গ

হয়ে পড়েছেন। রানা বা সোহেল আমেরিকায় এলে সময় করে একবার হলেও দেখা করে যায়, তখন আত্মীয়-বন্ধুদের অনেক খবর পাওয়া যায়।

ভিড়ের ভিতর রানার মুখ খুঁজতে শুরু করলেন নাসিম।

কোথাও নেই ছেলেটা।

সবার ভিতর দিয়ে পথ করে এল টুক্সেডো পরা লোকটা।

'অ্যাই, নাসিম, গাড়ি পার্কিং লটে। অ্যানি বলে দিয়েছে, আর একমিনিটও দেরি করা চলবে না।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন নাসিম, এক ছাত্র ওঁর লেখা বই কিনেছে. ওটাতে সই দিয়ে পিছু নিলেন ম্যাক্স ডোনোভানের। অডিটোরিয়ামের এক্সিটের সামনে বিরক্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি আহমেদ।

দরজা খুলবার সময় একবার মানামি সিনোসুকাকে দেখলেন নাসিম, ওঁর দিকেই চেয়ে আছে মেয়েটি। ঠোঁট গোল করে কী যেন বলল নিঃশব্দে। বোধহয় ইংরেজি। বোঝাতে চাইছে, জরুরি আলাপ আছে।

একবার হাতঘড়ি দেখলেন নাসিম, কাঁধ ঝাঁকালেন। এক রাতের জন্য যথেষ্ট তর্কাতর্কি হয়েছে।

ঠিক তখনই এক্সিট ডোরের একটু দূরে অ্যানির তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শুনলেন: 'নাসিম, আর কত দেরি করবে? এমনিতেই অনেক দেরি করিয়ে দিয়েছ আমাদের!'

তিন

করোনাডো পেনিনসুলা ধরে ছুটে চলেছে ম্যাক্স ডোনোভানের সুদৃশ্য লিমাযিন। পিছনের সিটে বসেছেন ডক্টর নাসিম আহমেদ।

মুখোমুখি সিটে কার-ফোনে নিচু গলায় কথা বলছে ম্যাক্স। স্কুলের কিশোরী ছাত্রীদের মত আঙুল চালাচ্ছে পনিটেইলে।

চামড়ার দামি, চওড়া সিটে আরাম করে বসেছে অ্যানি, সুডৌল উরু একটার উপর আরেকটা চাপিয়ে দিয়েছে। হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস।

আমার স্ত্রী তার স্বামীর বড়লোক বন্ধুর সঙ্গ উপভোগ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তিক্ত মনে ভাবলেন নাসিম। ম্যাক্সের ইয়টে চুল বাঁধার ফিতের মত সরু বিকিনি পরা অ্যানির খোলামেলা দৃশ্য কখনোই ভাল লাগেনি তাঁর। দৃশ্যটা মনে পড়তেই রাগ অনুভব করলেন নাসিম।

'তুমি আগে রোদ এড়িয়ে চলতে,' বললেন তিনি।

'আসলে কী বলতে চাও?' শ্যাম্পেনে চুমুক দিল অ্যানি।

'আজকাল ট্যান করছ।'

'ক্যামেরায় ব্রোঞ্জের মত ত্বক দেখতে ভাল লাগে,' তীক্ষ্ণ চোখে চাইল অ্যানি।

'রোদে বেশি গেলে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে।'

'ওসব আমার জানা আছে। এখন ও নিয়ে ভাবতে চাই না। আজ আমার ক্যারিয়ারের সবচেয়ে উজ্জ্বল রাত, তুমি জানো, তার

পরেও তোমাকে টেনে-হিঁচড়ে তুলে আনতে হয়েছে লেকচার হল থেকে! আজকের ডিনারের কথা একমাস আগে থেকেই জানা ছিল তোমার। অথচ পরনে তোমার বিশ বছরের পুরনো সুট!'

'অ্যানি, দু' বছর পর আবারও ফিরতে পেরেছি লেকচার সার্কিটে, আর তুমি আইল ধরে এলে রাগে গজ গজ করতে করতে! অনেকে মনে করবে আমি...'

'বাদ দাও তো এসব,' ফোন রেখে বলল ম্যাক্স। দু'হাত তুলেছে মাথার উপর। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো। অ্যানি, আজকের রাত তো নাসিমের জন্যেও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের বোধহয় আরও কিছুক্ষণ লিমাযিনে অপেক্ষা করা উচিত ছিল।'

চুপ করে রইলেন নাসিম।

কিন্তু কথা শেষ হয়নি অ্যানির। 'এ সুযোগ পাওয়ার জন্যে পুরো একটা বছর অপেক্ষা করেছি আমি। তিনবছর আগেই তো নিজের বারোটা বাজিয়েছে নাসিম। চাকরি নেই, পয়সা নেই... এখন ভাল কিছু করার সুযোগ এসেছে আমার। যদি পাশে থাকতে না চায়, আমার কোনও আপত্তি নেই। ইচ্ছে করলে ও বসে থাকতে পারে লিমোর ভিতর। আমার পাশে থাকবে ম্যাক্স। ...কি, ম্যাক্স, থাকবে না পাশে?'

'তোমাদের ঝগড়া থেকে রেহাই দাও আমাকে,' বলল ম্যাক্স।

ভুরু কুঁচকে জানালা দিয়ে দূরে চাইল অ্যানি।

গাড়ির ভিতর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

কয়েক মিনিট পর মুখ খুলল ডোনোভান, 'টেইলর বলেছে তুমি ঠিক পথেই যাচ্ছ, অ্যানি। আজকের রাত হয়ে উঠতে পারে তোমার ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট। অবশ্য যদি পুরস্কারটা পাও।'

ঘুরে ম্যাক্সের দিকে চাইল অ্যানি। স্বামীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে রেখেছে। আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, 'দেখো, আমি জিতবই। আমি শিওর। আরেকটা ড্রিঙ্ক দাও তো, ম্যাক্স।'

প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে হাসল ডোনোভান, অ্যানির গ্লাস ভরে দিল সোনালী তরল দিয়ে, তারপর বোতলটা বাড়িয়ে দিল নাসিমের দিকে।

মাথা নাড়লেন নাসিম, দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেলান দিলেন সিটে। অসহায় চোখ পড়ে রইল স্ত্রীর উপর। ভাবছেন, তাঁর ক্যারিয়ারে ধস শুরু হওয়ার পর থেকেই সরে যেতে শুরু করেছে অ্যানি দূর থেকে দূরে।

ছয় বছর আগে ম্যাসাচুসেট্স্-এ অ্যানির সঙ্গে পরিচয় হয় নাসিমের। তখন অ্যানির বয়স মাত্র একুশ। আর একত্রিশ বছরের তরতাজা যুবক নাসিম, সামনে পড়ে আছে দীর্ঘ উজ্জ্বল ক্যারিয়ার। অধ্যাপনার পাশাপাশি দ্য রিয়াল ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটে ডিপ-সি সাবমারসিবল পাইলটিঙের ইন্সট্রাক্টর ছিলেন। হুড়হুড় করে আসছে টাকা, সেইসঙ্গে সুনাম।

আর অ্যানি ছিল বস্টন ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েশন ছাত্রী, পড়ত জার্নালিযমে। অপূর্ব সুন্দরী, ইচ্ছে ওর মডেলিং করবে। কিন্তু নামকরা সব মডেলের চেয়ে উচ্চতা কম থাকায় ওই পেশায় সুবিধা হবে না বুঝে সরে আসে। ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেয় ব্রডকাস্ট জার্নালিযম।

গ্র্যাজুয়েশন ফাইনাল পরীক্ষায় অ্যাসাইনমেন্ট পেপার হিসাবে অ্যানি বেছে নিয়েছিল ডক্টর নাসিম আহমেদ ও তাঁর অভিযান বিষয়টি।

তিনি তখন অ্যালভিন সাবমারসিবল নিয়ে একের পর এক অভিযানে যাচ্ছেন গভীর সাগরে।

অ্যানির বুঝতে দেরি হয়নি, ওই সুদর্শন যুবক ক্রমেই হয়ে উঠছে সেলেব্রিটি। চিতার মত ক্ষিপ্র দেহ, খুবই ভদ্র, টাকাও আছে মেলা।

ওদিকে নাসিম অবাক হয়েছিলেন, অ্যানির মত অমন রূপসী

মেয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে ডিপ সি ডাইভিঙে।

তাঁর প্রতি ওর অনুরাগ টের পান ক'দিন পরেই।

সামাজিকতার সময় নেই, বিপজ্জনক সব অভিযানে যোগ দেন, অথচ তারপরও তাঁকে কাছে টানতে চাইল অ্যানি।

ডেটিঙের প্রথম দিনেই নাসিম বলেছিলেন, 'তুমি কি জানো, কোথাও বেড়াতে নিয়ে যেতে পারব না? আসলে সে সময় আমার হাতে থাকে না। শেষে হয়তো বিরক্ত হয়ে উঠবে তুমি।'

'এসব নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে কখনও,' মিষ্টি করে হেসেছিল অ্যানি। 'আমিও তো ব্যস্ত হয়ে উঠব নিজের পেশায়।'

এরপর আর কোনও বাধা দেননি নাসিম।

তিন মাস ডেটিং করেন তাঁরা, তারপর বিয়ে।

প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাননি নাসিম, এ কথা একেবারেই ভুল। প্রথমে গিয়েছিলেন নিজ দেশে। এরপর এশিয়ার আরও কয়েকটি দেশে। আমেরিকায় ফিরবার পর প্রথমে নিয়ে যান গ্যালাপাগোস ট্রেঞ্চে, ডাইভ দেন ওঁরা অনেক গভীরে।

মুগ্ধ হয়েছিল অ্যানি। ডাইভ দিয়ে নয়, কলিগদের উপর স্বামীর প্রভাব দেখে। এর পরেও বেশ কয়েকবার গভীর সাগরে অভিযানে গেছে ও স্বামীর সঙ্গে।

এরপর চারবছর আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় বাড়ি কেনেন নাসিম। আর তখনই অধ্যাপনা ছেড়ে ইউএস নেভির সঙ্গে চুক্তি করেন মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। ততদিনে ক্যালিফোর্নিয়াকে ভালবেসে ফেলেছে অ্যানি। মস্ত সব বড়লোকের বিলাসী জীবনযাত্রা অনুকরণ করতে শুরু করেছে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মিডিয়ায় নিজের ক্যারিয়ার গুছিয়ে নেয়ার জন্য। পাশেই থেকেছেন স্বামী, আর এ-ই চেয়েছিল অ্যানি। ওর মনে হয়েছিল নাসিম চাইলেই সিঁড়ির কয়েকটা ধাপে ওকে ঠেলে তুলে দিতে পারবেন।

সব ভালভাবেই চলছিল।

কিন্তু তারপর হঠাৎ করেই এল বিপর্যয়। তখন নেভির এক টপ-সিক্রেট ডিপ-সি সাবমারসিবল নিয়ে এক্সপেডিশনে ছিলেন নাসিম ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে। পাতালে তৃতীয় ডাইভ দেবার সময় ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি। ডিকমপ্রেশন করবার সময় না দিয়েই দ্রুত উঠে আসেন। ফলে মারা পড়ে নেভির দুই অফিসার। এ দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করা হয় নাসিমকে। অফিশিয়াল রিপোর্টে বলা হয়: 'গভীরে নেমে যাওয়ায় তাঁর দৃষ্টিভ্রম হয়।'

ওই দুর্ঘটনাই শেষ করে দিল অ্যাকুনট হিসাবে নাসিমের ক্যারিয়ার। অনেকে জেনে গেল, নেভির দুই অফিসারকে মেরে ফেলেছেন তিনি নিজের অমূলক আতঙ্কের কারণে।

ওটাই ছিল ডক্টর নাসিম আহমেদের সাবমারসিবল নিয়ে শেষ সাগরতলের এক্সপিডিশন।

অ্যানিরও বুঝতে দেরি হয়নি, ধসে পড়েছে ওর সিঁড়ির ধাপ। এখন আর স্বামীর সাহায্য নিয়ে সত্যিকারের নক্ষত্র হতে পারবে না ও।

তার চেয়ে বড় কথা, আর কখনও ডিপ-সি ডাইভ করতে পারবে না নাসিম।

শুকিয়ে গেছে তার ক্যারিয়ার। এবং রোজগারের উৎস।

চুক্তি বাতিল করে দিয়েছে নেভি।

আর কেউ ডাকবে না নাসিমকে।

ফুরিয়ে গেছে সে।

মন দিলেন নাসিম প্যালিয়োনটোলজির উপর বই লেখায়। গবেষণা করতে লাগলেন প্রাচীন মাছের উপর। ক্রমেই ফুরিয়ে আসতে লাগল টাকা।

সত্যিই কেউ আর ডাকল না তাঁকে।

পাল্টে গেল অ্যানির বিলাসী জীবনযাত্রা।

যথেষ্ট টাকা নেই যে যখন ইচ্ছে যা খুশি করবে।

স্থানীয় ম্যাগাযিনে পার্ট-টাইম কাজ নিল অ্যানি। বুঝে গেল এসব সাধারণ কাজ করে কোনদিনও সেলেব্রিটি হতে পারবে না।

তারকা হওয়ার স্বপ্ন ভেঙে যেতে লাগল।

তখন থেকেই টিটকারি শুরু করল অ্যানি: বসে বসে জমানো টাকা শেষ না করে অডজব খুঁজে নাও। তুমি তো সত্যিকারের আমেরিকানও নও, ভাল চাকরি দেবে কে তোমাকে!

এসব কথার কোনও জবাব দেননি নাসিম, আরও মনোযোগ দিয়েছেন বই লেখায়।

তারপর একদিন কলেজের রুমমেট ম্যাক্স ডোনোভানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন অ্যানিকে।

তখন চৌত্রিশ বছর ডোনোভানের, বাবা মারা যাওয়ায় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে স্যান ডিয়েগোতে বিশাল শিপিং বিযনেস।

পেনস্টেট ইউনিভার্সিটিতে ক্যাম্পাসের একটু দূরে ছোট এক অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে তিনবছর একসঙ্গে থেকেছেন নাসিম ও ম্যাক্স, পরেও যোগাযোগ ছিল দু' বন্ধুর।

স্যান ডিয়েগো উইক্‌লিতে পার্ট-টাইম লেখিকা হিসাবে কাজ করছিল অ্যানি। নাসিম বলতেই ম্যাক্সের শিপিং বিযনেস নিয়ে আর্টিকেল লিখতে আগ্রহী হয়ে উঠল ও।

পরের একমাস বন্দরে গিয়ে ম্যাক্সের পিছনে লেগে রইল। বারবার ম্যাক্সের সঙ্গে গেল লং বিচ, স্যান ফ্রান্সিসকো ও হনোলুলু। ম্যাক্সের ইয়টে সাক্ষাৎকার নিল, বসল বোর্ড মিটিঙে। হোভারক্রাফট করে ঘুরে বেড়াল সাগরে, এক বিকেলে ম্যাক্সের সঙ্গে দেখতে গেল কীভাবে চালাতে হয় সেইল বোট।

বুনো স্বভাবের মস্ত বড়লোক স্থানীয় মিলিয়োনেয়ার ম্যাক্সকে

নিয়ে অ্যানির লেখাটা খুশিমনে কাভার স্টোরি করল স্যান ডিয়েগো উইক্লি।

এতে স্যান ডিয়েগোতে ফুলেফেঁপে উঠল ম্যাক্সের চার্টার বিযনেস।

অকৃতজ্ঞ নয় ম্যাক্স ডোনোভান, বদলে অ্যানিকে সে জোগাড় করে দিল স্থানীয় টিভি স্টেশনে সাংবাদিকতার সুযোগ।

ওই স্টেশনের ম্যানেজার বব টেইলর, ম্যাক্সের ইয়টিং পার্টনার। বন্ধুর অনুরোধে রাত দশটার খবরের দুই মিনিট আগে ফিলার করবার সুযোগ দিল সে অ্যানিকে।

কয়েক দিনের মধ্যেই চাকরি পাকা হয়ে গেল ওর।

প্রতি সপ্তাহ শেষে ক্যালিফোর্নিয়া ও পশ্চিমের উপর ছোট এক অনুষ্ঠান করতে লাগল অ্যানি।

কিছুদিনের ভিতর হয়ে উঠল স্থানীয় সেলেব্রিটি।

লিমাযিন থেকে নেমে পড়ল ম্যাক্স ডোনোভান, অ্যানির হাত ধরে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করল। চওড়া হাসছে, খুশি মনে বলল, 'তোমাদের কী মনে হয়, আমারও কোনও পুরস্কার পাওয়া উচিত নয়? তুমি কি বলো, অ্যানি? আমাকে চালিয়ে দাও এগযেকিউটিভ প্রোডিউসার হিসাবে।'

'জীবনেও না,' জবাবে মিষ্টি হাসল অ্যানি। শোফারের হাতে ধরিয়ে দিল খালি গ্লাস। একটু ঝিমিয়ে গেছে বেশি মদ্যপান করে। সিঁড়ির ধাপে পা রেখে ম্যাক্সের কনুই ধরে উঠতে শুরু করল। 'ম্যাক্স, ওরা যদি তোমাকে পুরস্কার দিতে শুরু করে, আমার জন্য আর একটাও রাখবে না।'

খুশি মনে প্রশংসাটা নিল ডোনোভান।

বিখ্যাত ডেল করোনাডো হোটেলের এণ্ট্রান্স পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা, পিছনে রয়ে গেলেন একাকী ডক্টর নাসিম

আহমেদ। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে পিছু নিলেন তিনি।

বিশাল হলঘরের মুখেই ঝুলছে সোনালী ব্যানার, তাতে লেখা:

'দ্য থার্টিফোর্থ অ্যানুয়াল স্যান ডিয়েগো মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড্স্।'

রুপালি বলরুমে কাঠের সিলিঙের খোপে প্রকাণ্ড আকারের তিনটে ঝাড়বাতি জ্বলছে। এককোণে একটা ব্যাণ্ড দল মৃদুভাবে বাজাচ্ছে ওয়াল্টসের সুর। একপাশের বার কাউন্টার থেকে দামি সব ড্রিঙ্ক নিচ্ছে অতিথিরা, গিয়ে বসছে সাদা-সোনালী টেবিলক্লথ মোড়া সব টেবিলে। একটু পর সার্ভ করা হবে ডিনার।

আগে কখনও সুট পরে ডক্টর নাসিম আহমেদের মনে হয়নি তিনি উলঙ্গ। একমাস আগেই অ্যানি বলেছিল এই অনুষ্ঠান হবে খুব জাঁকজমক করে। কিন্তু এটা বলেনি যে মস্ত সব বড়লোক আসবে, পরনে থাকবে তাদের দামি দামি সুট ও গাউন।

কয়েকটা জটলা তৈরি করে আড্ডা দিচ্ছে অনেকে।

তাদের ভিতর টিভির বেশ ক'জন অভিনেতা-অভিনেত্রী ও নামকরা তারকাদেরকে দেখতে পেলেন নাসিম। তাদের ভিতর রয়েছেন চ্যানেল সেভেন অ্যাকশন নিউজ-এর পঞ্চান্ন বছর বয়সী কো-অ্যাংকর টনি হেণ্ডারসন।

হাসি মুখে থামলেন অ্যানির সামনে, হ্যালো জানালেন।

অ্যানির নতুন স্পেশাল অনুষ্ঠানের ফাণ্ড দিয়েছেন তিনিই। ক্যালিফোর্নিয়ার দূর-সাগরে তেল তুলবার ফলে তিমিগুলোর কী ক্ষতি হচ্ছে, তা নিয়েই ফিচার করেছে অ্যানি।

'এনভায়ার্নমেন্টাল ইশ্যু' ক্যাটাগরিতে প্রথম তিনটে ফিচারের ভিতর ঠাঁই করে নিয়েছে ওর প্রতিবেদন।

'সবাই ধারণা করছে পুরস্কার জিতে নেবে ও-ই।

'আজ রাতে বোধহয় ঈগল নিয়ে বাড়ি ফিরবে তুমি, অ্যানি,' বললেন টনি হেণ্ডারসন।

'আপনার তাই মনে হয়?' মিষ্টি হাসল অ্যানি।

'হুম্! তিন জাজের একজন আমার বউ!' গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন ভদ্রলোক। ম্যাক্স ডোনোভানের পনিটেইল দেখে বললেন, 'এই যুবকটিই তা হলে তোমার স্বামী? খুবই লাকি মানুষ!'

'একটু ভুল হলো,' হ্যাণ্ডশেক করবার সময় বলল ম্যাক্স।

'কোন্‌টা ভুল বললাম? আপনি যুবক নন সেটা, না আপনি ওর স্বামী নন?' আবারও হেসে উঠলেন হেণ্ডারসন।

'ইনি আমার... এগযেকিউটিভ প্রোডিউসর,' মুচকি হাসল অ্যানি। চট্ করে একবার দেখে নিল নাসিমকে। 'ও আমার স্বামী।'

'নাসিম আহমেদ,' হাত বাড়িয়ে দিলেন ডক্টর। 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিস্টার হেণ্ডারসন।'

'প্রফেসর আহমেদ?' হাত মেলালেন হেণ্ডারসন।

'জী।'

'গত কয়েক বছর আগে না আপনাকে নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করি আমরা? সালটন সাগরে ডায়নোসরের হাড়... এ ধরনের কিছু?'

'জী।' এত লোকের ভিতর ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছেন নাসিম। 'আসলে ডায়নোসরের হাড়...'

'এক্সকিউয মি, নাসিম,' তাঁকে বাধা দিল অ্যানি। 'একদম শুকিয়ে গেছে আমার গলা। তুমি কি একটা ড্রিঙ্ক এনে দেবে?'

একটা আঙুল তুলল ম্যাক্স ডোনোভান। 'আমার জন্যেও জিন অ্যাণ্ড টনিক এনো, নাসিম।'

হেণ্ডারসনের দিকে চাইলেন ডক্টর।

'আমার লাগবে না, প্রফেসর। পুরস্কার সবার হাতে তুলে দেয়ার কাজ আমার। আরও ড্রিঙ্ক করলে গতকালকের খবর গড়গড় করে শোনাতে শুরু করব।'

জটলাগুলোকে এড়িয়ে বারের কাছে চলে গেলেন নাসিম

বলরুমের জানালাগুলো সব বন্ধ, বেশ গরম লাগছে। পুরনো উলের কোট চুলকানি তৈরি করছে ত্বকে, তার উপর আটকে আসতে চাইছে তাঁর শ্বাস। বারটেণ্ডারের কাছে একটা বিয়ার, এক গ্লাস শ্যাম্পেন ও একটা জিন-টনিক চাইলেন। বরফের তলা থেকে এক বোতল কার্টা ব্ল্যাঙ্কা বের করল বারটেণ্ডার। ওটা নিয়ে কপালে ছোঁয়ালেন নাসিম। বোধহয় জ্বর আসছে। বোতলের মুখ খুলে লম্বা চুমুক দিলেন। ঘুরে চাইলেন অ্যানির দিকে। তাঁর স্ত্রী হেসে গড়িয়ে পড়ছে ম্যাক্সের কাঁধে। হাসছে ম্যাক্স ও হেণ্ডারসন।

'আপনাকে কি আরেকটা বিয়ার দেব, স্যর?'

ড্রিঙ্কগুলো তৈরি, নাসিম খেয়াল করলেন তাঁর বিয়ারের বোতলও শেষ। 'একটা ওই জিনিস দিন,' জিনের গ্লাসের দিকে আঙুল তাক করলেন।

'আমাকেও,' পিছন থেকে বলে উঠল কে যেন। 'সঙ্গে লাইম দেবে।'

ঘুরে চাইলেন নাসিম।

এ সেই টাকমাথা লোকটা। ঘন ঝোপের মত ভুরু। মুখে হালকা হাসির রেখা, চোখের ভিতর অশুভ কী যেন। 'আরে, আবারও দেখা হয়ে গেল, ডক্টর!'

সন্দেহ নিয়ে তাকে দেখলেন নাসিম। 'আপনি কি আমার পিছু নিয়েছেন?'

'ছি-ছি, এসব কী বলছেন,' বার থেকে এক মুঠো সল্টেড কাঠবাদাম তুলে নিল সে। আঙুল তাক করল হলঘরের দিকে। 'আমি মিডিয়ার সঙ্গে আছি।'

ডক্টর নাসিমের হাতে ড্রিঙ্ক ধরিয়ে দিল বারটেণ্ডার। 'আপনি কি অ্যাওয়ার্ডের জন্য...' কথা শেষ করলেন না নাসিম।

'না-না, আমি সাধারণ দর্শক।' হাত বাড়িয়ে দিল ঘন ভুরু। 'আমার নাম ডন রে। সায়েন্স জার্নালের সঙ্গে আছি।'

হ্যাণ্ডশেক করলেন নাসিম।

'আমি খুব আগ্রহ নিয়ে শুনেছি আপনার লেকচার। ভাবা যায় না মেগা... কী যেন নাম বলেছিলেন আপনি?'

ড্রিঙ্কে চুমুক দিলেন নাসিম, বিরক্ত। মিথ্যা না বললেও পারত লোকটা। কোনও মনোযোগই দেয়নি তাঁর বক্তৃতায়। এবার একটু কঠোর সুরেই বললেন, 'আপনি আসলে কী চান আমার কাছে?'

মুখভরা কাঠবাদাম চিবানোর ফাঁকে গ্লাসে লম্বা চুমুক দিল ডন রে। 'জানতে পেরেছি গত তিন বছর আগে নেভির হয়ে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে নামেন আপনি। ...কথাটা কি ঠিক?'

'হয়তো ঠিক, আবার ঠিক না-ও হতে পারে। আপনি আসলে কী জানতে চাইছেন?'

'গুজব শুনেছি, নেভি তাদের পুরনো নিউক্লিয়ার ওয়েপন্স প্রোগ্রামের রেডিয়োঅ্যাকটিভ আবর্জনা ফেলবার জন্য ভাল কোনও জায়গা খুঁজছিল। ঘটনা যদি তাই হয়ে থাকে, খুবই আগ্রহী হয়ে উঠবে আমার এডিটর।'

চমকে গেছেন নাসিম। গ্লাসে চুমুক দিয়ে জানতে চাইলেন, 'এসব কে বলেছে আপনাকে?'

'আসলে কেউ বলেছে তা নয়, কিন্তু...'

'কে বলেছে?' আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন নাসিম।

'সরি, প্রফেসর। আমি সোর্সের পরিচয় দিই না। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, গোপন মিশনের বিষয়ে কেউ মুখ খুলতে চায় না।' একটা কাঠবাদাম মুখে চালান দিল ডন রে। চুক-চুক আওয়াজ তুলে চাটতে শুরু করেছে ওটাকে চুইং-গামের মত করে। 'মজার কথা জানেন, ওই সোর্সের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম তিন বছর আগে। একটি কথাও বের করতে পারিনি তার পেট থেকে। তারপর এত বছর পর হঠাৎ করেই ফোন করল সে। বলল, যদি সত্যিই জানতে আগ্রহী হই, আমি যেন যোগাযোগ

করি আপনার সঙ্গে।' হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে আছে সে।

লোকটার দিকে চুপ করে চেয়ে রইলেন নাসিম। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'আমার পেটে এমন কোনও গোপন কিছু নেই যা আপনাকে জানাতে পারব। ঠিক আছে, মিস্টার রে, এবার আমাকে ক্ষমা করতে হবে; ওদিকে বোধহয় ডিনার সার্ভ শুরু হয়েছে।' ঘুরে রওনা হয়ে গেলেন নাসিম, চলেছেন তাঁর টেবিল লক্ষ্য করে।

চোখ সরু করে নাসিমের দিকে চেয়ে রইল ডন রে।

'আরেকটা ড্রিঙ্ক, স্যর?' জানতে চাইল বারটেণ্ডার।

'হ্যাঁ।' আরেক মুঠো কাঠবাদাম তুলে নিল ঘন ভুরু।

বলরুমের দিকে হেঁটে চলেছেন নাসিম আহমেদ। তাঁকে লক্ষ্য করছে দুই জোড়া কালো চোখ।

অ্যানির পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলেন নাসিম।

পরের চার ঘণ্টা পেরুল ভীষণ বিরক্তি নিয়ে, ততক্ষণে ওঁর পেটে ঢুক-ঢুক আওয়াজ তুলছে ছয় পেগ মদ। ঘোলাটে হয়ে গেছে দৃষ্টি। সাদা টেবিলক্লথের উপর দেখছেন জোড়া গোল্ডেন ঈগল। ওদের থাবার ভিতর দুটো টিভি ক্যামেরা। অবশ্য যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারছেন, ওখানে মাত্র একটা ঈগল, টিভি ক্যামেরাও একটিই।

ডিসকভারি চ্যানেল ও গ্রিনপিসের দুই প্রজেক্টকে টেক্কা দিয়ে তিমির উপর অ্যানির প্রতিবেদন জিতে নিয়েছে পুরস্কার।

অ্যানি আসলে মানুষের আবেগ কচলে নিজের শক্ত অবস্থান তৈরি করেছে। মূল কথা ছিল: আসুন, আমরা রক্ষা করি নিরীহ তিমি প্রজাতিকে। নিজ বক্তৃতায় বলেছে: বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এখনই তিমিদের বাঁচাতে হবে। আসুন আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি ওদের রক্ষা করতে।

নাসিমের মনে হয়েছে, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি নন যিনি

সামান্যতম আন্দোলিত হননি অ্যানির কপট আবেদনে।

ফুরিয়ে গেছে ম্যাক্স ডোনোভানের সিগার। এইমাত্র আবারও টোস্ট করলেন টনি হেণ্ডারসন। একটু আগে প্রশংসা বন্ধ করেছেন তিনি। তার আগে বলেছেন, উনি যদি সতর্ক না হন, হয়তো লস অ্যাঞ্জেলেসের বড় টিভি স্টেশন অ্যানিকে কেড়ে নেবে।

এ কথা শুনে অ্যানি এমন ভঙ্গি নিয়েছে, যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই তার অন্য স্টেশনে যোগ দেয়ার।

নাসিম জানেন, এ গুজব আসলে ছড়িয়েছে অ্যানি নিজেই।

একটু আগে চেয়ার ছেড়েছে একদল অতিথি। তখন নাসিমের দিকে না চেয়েই ম্যাক্সের হাত ধরে ডান্স ফ্লোরে চলে গেল অ্যানি। ধরেই নিয়েছে, নাসিম কিছু মনে করবে না।

মনে করবার আছেই বা কী নাসিমের?

নাসিমের পয়সায় চলে সে?

তা ছাড়া, নাসিম কখনও নাচতে ভালবাসে না।

টেবিলে একা বসে আছেন নাসিম আহমেদ, গুনে বের করতে চাইছেন গত তিনঘণ্টায় ক' আউন্স জিন গিলেছেন।

বড় ক্লান্তি লাগছে তাঁর। সেইসঙ্গে প্রচণ্ড মাথা-ব্যথা ও জ্বর-জ্বর ভাব।

মনে পড়ল তাঁর, তিন বছর আগে অ্যানি যখন অপমান করতে শুরু করল, নিজেকে গুটিয়ে নেন তিনি, শুরু করেন মদ্যপান। বড় একা হয়ে যান আসলে। মুখ ফুটে কিছু বলেননি কখনও কাউকে।

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, সামান্য টলতে টলতে চলে গেলেন বার কাউন্টারে।

ওখানে এসে জুটেছেন টনি হেণ্ডারসন। তুলে নিয়েছেন এক বোতল ওয়াইন ও দুটো গ্লাস। 'বাজা কেমন লাগল, প্রফেসর?' জানতে চাইলেন।

লোকটা ওঁর মতই মাতাল কি না, ভাবলেন নাসিম। আস্তে করে বললেন, 'এক্সকিউয মি?'

'ওই যে ক্রুজ?'

'কীসের ক্রুজ?' বারটেণ্ডারের দিকে গ্লাস বাড়িয়ে দিলেন নাসিম। আস্তে করে মাথা দোলালেন, আবারও ভরে দাও।

জোরে হেসে উঠলেন হেণ্ডারসন। 'আমি অ্যানিকে বলেছিলাম, মাত্র তিনদিনের ছুটি কোনও ছুটিই নয়। আশ্চর্য, একদম ভুলেই গেছেন!'

'ও, গত সপ্তাহের কথা...' থমকে গেলেন নাসিম। উনি যাননি স্যান ফ্রান্সিসকোতে। রোদে ট্যান করবার জন্য ওখানে গিয়েছিল অ্যানি। পাশে ছিল বোধহয় ম্যাক্স ডোনোভান। 'না, অ্যানির মত ভাল লাগেনি আমার ওই ছুটি।'

'অনেক বেশি মার্গারিটা?'

আস্তে করে মাথা নাড়লেন নাসিম। 'না, টেকিলা পছন্দ করি না।' তাঁর হাতে জিন ও টনিক ধরিয়ে দিল বারটেণ্ডার।

'আমারও ভাল লাগে না,' বললেন হেণ্ডারসন, হাসতে হাসতে ফিরে চলেছেন নিজের টেবিলের দিকে।

ক্লান্ত চোখে হাতের গ্লাস দেখলেন নাসিম। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একবার। আনমনে ভাবলেন, যদি একটা বাচ্চাও থাকত তাঁদের, তাকে নিয়ে সময়টা পার করে দিতে পারতেন। কিন্তু অ্যানি আপত্তি তুলেছিল, চায়নি সন্তান নিতে।

ডান্স ফ্লোরের দিকে ঘুরে চাইলেন নাসিম।

উত্তেজক সুরে বাজতে শুরু করেছে ব্যাণ্ড।

মৃদু করে দেয়া হয়েছে বাতি।

এখন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে নাচবে কপোত-কপোতিরা।

খুঁজতে শুরু করে অ্যানি ও ম্যাক্সকে আবিষ্কার করল নাসিমের চোখ।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বুকে বুক দিয়ে নেচে চলেছে ওরা। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ম্যাক্সের একহাত অ্যানির হাতে, অপর হাত ওর কোমরে। হাতটা নির্লজ্জ ভাবে আদর করছে অ্যানিকে। কোমর বেয়ে আরও নীচের দিকে রওনা হয়েছে হাত।

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন নাসিম। তাঁর কথা ভুলেই গেছে!

ম্যাক্সের হাতটা ধরে নিজের বুক চিনিয়ে দিল অ্যানি। পরস্পরের ঠোঁট চলে এসেছে খুব কাছাকাছি।

বারকাউন্টারের ওপর ঠাস্ করে গ্লাস রাখলেন নাসিম, নিজেও জানেন না কখন রওনা হয়ে গেছেন ডান্স ফ্লোর লক্ষ্য করে। অন্যদের মাঝ দিয়ে হেঁটে চলেছেন ঘোরের ভিতর।

এখন দুই হাতে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে অ্যানি ও ম্যাক্স। দুনিয়ার কোনওদিকে খেয়াল নেই। দুজনের চোখে কামাতুর চাহনি।

ম্যাক্স ডোনোভানের কাঁধে টোকা দিলেন নাসিম।

চমকে নাচ বন্ধ করল অ্যানি ও ম্যাক্স। ঘুরে চাইল নাসিমের দিকে।

বন্ধুর চোখে চোখ পড়তেই প্রথমবারের মত ম্যাক্স ডোনোভান টের পেল, অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে।

'নাসিম?' খসখসে স্বরে বলল সে, চোখে বেপরোয়া দৃষ্টি।

পরমুহূর্তে প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে পিছনে হেলে পড়ল সুপুরুষ ম্যাক্স ডোনোভান। প্রথমে পড়ল এক দম্পতির গায়ে, তারপর ওদের নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ল পালিশ করা মেঝেতে।

'বেঈমান কুকুর কোথাকার!' গর্জে উঠেছেন নাসিম।

থেমে গেল ব্যাণ্ডের বাজনা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ম্যাক্স ডোনোভান, ধিকিধিকি জ্বলছে দুই চোখ। মুঠো বাগিয়ে তেড়ে এল প্রফেসরকে লক্ষ্য করে।

আগুন চোখে নাসিমের দিকে চাইল অ্যানি। 'তুমি কি পাগল

হয়ে গেলে, মাতাল শুয়োর কোথাকার!'

আবারও ডোনোভানের চোয়ালে ঘুষি মারতে চাইলেন নাসিম। কিন্তু দীর্ঘদেহী ম্যাক্স ডোনোভান এক ঝটকায় সরিয়ে দিল তাঁর হাত। এবার তার প্রচণ্ড এক ঘুষি এল নাসিমের নাক লক্ষ্য করে।

কিন্তু নাসিম দেখলেন, কে যেন ডানপাশ থেকে খপ্ করে ধরে ফেলেছে ম্যাক্সের কবজি।

'হাত ছাড়ু!' চেঁচিয়ে উঠল ক্ষিপ্ত ডোনোভান। ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে চাইল হাতটা।

'খবরদার!' কানের পাশে চাপা একটা কণ্ঠ বলল, 'ওঁর গায়ে হাত তুললে ভেঙে দেব হাতটা।'

'এত সোজা?' ভীষণ রেগে উঠেছে ম্যাক্স। খানিক ধস্তাধস্তি করেই বুঝতে পারল এশিয়ান লোকটার লৌহকঠিন আঙুলগুলো আরও চেপে বসছে তার কব্জিতে, কিছুতেই হাত ছাড়াতে পারছে না সে। ব্যথায় নীল হতে শুরু করেছে মুখ।

বুকে জোর ধাক্কা দিয়ে ম্যাক্স ডোনোভানকে পিছিয়ে দিল যুবক। বামহাতে ডান কবজি টিপে ধরে চেয়ে রইল সে। ওই লোকটার সঙ্গে লড়বার ইচ্ছে নেই।

টলছেন নাসিম, এক হাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরল রানা। বামপাশ থেকে আরেকজন ধরেছে নাসিমের বাহু।

ঘুষি মারতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন নাসিম, বামহাত বোলালেন আঙুলগুলোয়। স্ত্রীর দিকে চেয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'তোমার আর বাড়ি ফেরার দরকার নেই, অ্যানি।'

অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে চরকির মত ঘুরছে মাথা। ঘোরের ভিতর দেখলেন রানাকে। মৃদু হাসতে চেষ্টা করলেন ছোটভাই সোহেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দিকে চেয়ে। কান্নার মত দেখাল হাসিটা।

ওঁকে নিয়ে এক্সিটের দিকে রওনা হয়ে গেল রানা।

বামহাতে টাই ঢিল করলেন নাসিম।

বড়লোকের এই জঘন্য নোংরা আড্ডাখানায় আসাই উচিত হয়নি তাঁর।

ওরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতেই ইউনিফর্ম পরা এক বেলবয় জানতে চাইল, 'স্যর, আপনাদের পার্কিং স্টাব?'

'আমার গাড়ি নেই,' জড়ানো স্বরে বললেন নাসিম।

'তা হলে কি আপনাকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেব, স্যর?'

পিছন পিছন সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে মানামি সিনোসুকা। 'সঙ্গে গাড়ি আছে, ডক্টরকে আমি পৌঁছে দেব,' বলল মেয়েটি।

'লাগবে না, উনি আমার সঙ্গে যাবেন,' বলল রানা। 'ট্যাক্সি ডেকে নেব।'

'আই ইনসিস্ট, স্যর,' জোর দিয়ে বলল মানামি।

'তুমি কি আমাকে আরও অপমান করতে চাও?' ক্লান্ত সুরে জানতে চাইলেন নাসিম।

মৃদু হাসল মানামি। 'আপনাকে খুব বিরক্ত করছি, তাই না, ডক্টর?' উপেক্ষা করতে চাইছে রানাকে, কিন্তু লাল হয়ে গেছে দুই গাল। 'ঠিক আছে, ব্যক্তিগত কোনও কথা বলব না। তাতে হবে?'

'তোমার গাড়িতে যেতে পারবে আমার ভাই?' ঢুলু ঢুলু চোখে জানতে চাইলেন নাসিম।

'নিশ্চয়ই। জানতাম না আপনার ভাই আছে। একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে আসছি।' আরেক দিকে রওনা হয়ে গেল মানামি।

আর দাঁড়াতে পারছেন না নাসিম, অনেক বেশি টলছেন। রানা ওঁকে ধরে থাকল শক্ত হাতে। তিক্ত মনে ভাবল, মাত্র তিনটে বছরে কীভাবে শেষ হয়ে গেলেন নাসিম ভাই! সোহেলের খুবই প্রিয় চাচাত ভাই। রানারও প্রিয় বড় ভাই উনি। কিছুদিন আগে

সোহেলের কাছে শুনেছিল, ওঁর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না আমেরিকান স্ত্রীর। রানা এজেন্সির ছেলেদের মাধ্যমে জেনেছিল, স্ত্রীর রূঢ় আচরণ ও ব্যাভিচারের কারণে নিজেকে শেষ করছেন প্রতিভাবান মানুষটা। কিন্তু পরিস্থিতি যে এতটা খারাপ, আজ এই পার্টিতে না এলে ভাবতেও পারত না ও।

'রানা, তোমার কী মনে হয়? ওই মেয়েটা আমার কাছে কী চায়?' ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন নাসিম আহমেদ।

'জানি না, নাসিম ভাই। ওকে চিনি না আমি। তবে আমি এসেছি আপনার পিছু নিয়েই।'

'কোথায় উঠেছ? বাড়ি খালি, চলে এসো আমার ওখানে।' অনুরোধের সুরে বললেন নাসিম।

'হোটেলে উঠেছি। আপনি চাইলে...

'চলে এসো, আর বোধহয় ফিরবে না অ্যানি।'

পাশে এসে থেমেছে লাল টয়োটা করোলা। জানালা খোলা, ওদিক দিয়ে বলল মানামি, 'ডক্টর, আপনার ভাইকে নিয়ে উঠে পড়ুন।'

প্রফেসরকে পিছনের সিটে উঠতে সাহায্য করল রানা, নিজেও পাশে বসল। দরজা বন্ধ হতেই হোটেলের মেইন গেট দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল মানামির গাড়ি।

'এভাবে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি,' বলল মেয়েটা। 'আমার বাবা আপনার ব্যাপারে আগ্রহী বলেই আসতে হয়েছে।'

'এখন বোধহয় এসব আলাপের সময় নয়,' বলল রানা।

ওকে পাত্তা দিল না মানামি, একটা ফটো বের করে ডক্টরের দিকে বাড়িয়ে দিল। 'এই ছবি দেখলে বুঝবেন কী বিষয়ে আলাপ করতে চান বাবা।'

'জিনিসটা কী?' ঝাপসা চোখে ছবি দেখলেন নাসিম। আস্তে করে মাথা নাড়লেন। 'রানা, তুমি বুঝতে পারছ এটা কী?'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। 'ইউনিস, নাসিম ভাই। আনম্যান্‌ড্‌ নটিকাল ইনফর্মেশনাল্‌ সাবমারসিবল।'

প্রিয় বিষয় পেয়ে একটু যেন স্বস্তি বোধ করলেন নাসিম।

চার

'এর সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?' শীতল হাওয়া জুড়িয়ে দিচ্ছে শরীর, কিন্তু জেদ করে জেগে আছেন নাসিম।

সাঁই-সাঁই যেন উড়ে চলেছে মানামির করোলা।

নাসিমের হাতের ওই ছবিটা তোলা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের আটত্রিশ হাজার ফুট গভীরে। ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের রঙিন ছবি। ছবির্‌ মাঝখানে ইউনিস— রিমোট-সেন্সিং ডিভাইস। ওটার কাজ সাগর-তলদেশ পর্যবেক্ষণ করা। আজকাল আধুনিক রিসার্চের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে এসব রোবট।

সমুদ্রের নীচে গবেষণার জন্যে এ জিনিস আবিষ্কার করেছেন মণ্টেরেইর সিনোসুকা ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের প্রধান তামেশু সিনোসুকা। ভূমিকম্প পরিমাপের জন্যে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের কয়েকটি বিশেষ জায়গায় নামিয়ে দেয়া হয়েছে চারটে টাইটেনিয়াম ইউনিস সাবমারসিবল।

'এসব রোবট ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিতে সমস্যা হয়নি।' ফ্রিওয়ে ধরে ছুটে চলেছে মানামির গাড়ি। 'এমন কী আমার খুঁতখুঁতে বাবাও খুশি হয়ে ওঠেন।'

ইন্সটিটিউটের সারফেস শিপ নিতু একের পর এক অকল্পনীয়

ডেটা পেতে থাকে। আগ্রহী হয়ে ওঠেন প্রশান্ত মহাসাগরের চারপাশের সব সায়েন্টিস্ট।

কিন্তু গোলমাল শুরু হলো মাত্র চার সপ্তাহ পর।

'লঞ্চ করবার আটাশ দিনের মাথায় ডেটা দেয়া বন্ধ করল একটা ইউনিস রোবট,' বলল মানামি। 'তার দুই সপ্তাহ পর চুপ হয়ে গেল আরও দুটো ইউনিট। তার পরের সপ্তাহে আরেকটা। বাবা বুঝলেন, এবার কিছু করতেই হবে।' রিয়ারভিউ মিররে ডক্টর নাসিমের দিকে চাইল মানামি। 'উনি আমার ভাইকে নীচে পাঠালেন অ্যাবিস গ্লাইডারে করে।'

'টয়োডাকে?'

'আমাদের ইন্সটিটিউটের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পাইলট ও।'

'কারও উচিত নয় একা অত নীচে যাওয়া।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাসিম।

'আপনি ঠিকই বলেছেন। বাবাকে বললাম, ওর সঙ্গে অন্য গ্লাইডারে করে যাওয়া উচিত আমার।'

'তুমি?' অবাক হয়েছেন নাসিম।

মেয়েটির বয়স হবে বড়জোর একুশ কি বাইশ।

রিয়ার ভিউমিররে কড়া চোখে ডক্টরকে দেখে নিল মানামি। 'আপনার আপত্তি আছে মনে হয়? আপনি বোধহয় জানেন না অনেকের চেয়ে ঢের ভাল অ্যাকুনট আমি।'

'নিশ্চয়ই,' তর্কে জড়াতে চাইলেন না নাসিম। বললেন, 'কিন্তু পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট নীচের পরিবেশ একেবারেই অন্যরকম। আগে কত হাজার ফুট নেমেছ তুমি?'

'দু'বার। ষোলো হাজার ফুট, কোনও সমস্যাই হয়নি।'

'নট ব্যাড,' মন্তব্য করল রানা।

'আপনি বোধহয় বলতে চাইছেন, মেয়েদের তুলনায়?' আড়ষ্ট সুরে বলল মানামি।

'না, তা বলিনি,' বলল রানা। 'খুব কম লোকই অত নীচে নেমেছে।' কয়েক মুহূর্ত বিরতি দিয়ে বলল, 'আপনি বোধহয় কোনও কারণে আমার ওপর রেগে আছেন?'

'না, তা নয়,' লজ্জা পেয়ে হাসল মানামি। 'আমি আসলে বিরক্ত অন্য কারণে। আমার বাবা পুরনো আমলের জাপানি। তাঁর এখনও ধারণা মেয়েদেরকে আগলে রেখে দেখভাল করতে হবে।'

চুপ করে ঝিমিয়ে চলেছেন নাসিম। হঠাৎ বললেন, 'আমি তো রানার সঙ্গে তোমার পরিচয়ই করিয়ে দিইনি!'

'আমি মাসুদ রানা,' বলল রানা।

'আর আমি মানামি সিনোসুকা,' বলল মেয়েটি।

'তারপর কী হলো, মানামি?' বেসুরো স্বরে জানতে চাইলেন নাসিম।

'তারপর বলতে কী বোঝাতে চাইছেন?' অবাক হয়ে বলল মানামি।

'উনি জানতে চাইছেন আপনার ভাই খাদের ভিতর নামার পর কী হলো,' বলল রানা।

'কোনও সমস্যা হলো না। খুঁজে পেয়ে গেল ইউনিসগুলোকে। ডিভিডি ক্যামকর্ড দিয়ে ছবি তুলল। আপনারা যে ছবি দেখছেন, ওটা এসেছে ওর কাছ থেকেই।'

গাড়ির ভিতরের বাতি জ্বেলে ভাল করে ছবিটা আরেকবার দেখতে চাইলেন নাসিম। এবার চিনতেও পারলেন।

তাঁর পাশ থেকে দেখছে রানা।

ক্যানিয়নের তলদেশে পড়ে আছে ইউনিস সাবমারসিবল। ফেটে গেছে গোলচে দেহ। মুচড়ে আছে ট্রাইপডের পাগুলো। ছিঁড়ে পড়েছে ব্র্যাকেট। পুরো এবড়োখেবড়ো টাইটেনিয়াম আবরণ।

ছবিতে আরও মনোযোগ দিলেন নাসিম।

'রানা, খেয়াল করো, সোনার প্লেট নেই।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

'ওটা ভাটির দিকে দূরে পেয়েছে টয়োডা,' বলল মানামি। 'তুলেও এনেছে। ওটা এখন মন্টেরেইতে ইন্সটিটিউটের দপ্তরে। আর সে কারণেই আমি এখানে। বাবা চান আপনি একবার দেখবেন ওটা।'

রানার দিকে চাইলেন নাসিম। 'যাবে, রানা?'

'ছুটি চলছে, নাসিম ভাই, আপনি চাইলে নিশ্চয়ই যাব,' বলল রানা। এই দুঃসময়ে প্রিয় মানুষটাকে একা ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না ওর।

'আপনারা সকালে আমার সঙ্গে বিমানে করে যেতে পারেন,' বলল মানামি। 'সকাল আটটায় ইন্সটিটিউটের বিমানে করে ফিরব।'

চিন্তায় পড়ে গেছেন নাসিম। আরেকটু হলে পেরিয়ে যেতেন তাঁর বাড়ি।

'মিস সিনোসুকা, বামের ড্রাইভওয়ে,' বলে উঠল রানা।

ঝরা পাতায় মোড়া রাস্তা দিয়ে ড্রাইভওয়েতে ঢুকে পড়ল মানামি, থামল গিয়ে সুন্দর এক স্প্যানিশ কলোনিয়াল বাংলোর সামনে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে নাসিমের দিকে ঘুরে চাইল মানামি।

'তোমার বাবা কি আমাকে শুধু সোনার প্লেট দেখাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন?' শান্ত স্বরে বললেন নাসিম। পরিষ্কার হয়ে আসছে মগজ।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল মানামি, তারপর বলল, 'জানি না, ডক্টর। আমাদের জানা নেই অত নীচে কী ঘটেছে। বাবা ভাবছেন, আপনি হয়তো ভাল কোনও সূত্র পাবেন। অভিজ্ঞ মতামত চাইছেন তিনি।'

'আমার পরামর্শঃ ভুলেও ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের ধারে-কাছে যাওয়া উচিত নয়। জায়গাটা অনেক বেশি বিপজ্জনক। বিশেষ করে একজনবাহী সাবমারসিলের জন্যে।'

'আমি মনে করি না ওখানে কোনও বিপদ হবে,' একটু কড়া স্বরেই বলল মানামি। 'আপনি তো রিটায়ার করেছেন, হয়তো নরম হয়ে গেছে নার্ভ। কিন্তু টয়োডা বা আমি ঠিকই নামব ওখানে। ...আসলে কী হয়েছে আপনার, ডক্টর? চারবছর আগে যখন আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো, মনে হয়েছিল আপনি টগবগ করছেন আরবি ঘোড়ার মত।'

'মানামি, ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ অনেক বেশি গভীর, অনেক বেশি বিপজ্জনক।'

'বিপজ্জনক?' শ্লেষের সুরে বলল মানামি। 'আপনি কি ষাট ফুটি শ্বেত-হাঙরের হামলার ভয় পাচ্ছেন?'

'না, তা নয়,' ক্লান্ত স্বরে বললেন নাসিম। 'তবে সত্যিকারের দক্ষ পাইলট হতে হবে ওখানে নামতে হলে। আর বুক হতে হবে দুঃসাহসে ভরা।'

'ডক্টর, ওই কয়েক সপ্তাহের ডেটা অনেক কাজে এসেছে। যদি ওই আর্থকোয়েক ডিটেকশন সিস্টেম কাজ করে, আমরা বাঁচাতে পারব হাজার হাজার মানুষের প্রাণ। আপত্তি থাকলে আপনি এয়ারপোর্টে আসবেন না। তবে আমার বাবা আপনাকে ওখানে নামার আমন্ত্রণ জানাবেন বলে আমার মনে হয় না, তিনি আপনার সহায়তা চেয়েছেন সোনার প্লেট পরীক্ষা করার জন্য। তা ছাড়া, আমার ভাইয়ের তুলে আনা ছবি দেখবেন। কাজ দুটো করতে আপনার লাগবে বড়জোর দু'ঘণ্টা। আগামীকাল রাতেই ফিরতে পারবেন। আর বদলে বাবা আপনাকে দেখাবেন তাঁর স্বপ্ন— তিমির লেগুন।'

জাপানি বিজ্ঞানী তামেশু সিনোসুকাকে সিনিয়র বন্ধু বলেই

মনে করেন নাসিম আহমেদ। গত কয়েক বছরে তাঁর বন্ধুর সংখ্যা খুবই কমে এসেছে, কিন্তু এঁর বন্ধুত্বে একটুও চিড় ধরেনি।

'রানা আর আমি কখন রওনা দিচ্ছি?' জানতে চাইলেন।

'সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে চলে আসবেন কমিউটার এয়ারপোর্টে।'

'তারমানে ওই খুদে বিমানের একটায় করে...' ঢোক গিললেন নাসিম।

'চিন্তা করবেন না, ডক্টর,' হাসল মানামি। 'আমি ভাল করে চিনি পাইলটকে। সকালে দেখা হবে।'

রানার সহায়তা নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন নাসিম।

দরজার দিকে চলেছে ওরা।

পিছন থেকে চেয়ে রইল মানামি। ওর চোখ পড়ে আছে ওই বাঙালি যুবকের উপর। কেন যেন দীর্ঘশ্বাস এল একটা। ইঞ্জিন চালু করে রওনা হয়ে গেল ফিরতি পথে।

রানাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকবার পর, প্রথমেই নাসিমের মনে হলো, নিজের বাড়িতে যেন তিনি অনাহূত আগন্তুক। নাকে আসছে অ্যানির দামি পারফিউমের সুবাস। বুকটা মুচড়ে উঠল ওঁর, আর বোধহয় কখনও ফিরবে না অ্যানি। জীবনের প্রথম প্রেম, সত্যিই ভালবেসেছিলেন তিনি ওকে... বদলে কী পেলেন? টিটকারি ও লাঞ্ছনা। যে বন্ধুকে নিজের ভাইয়ের মত বিশ্বাস করেছিলেন, তার সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে গেছে অ্যানি। তারপরও কেন যেন মনটা খুব শক্ত করতে পারলেন না নাসিম।

ডাইনিং রুমে ঢুকতেই রানাকে বললেন, 'চলো, স্টাডিতে বসি। কয়েকটা ব্যাপার দেখে নেয়া ভাল।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

স্টাডিতে এখনও চলছে কমপিউটার।

নাসিমের পাশে চেয়ার টেনে বসল রানা।

ইন্টারনেটে ঢুকলেন নাসিম। কি-বোর্ডে টাইপ করে সিনোসুকা ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের ওয়েব অ্যাড্রেস লিখলেন।

'রানা, ওরা টাইটেনিয়াম ব্যবহার করছে,' চাপা স্বরে বললেন নাসিম। 'তারপরও ইউনিসের বারোটা বেজে গেছে।'

'হয়তো আপনার কথাই ঠিক। সত্যিই নীচে আজও টিকে আছে কারকারোডন মেগালোডন,' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলালেন নাসিম। 'ওরা যদি নীচে নামতে অনুরোধ করে, আমি তা পারব না, রানা। শেষ ডাইভের পর ভীষণ ক্লস্ট্রোফোবিয়া হয়েছিল। একবার ধরলে এ রোগ কখনও সারে না। নিয়মিত ওষুধ খেলে একটু সুস্থ থাকা যায়।'

'আপনাকে ডাইভ দিতে অনুরোধ না-ও করতে পারে,' বলল রানা।

'তা হলেই ভাল। ...কিন্তু সত্যিই যদি ভাল পাইলট চায়, হয়তো পেয়েও যাবে। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, নুমার ডিপ-সি সাবমারসিবলগুলো টেস্ট করছিলে?'

চট্ করে বড় ভাইয়ের মত মানুষটার দিকে চাইল রানা।

'জী।'

'তুমি তো ছুটিতে, রানা?'

'জী, নাসিম ভাই।'

'সত্যি যদি ওরা বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহ দেখায়, তোমার কথা কি ওদেরকে বলতে পারি?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল রানা, তারপর বলল, 'বলতে পারেন, নাসিম ভাই। আপাতত আমার কোনও কাজ নেই।'

'তা হলে এসো ইউনিস সম্পর্কে জেনে নেয়া যাক,' বললেন নাসিম।

কয়েক সেকেণ্ড পর মনিটরে ভেসে উঠল সিনোসুকা

ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের ইউনিস প্রজেক্টের তথ্য:

উনিশ শ' নিরানব্বুই সালে ইউনিস বা আনম্যান্‌ড্ নটিক্যাল ইনফর্মেশনাল সাবমারসিবলের নকশা তৈরি করেন তামেশু সিনোসুকা। মূল উদ্দেশ্য: ওয়াইল্ড ওয়েইল পপুলেশন স্টাডি করা। দু'হাজার পাঁচ সালে এ প্রজেক্টের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠল জ্যামসটেক বা জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেণ্টার। গভীর সাগরের খাদে সাইসমিক ডিসটার্বেন্স রেকর্ড করতে চাইল তারা। এ কাজে ব্যবহার করা ইউনিস সিস্টেমগুলোকে মুড়ে দেয়া হলো তিন ইঞ্চি টাইটেনিয়াম আবরণ দিয়ে। ইউনিটের নীচে থাকল রিট্র্যাক্টেবল পা। প্রতিটা সাবমারসিবলের ওজন দুই হাজার সাত শ' পাউণ্ড। প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে সহ্য করবে পঁয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ড চাপ। ফাইবার অপটিক কেবলের মাধ্যমে উপরের জাহাজে তথ্য পাঠাবে।

পরের প্যারায় লেখা হয়েছে ইউনিস ইন্সট্রুমেণ্টেশন:

ইলেকট্রিকাল ফিল্ড।

মিনেরাল ডিপোযিট্স্।

স্যালিনিটি সাইসমিক ইকুইপমেণ্ট।

টপোগ্রাফি।

ওয়াটার টেম্পারেচার।

মনোযোগ দিয়ে ইউনিস সিস্টেমের ইঞ্জিনিয়ারিং রিপোর্ট পড়তে শুরু করেছে রানা ও নাসিম।

একটু পর বোঝা গেল, সত্যিই খুব সহজ ডিযাইন করা হয়েছে। রাখা হয়েছে সাইসমিক ফল্টের লাইনে। সামান্যতম ভূমিকম্প শুরু হলেই সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরবে ওই ইউনিট।

রানার মনে পড়ল, জিয়োগ্রাফিকালি দক্ষিণ-জাপান আছে তিনটে টেকটোনিক প্লেটের উপর। একে অপরের উপর চেপে বসতে চাইছে এসব প্লেট। ফলে পৃথিবীর দশভাগের একভাগ

ভূমিকম্প হচ্ছে ওই এলাকাতেই। উনিশ শ' তেইশ সালে ভয়ঙ্কর এক ভূমিকম্পে মারা পড়ে এক লাখ চল্লিশ হাজার জাপানি।

আবারও মনিটরে মন দিল রানা।

দু' হাজার সাল থেকেই নিজের স্বপ্নের প্রজেক্ট বাস্তবায়নে ফাণ্ড জোগাড় করতে নানাদিকে ছুটছিলেন তামেশু সিনোসুকা। পরে ওই ফাণ্ড দিতে রাজি হয় জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেণ্টার। বদলে তাদেরকে বানিয়ে দিতে হবে পঁচিশটা ইউনিস ইউনিট। ওগুলো মনিটর করবে চ্যালেঞ্জার ডিপের সাইসমিক অ্যাক্টিভিটি।

কয়েক বছর পর সফলভাবে সাগর-তলে নামিয়ে দেয়া হলো প্রথম তৈরি চারটি ইউনিস ইউনিটকে। শুরু হলো সাত মাইল উপরের জাহাজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিগড়ে গেল সবকটা আনম্যান্‌ড্ সাবমারসিবল।

আর এখন নাসিম ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইছেন তামেশু সিনোসুকা, ভাবল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝল, সত্যি যদি রহস্যটা সমাধানের জন্য সাবমারসিলে করে সাগরের সাত মাইল নীচে যেতে বলেন জাপানি ভদ্রলোক, ও খুশি মনেই যাবে।

নাসিম আহমেদ পুরো পেজ পড়া শেষ করেছেন। আরেকটা অ্যাড্রেস লিখে ক্লিক করলেন।

কয়েক সেকেণ্ড পর পর্দায় ভেসে উঠল নতুন ফাইলের তথ্য:

ওয়েস্টার্ন প্যাসিফিক ওশন:

ফিলিপাইনের কাছে গুয়াম, ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ।

ফ্যাক্টস্: পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর খাদ। গভীরতা পঁয়ত্রিশ হাজার আট শ' সাতাশ ফুট। ১০,২৯০ মিটার। দৈর্ঘ্যে পনেরো শ' পঞ্চাশ মাইল বা আড়াই হাজার কিলোমিটার। এ গভীর ক্যানিয়ন পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘ ফাটল। ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের সবচেয়ে গভীর অংশ চ্যালেঞ্জার ডিপ। চ্যালেঞ্জার-টু এক্সপেডিশনের সময়

উনিশ শ' একান্ন সালে ওই গভীর ক্যানিয়ন আবিষ্কার হয়। ওখানে এক কেজি ওজনের একটা পাথর উপর থেকে ফেলে দিলে তলদেশে ওটার পৌঁছুতে লাগবে একঘণ্টারও বেশি।

এক্সপ্লোরেশন (ম্যানড্): উনিশ শ' ষাট সালের তেইশ জানুয়ারি ইউ.এস. নেভির ট্রিয়েস্ট নামের ব্যাথিসক্যাফ নেমে যায় পঁয়ত্রিশ হাজার আট শ' ফুট, বা ১০,২৮১ মিটার। ওটা প্রায় ছুঁয়ে দেয় চ্যালেঞ্জার ডিপের তলদেশ। ওই ইস্পাতের গোলকের ভিতর ছিলেন ইউ.এস. নেভির লেফটেন্যান্ট ডোনাল্ড ওয়াল্‌শ্ ও সুইস ওশনোগ্রাফার জ্যাকুস পিকার্ড। ওই একই বছর ফরাসিদের ব্যাথিসক্যাফ আর্খিমেদ একইরকম ডাইভ দেয়।

এই দুটি ব্যাথিসক্যাফ সরাসরি নেমে যায়, এবং সরাসরিই উঠে আসে জাহাজে।

এক্সপ্লোরেশন (আনম্যানড্): উনিশ শ' তিরানব্বুই সালে জাপান সাগরতলে নামিয়ে দেয় কেইকো। ওটা আনম্যানড্ রোবটিক ক্রাফট। সোজা নেমে যায় ৩৫,৭৯৮ ফুট, তারপর ভেঙে পড়ে। এরপর দু'হাজার তেরো সালে চ্যালেঞ্জার ডিপের তলদেশে নামিয়ে দেয়া হয় চারটি ইউনিস রোবটিক সাবমারসিবল। এ কাজের কৃতিত্ব সিনোসুকা ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের।

আর কোনও তথ্য নেই।

'রানা, নুমার টপ সিক্রেট এক্সপ্লোরেশনগুলোর কোনও তথ্য নেই কেন?' জিজ্ঞেস করলেন নাসিম।

'ওরা একেবারেই প্রচার চায় না।'

উঠে দাঁড়ালেন নাসিম। 'সকালে উঠতে হবে, এবার গেস্টরুমে গিয়ে শুয়ে পড়ো।' রানার মধ্যে নড়ার লক্ষণ না দেখে বললেন, 'তুমি কি আরও কিছু দেখতে চাও? আর শরীর চলছে না, আমি ঘুমাব।'

নাসিম আহমেদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক নয় রানার। আস্তে করে মাথা দোলাল ও। 'আপনি গিয়ে শুয়ে পড়ুন, নাসিম ভাই। আমি আর একটু চোখ বুলিয়ে হোটেলে ফিরব। কাল সকালে আপনাকে এখান থেকে তুলে নেব। ঠিক আছে?'

নাসিম চলে গেলেন মাস্টার বেডরুমের দিকে।

আরও ফাইল ঘাঁটতে শুরু করেছে রানা।

নেভাল এক্সপ্লোরেশন নামে সার্চ দিল ও।

বড় বড় অক্ষরে এল তথ্য:

নেভাল এক্সপ্লোরেশনঃ (দেখুন) ট্রিয়েস্ট। ১৯৬০।

সি অ্যাডভেঞ্চার। ২০১০।

উপরের ডেটাগুলোতে সি অ্যাডভেঞ্চারের কথা আসেনি কেন, ভাবল রানা। ক্লিক করে ডেটা চাইল ও।

সি অ্যাডভেঞ্চারঃ

অ্যাকসেস ডিনায়েড

অথোরাইযড় ইউ.এস. নেভাল

পারসোনেল ওনলি।

পাকা হ্যাকার রায়হান রশিদের কথা মনে পড়ল রানার। ওকে দরকার ছিল এখন। ঠিক বের করে আনত ইউ.এস. নেভির পেটের সব কথা।

দুই মিনিট পর কমপিউটার বন্ধ করে বাইরের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে গেল রানা। হোটেলে ফিরে বিছানায় পিঠ লাগাতেই ঘুমে জড়িয়ে এল ওর চোখ। ঠিক ভোর পাঁচটার সময় ঘুম থেকে তুলে দেবে ওকে মনের ঘড়ি।

হোটেল রুমে জেগে আছে একাকী মানামি সিনোসুকা।

স্কুলের কিশোরী ছাত্রী বলে মনে হচ্ছে ওর নিজেকে।

বালিশের উপর কনুই রেখে মনের চোখে দেখছে মাসুদ

রানার চেহারাটা।

ওই যুবকের কোনও ছবি থাকলে বড্ড ভাল হতো, মন ভরে দেখা যেত।

কী অদ্ভুত পৌরুষদীপ্ত চেহারা!

আর কী সহজে ঠাণ্ডা করে দিল পার্টির ওই মারমুখো তাগড়া জোয়ান লোকটাকে!

কুচকুচে কালো চোখের মণিদুটো বড় মায়াময়।

আর ওই অদ্ভুত ভরাট কণ্ঠ?

ঠিক যেন সিংহের মত গম্ভীর।

আসলে কে মানুষটা?

মনে হয় না ডক্টর নাসিম আহমেদের ভাই।

বংশপদবীও মেলে না।

কেন যেন তাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়।

যদিও কোনও কারণ নেই।

এবার মনকে শাসন করতে শুরু করল মানামি।

প্রথম সাক্ষাতেই এত আকর্ষণ কেন, ছেমড়ি? প্রেম?

তুই তো এত বোকা ছিলি না, মানামি!

আরও কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করার পর হারিয়ে গেল রানা।

ঘুমিয়ে পড়ল ও।

পাঁচ

পার্কিং লট পেরিয়ে কমিউটার এয়ারপোর্টে টারমাকের দিকে চলেছেন নাসিম আহমেদ, পাশে ডাফ্ল্ ব্যাগ কাঁধে মাসুদ রানা।

বিমানের গায়ে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছে মানামি। দুই অতিথি কাছে আসতেই বলল, 'গুড মর্নিং প্রফেসর, মিস্টার রানা।'

'গুড মর্নিং, মিস সিনোসুকা,' মৃদু হাসল রানা।

'গুড মর্নিং, মানামি।' প্লেনটা দেখে মুখ শুকিয়ে গেছে নাসিম আহমেদের। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'ভাবিনি প্লেনটা এত ছোট হবে।'

'কই ছোট, বিচক্রাফট হিসাবে বেশ বড়ই তো,' আপত্তি তুলল মানামি। চট্ করে ককপিটে উঠে প্রি-ফ্লাইট চেকলিস্ট দেখতে শুরু করল।

বিমানটা টুইন-টার্বো, ফিউজেলাজে তিমির লোগো। নীচে ছোট করে লেখা: সিনোসুকা ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউট।

কেবিনে উঠে পড়েছেন নাসিম। একবার দেখলেন চারপাশ। 'তোমার পাইলট কই, মানামি?'

তাঁর পাশের সিটে বসল রানা, চুপ।

কাজ ফেলে ককপিটের দরজায় চলে এল মানামি। কোমরে দুই হাত রেখে হাসল।

'তুমিই পাইলট?' মস্ত ঢোক গিললেন নাসিম।

'অসুবিধে কী, প্রফেসর?' ভুরু কুঁচকে গেল মানামির।

'না... আসলে...' ক্লস্ট্রোফোবিয়া ধরতে চাইছে নাসিমকে।

ককপিটে ফিরল মানামি, পাইলটের সিটে বসে দ্রুত শেষ করছে ইন্সপেকশন। সেই ফাঁকে বলল, 'ভয় পাবেন না, প্রফেসর, আমি ছয় বছর ধরে বিমান চালাই।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন নাসিম। আসলে বয়স হচ্ছে তাঁর, ভাবতে ভাল না লাগলেও এখন আর তিনি তরুণ নেই। মাত্র তিনবছর আগের সেই উদ্দাম উত্তাপ নেই, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে রক্ত।

'আপনি সুস্থ তো, নাসিম ভাই?' পাশ থেকে বলল রানা। আটকে দিতে শুরু করেছে ওঁর সিটবেল্ট।

ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন নাসিম।

ককপিট থেকে বলল মানামি, 'চাইলে আপনাদের যে-কেউ ককপিটে এসে বসতে পারেন।'

ওপাশে কন্ট্রোল প্যানেলের ডায়াল ও মিটারগুলো দেখতে পেলেন নাসিম, আরেকবার ঢোক গিললেন।

'আমি এখানেই ভাল আছি,' শুকনো স্বরে বললেন।

'মিস্টার রানা?' বলল মানামি, 'আপনি ইচ্ছে করলে ককপিটে আসতে পারেন।'

নাসিম আহমেদের সিটবেল্ট আটকে দিয়েছে রানা, কয়েক মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, 'আসছি।'

'এক গ্লাস পানি পেলে...' বিড়বিড় করলেন নাসিম।

পিছনে ফ্রিয আছে, ওটার কাছে চলে গেল রানা, ডালা খুলে পানির বোতল পেয়ে তুলে দিল নাসিমের হাতে। খেয়াল করল, অল্প অল্প কাঁপতে শুরু করেছে ওঁর হাত।

ঢকঢক করে অর্ধেক বোতল শেষ করলেন তিনি, তারপর ব্রিফকেস খুলে বের করলেন ছোট, সবুজ এক বোতল। ওটার ভিতর থেকে নিলেন হলদে দুটো বড়ি। ক্লস্ট্রোফোবিয়ার। গভীর সাগরে দুর্ঘটনার পর থেকে ব্যবহার করতে হয়। আজকাল আকাশে উড়লেও সমস্যা হয় তাঁর। উচ্চতা পছন্দ করেন না একদম। পানি দিয়ে গিলে নিলেন বড়ি, তারপর চুপ করে চোখ বুজে বসে রইলেন।

রানা খেয়াল করল, ধীরে ধীরে কমে আসছে নাসিমের হাতের থির-থির কাঁপন। আরও পাঁচ সেকেণ্ড পাশেই রইল ও, তারপর নিঃশব্দে গিয়ে বসল কো-পাইলটের সিটে।

মন্টেরেইর দিকে উড়ে চলেছে খুদে বিমান।

টুকটাক কথা ছাড়া প্রায় নীরবেই কেটে গেছে আড়াই ঘণ্টা। বিমান চালনায় পূর্ণ মনোযোগ দিয়েছে মানামি, মাঝে মাঝে পাশ থেকে দেখছে ওকে রানা। আকাশ চিরে এই উড়ে যাওয়া উপভোগ করছে ও।

বিগ সারের উপকূলে দুটো তিমি দেখতে পেয়েছে মানামি। ওগুলো তীর ঘেঁষে চলেছে দক্ষিণে। 'দেখুন, ওই যে নীল তিমি! আজকাল আর ওদের দেখাই যায় না। বিরল প্রজাতি।'

'বাজা-র দিকে চলেছে,' মন্তব্য করল রানা।

জানালা দিয়ে নীচে চেয়ে আছেন নাসিম আহমেদ, ভয় কেটেছে খানিকটা।

'ডক্টর, আসলে লেকচারের সময় আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি,' বলল মানামি। 'কিন্তু বাবা বলেছিলেন, আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। আমার অবশ্য মনে হয়, আপনার সময় নষ্ট না করলেও চলত। এমন নয় যে আমাদের আরেকজন সাবমারসিবল পাইলট দরকার।'

'গুড,' বললেন নাসিম। 'কারণ আমি নিজেও আগ্রহী নই।'

'তা হলে তো ভালই,' বলল মানামি। নতুন করে গরম হয়ে উঠতে শুরু করেছে ওর রক্ত। 'আপনি হয়তো আমার বাবাকে বোঝাতে পারবেন, আসলে টয়োডার সঙ্গে আমিই যেতে পারি দ্বিতীয় অ্যাবিস গ্লাইডারে করে।'

'এ কথা বলা উচিত হবে না আমার,' আবারও জানালা দিয়ে নীচে চাইলেন নাসিম।

'কেন উচিত হবে না, প্রফেসর?'

কেবিন থেকে বললেন নাসিম, 'প্রথম কথা, আমি কখনও তোমার সাবমারসিবল পাইলটিং দেখিনি। বিষয়টা আকাশে বিমান চালনার চেয়ে অনেক জটিল। অত নীচে সবার মনে প্রচণ্ড চাপ...'

ধাঁই করে মাথায় রক্ত চেপে গেল মানামির। 'চাপ? আপনি বোধহয় গভীর চাপের কথা ভাবছেন?' ঝট্ করে বিচক্রাফটের হুইল পিছিয়ে নিল ও, একের পর এক তিন শ' ষাট ডিগ্রির বৃত্ত তৈরি করতে শুরু করেছে শূন্যে। তারপর নাক নিচু করে ডাইভ দিল নীচে। সাঁই-সাঁই করে নেমে যাচ্ছে বিমান। বুক আঁকড়ে দিচ্ছে প্রচণ্ড জি ফোর্স।

কয়েক সেকেণ্ড পর পিছন থেকে হড়হড় করে বমির আওয়াজ পেল মানামি, সেই সঙ্গে টকটক বাজে দুর্গন্ধ।

'যথেষ্ট হয়েছে,' চাপা স্বরে বলল রানা।

'না, যথেষ্ট হয়নি, রাগ কমেনি মানামির।

কো-পাইলটের সিট থেকে খপ্ কন্ট্রোল প্রায় কেড়ে নিল রানা, কয়েক সেকেণ্ডে সিধে করে ফেলল বিমান।

কড়া চোখে ওকে দেখছে মানামি। আড়ষ্ট স্বরে বলল, 'ও, আপনি তা হলে প্লেনও চালাতে পারেন!'

রেগে গেছে রানাও। 'অনেকের চেয়ে ভালই পারি। কোনও আনাড়ি, মাথাগরম পাইলটের কারণে মরার ইচ্ছে নেই। আর এটাও জেনে রাখো, বিমান চালানোর চেয়ে অনেক বেশি ভাল লাগে আমার সাবমারসিবল নিয়ে সাগরের হাজার হাজার ফুট নীচে নেমে যেতে।'

মেয়েটার চোখের তারায় ভয় দেখল রানা। বোধহয় মন দুলতে শুরু করেছে। মনে হয়, বাবা এই যুবককেই কাজটা দিয়ে দেবেন। কে এই লোক!

'এবার হয়তো ঠিকভাবে বিচক্রাফট চালাতে পারবে,' সুন্দরীর বুকে গজাল বসিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। পিছনে গিয়ে নাসিম আহমেদের অবস্থা বুঝতে হবে।

ককপিট থেকে বেরিয়ে গেল ও।

নাকের উপর ওয়ায়ার-রিম্ড্ বাইফোকাল চড়িয়ে নিয়ে হোটেলের

৮০৫ নম্বর সুইটের দরজায় টোকা দিল সাংবাদিক ডন রে।

পেরিয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ড, ওদিক থেকে খুলছে না কেউ দরজা।

আবারও নক করল সে।

এবার খুলে গেল দরজা।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অ্যানি আহমেদ, চোখে ঘুম। পরনে প্রায় স্বচ্ছ সাদা রোব। বুক ধরতে গেলে খোলাই। ব্রোঞ্জ রঙের উদ্ধত স্তন পরিষ্কার দেখা গেল।

'ডন! ক্রাইস্ট! বাজে কয়টা?'

'সাড়ে দশটা, রাতে বোধহয় বেশি ব্যস্ত ছিলে?'

তৃপ্তির হাসি হাসল অ্যানি। 'খুব বেশি নয়। ডোনোভানের পাশে ঘুম আমার ঠিকই হয়েছে, কিন্তু নাসিম বোধহয় ঘুমাতে পারেনি।' বিশাল সাদা ডিভান ও প্রকাণ্ড টিভি দেখাল সে। হাতের ইশারা করে পিছিয়ে গেল।

'সুন্দর সুইট। ডোনোভান কোথায়?' ভিতরে ঢুকল ডন রে।

সে একটা আরামকেদারায় বসবার পর ডিভানের কোণে বসল অ্যানি। 'দু' ঘণ্টা আগে বেরিয়ে গেছে। অডিটোরিয়ামের লেকচারে ভালভাবেই নাসিমকে বিব্রত করতে পেরেছ।'

'সত্যিই কি এসব দরকার ছিল, অ্যানি? আমার তো মনে হয়েছে ভদ্রলোক যথেষ্ট...'

'তা হলে পারলে তুমিই গিয়ে ওকে বিয়ে করো। ছয়বছর সহ্য করেছি, আর নয়!'

'তা হলে ডিভোর্স দাও, ঝামেলা মিটে যাক।'

'ব্যাপারটা অত সহজ নয়, ডন। এখন মিডিয়ার চোখ পড়েছে আমার ওপর। আমার এজেন্ট বলে দিয়েছে, এখন থেকে খুব সাবধানে চলতে হবে। পাবলিক যেন খুঁত বের করতে না পারে।

এ শহরে নাসিমের অনেক বন্ধু, তাদেরকে চটিয়ে দিতে চাই না। কিন্তু একবার যদি নাসিমকে পাগলাটে বলে প্রমাণ করা যায়, কেউ বলবে না ডিভোর্স দিয়ে ভুল করেছি। গতরাতের ঘটনাগুলো আমার পক্ষেই যাবে।'

'বেশ। এখন আমার পরের কাজ কী?'

'নাসিম এখন কোথায়?'

নোটবুক বের করে চোখ বুলিয়ে নিল ডন রে। 'প্রথমে বাড়ি ফিরেছে। সঙ্গে ওই জাপানি মেয়েটাও ছিল।'

খিলখিল করে হেসে ফেলল অ্যানি। 'নাসিম? ওর সঙ্গে আবার মেয়ে? ভাল হলো যে...'

'কথা শেষ করিনি, সঙ্গে ছিল বাংলাদেশি এক যুবক।'

'বাহ্! দু'জন মিলে এক মেয়ের সঙ্গে...'

'আবারও ভুল করছ। নাসিম আহমেদ আর মাসুদ রানা পুরস্কারের অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর ওদেরকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেছে মেয়েটা। সকালে ওদের পিছু নিয়ে গেছি কমিউটার এয়ারপোর্টে। ছোট এক বিমান নিয়ে মন্টেরেইর দিকে গেছে। আমার ধারণা, সিনোসুকা ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের নির্মাণাধীন তিমির লেগুন দেখতে গেছে।'

'ঠিক আছে, লেগে থাকো ওর পেছনে। আমাকে জানাবে কী করছে। আমি চাই আগামী সপ্তাহেই নেভির ওই দুর্ঘটনার কথা সবাই জানুক। জোর দেবে, নেভির দু'জন অফিসার মারা গেছে। ওই কাহিনি জমে উঠলেই আমার ইন্টারভিউ নেবে। তারপর দেরি না করেই ডিভোর্স চাইব। সবাই বুঝবে, বারবার সমাজের কাছে হেয় হওয়ায় অপদার্থ স্বামীকে ডিভোর্স দিয়েছে অ্যানি ল্যামবার্ট।'

'তুমিই বস্। কিন্তু একটা কথা, নাসিমের পিছনে যেতে হলে প্রথমেই ক্যাশ টাকা লাগবে।'

রোব পকেট থেকে পুরু, লাল খাম বের করল অ্যানি। 'ম্যাক্স

বলেছে খরচের রিসিটগুলো ওর কাছে জমা দিতে।'

মনে মনে তিক্ত হাসল ডন রে।

অ্যানির প্রেমিক কট্টর হিসাবী।

পাক্কা ব্যবসায়ী!

ছয়

'ওই যে!' উপকূলের দিকে আঙুল তাক করল মানামি।

সোনালী রোদ পড়ে ঝিলমিল করছে মণ্টেরেই উপসাগর।

বিমান নামাতে শুরু করেছে মানামি।

ওর পাশে কো-পাইলটের সিটে ফিরে এসেছে রানা।

কেবিনের ভিতর গরম সোডাতে চুমুক দিচ্ছেন নাসিম, আগের চেয়ে সুস্থ। ভাবছেন, তামেশু সিনোসুকাকে বলবেন, ভুলেও যেন ওই মাথাগরম মেয়েকে গভীর সাগরে নামতে না দেয়।

বিমান থেকে নীচে চেয়ে আছে রানা। ভোরে নাসিমের কাছে শুনেছিল, প্রশান্ত মহাসাগরের পাশেই মস ল্যাণ্ডিঙের দক্ষিণের সৈকতে তৈরি করা হয়েছে মস্ত এক লেগুন। শুধু জমি কিনতেই লেগেছে শত শত কোটি ডলার। ডিম্বাকৃতির লেগুন, এত উপর থেকে লাগছে দানবদের মস্ত এক সুইমিং পুলের মত। দৈর্ঘ্যে একমাইল, চওড়ায় আধমাইল। গভীরতা আশি ফুট। দু'পাশে বিশফুট উঁচু দেয়াল। লেগুনের দুই প্রান্তে অ্যাক্রেলিক উইণ্ডো। মহাসাগরের সঙ্গে লেগুনের সংযোগ দেয়া হয়েছে গভীর এক খাল কেটে।

আপাতত লেগুন খটখটে শুকনো। ওর ভিতর পিঁপড়ের মত পিলপিল করছে নির্মাণ-কর্মীরা। শিডিউল যদি ঠিক থাকে, আগামী একমাস পর খুলে দেয়া হবে লেগুনের প্রকাণ্ড ফটক। হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকবে মহাসাগরের জলরাশি।

এটাই হতে চলেছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অ্যাকুয়েরিয়াম।

'নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না,' বলল রানা।

টাচডাউনের জন্য তৈরি হচ্ছে মানামি, গর্বের হাসি হাসল।

এ অ্যাকুয়েরিয়াম সারাজীবনের স্বপ্ন তামেশু সিনোসুকার।

ওটা হয়ে উঠবে তাঁর লিভিং ল্যাবোরেটরি।

ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক পরিবেশে নিরাপদে থাকবে অসংখ্য মেরিন প্রজাতি। তার চেয়ে বড় কথা, বছরের বেশ কিছুদিন এখানে বাস করবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্তন্যপায়ী জন্তু— তিমি।

প্রতি শীতে ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে মিলনের জন্য আসছে দশ হাজার তিমি। আর এই লেগুন তৈরি শেষে খুলে দেয়া হবে দরজা— প্রকাণ্ড সব ম্যামাল আসবে। ধূসর তিমি, হাম্পব্যাক বা নীল তিমি নিরাপদে মনের সুখে ঘুরে বেড়াবে ভিতরে।

সত্যি, বোধহয় স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে তামেশু সিনোসুকার।

বিশ মিনিট পর রানা ও নাসিমের সঙ্গে দেখা হলো লেগুনের মালিকের। ছোটখাটো মানুষ তামেশু সিনোসুকা, হাসিখুশি।

'নাসিম! মাই গড! কতদিন পর দেখা,' বাউ করলেন তিনি। জুনিয়র বন্ধুকে বোধহয় জড়িয়েই ধরতেন, কিন্তু বমির গন্ধে ব্রেক কষে থেমে গেলেন। 'আর গুড মর্নিং, মিস্টার...' রানার দিকে কৌতূহল নিয়ে চাইলেন তামেশু।

'ও আমার কাজিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, মেজর মাসুদ রানা,' বললেন নাসিম। 'আমার আপন ভাইয়ের মতই। মস্ত অভিযাত্রী। বহুবার পাহাড়, জঙ্গল ও সাগরে দারুণ সব অভিযানে অংশ নিয়েছে।'

‘পরিচিত হয়ে খুবই খুশি হলাম, মিস্টার রানা,’ বললেন তামেশু।

‘আমিও,’ ছোট্ট করে বলল রানা।

‘নাসিম!’ আপাদমস্তক ডক্টরকে দেখলেন জাপানি ভদ্রলোক। ‘কী করে এই অবস্থা হলো আপনার? গায়ের গন্ধ সহ্য করাও বেশ কঠিন! কী হয়েছিল? আমার মেয়ের সঙ্গে বিমানে করে আসার সময়...’

‘কিছুই না, কিছুই না,’ খুনির দৃষ্টিতে মানামিকে একবার দেখে নিলেন নাসিম।

‘মানামি?’ কড়া চোখে মেয়ের দিকে চাইলেন তামেশু।

‘ওঁর ভুলেই... বাড়তি চাপ সহ্য করতে পারেননি।’ মৃদু হাসল মানামি। ওর চোখ স্থির হলো রানার উপর। ‘আপনাদের সঙ্গে প্রজেকশন রুমে দেখা হবে।’ টারমাক থেকে আরেকদিকে রওনা হলো মেয়েটা। লেগুনের প্রান্তে একটা তিনতলা দালান, ওইদিকে চলেছে।

‘আমি সত্যিই দুঃখিত, নাসিম স্যান,’ নরম স্বরে বললেন তামেশু। ‘মাথা গরম ওর। কারও কথা মানতে চায় না। আসলে সামনে কোনও মহিলা রোল মডেল ছিল না। একা মানুষ করতে হয়েছে, যতটা মনোযোগ দেয়া উচিত ছিল সেটা পারিনি।’

‘বাদ দিন, ও কিছু না,’ বললেন নাসিম। ‘আমি আসলে এসেছি আপনার তিমির লেগুন দেখতে। সত্যিই অবিশ্বাস্য।’

‘পরে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাব,’ বললেন তামেশু। ‘আগে আপনার দরকার পরিষ্কার হয়ে জামা-কাপড় বদলানো। তারপর যাব আমার চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিডের সঙ্গে কথা বলতে। সে টয়োডার আনা ভিডিওটা আবারও দেখছে। নাসিম, আপনি দেখলে হয়তো বুঝবেন কেন নষ্ট হলো ইউনিসগুলো।’

দশমিনিট পর প্রজেকশন রুমে উপস্থিত হলেন তামেশু

সিনোসুকা নাসিম ও রানাকে সঙ্গে নিয়ে। ঘর পুরো অন্ধকার, পর্দায় দেখা যাচ্ছে চলচ্চিত্র।

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে নাসিম ও রানার পরিচয় করিয়ে দিলেন তামেশু। পাশাপাশি বসলেন তিনি ও নাসিম। একটু দূরে মানামির পাশের চেয়ারে জায়গা পেল রানা।

চলচ্চিত্র বলতে একটা স্পট লাইট, চিরে দিয়েছে পরিষ্কার পানি। ওটা যে পানি, তাও বোঝা যাচ্ছে না। কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল বিধ্বস্ত ইউনিস। কাত হয়ে পড়ে আছে ক্যানিয়নের দেয়ালের পাশে। প্রায় চাপা পড়েছে পাথর ও কাদার নীচে।

ভিডিও এডিটিং সুইট দিয়ে পর্দার দিকে চেয়ে রয়েছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড। 'প্রাথমিক পজিশন থেকে এক শ' গজ দূরে ওটাকে পেয়েছে টয়োডা।'

সিট ছাড়লেন নাসিম, চলে গেলেন মনিটরের কাছে। গম্ভীর সুরে জানতে চাইলেন, 'আপনার কী ধারণা? কী হয়েছিল?'

স্ক্রিনের দিকে চেয়ে আছে হ্যারল্ড ডেভিড। সাবমারসিবলের ক্ষত-বিক্ষত শরীরে পড়েছে স্পট লাইট। 'প্রথমেই মনে আসে ভূমিধসের কথা।'

'ভূমিধস?'

'দেখে তো মনে হচ্ছে, ওখানে প্রায়ই এমন হয়। চারপাশের পাথরগুলো লক্ষ করুন।'

পিছনের টেবিলের কাছে চলে গেলেন নাসিম, তুলে নিলেন শামুকের অর্ধেক খোলের মত 'সোনার প্লেট'। তাঁর মনে হলো, ওটা ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে। আঙুল বোলালেন অমসৃণ কিনারাগুলোতে। 'চার ইঞ্চি পুরু স্টিলের উপর ছিল টাইটেনিয়াম কেসিং,' আস্তে করে মাথা নাড়লেন তিনি। 'আমি স্ট্রেস-টেস্ট ডেটা দেখেছি।'

'হয়তো বাড়ি খেয়ে ফাটল ধরেছিল। নীচের স্রোত খুবই

শক্তিশালী।'

'এমন কোনও প্রমাণ আছে যে... বলতে গিয়েও থামতে হলো নাসিমকে।

'কণ্ট্যাক্ট হারাবার দুই মিনিট আগে জোরালো স্রোত রেকর্ড করেছে ওই ইউনিস।'

'অন্যগুলো?' জানতে চাইল রানা, এইমাত্র নাসিমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

'একইরকম জোরালো স্রোত ধরতে পেরেছে অন্য দুটো ইউনিস,' বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। 'যদি ভূমিধসের কারণে নষ্ট হয়, তো অন্যগুলোরও ওই একই অবস্থা হয়ে থাকতে পারে।'

আবারও মনিটরের দিকে চাইলেন নাসিম। 'আপনারা চারটে হারিয়েছেন। এটা কি অস্বাভাবিক নয় যে চারটেই নষ্ট হয়ে গেল ভূমিধসে?'

চশমা নামিয়ে নিয়ে চোখ ডলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। এই একই কথা নিয়ে আগেও আলাপ হয়েছে তামেশু সিনোসুকার সঙ্গে। 'আমরা জানি ওটা ভূমিকম্প-প্রবণ এলাকা। অন্য সব খাদেও প্রায়ই ছিঁড়ে যায় কেবল। এবং এটা হয় ভূমিধসের কারণে। তা ছাড়া, অন্যসব খাদের চেয়ে অনেক বেশি অস্থির এই ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ।'

'গভীর সাগরের স্রোত প্রায়ই ভূমিধস তৈরি করে,' রানার পাশ থেকে বলল মানামি।

'আহমেদ-স্যান, ওই রোবটগুলোর উপর নির্ভর করছে আমার স্বপ্নের প্রজেক্ট চালু হবে কি হবে না,' বললেন তামেশু। 'কাজেই তুলে আনতে হবে নষ্ট হয়ে যাওয়া অন্তত একটা ইউনিস। কাজটা একা করতে পারবে না আমার ছেলে। পাশাপাশি কাজ করতে হবে দুটো সাবমারসিবলকে। আবর্জনা সরাবে একটা, অন্যটা বেঁধে তুলে আনবে ওই ইউনিস। নাসিম-স্যান...'

'বাবা!' প্রবল আপত্তির সুরে বলল মানামি। বুঝতে পেরেছে, এবার যে-কোনও সময়ে ডক্টর নাসিমের কাছে সাহায্য চেয়ে বসবেন বাবা।

'ডিভিডি স্টিল করুন,' হঠাৎ বলে উঠলেন নাসিম। মনিটরে কিছু একটা দেখেছেন। হ্যারল্ডকে বললেন, 'এবার আরেকটু পিছিয়ে যান। ...হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার চালু করুন।'

স্ক্রিনের ইমেজে মন দিয়েছে সবাই।

পাথর ও কাদায় চাপা পড়েছে ইউনিসের একপাশ। ওদিক থেকে আলো ফেলেছে স্পট লাইট। আবর্জনার ভিতর দেখা গেল কী যেন।

'ঠিক আছে! এখানেই রাখুন!' বললেন নাসিম।

পজ টিপল হ্যারল্ড ডেভিড।

সাবমারসিবলের নীচের দিকে সাদা কী যেন।

'ওটার ছবি বড় করতে পারবেন?' জানতে চাইলেন নাসিম।

কয়েকটা বাটন টিপল হ্যারল্ড। মনিটরে এক বর্গ-ইঞ্চির একটা রেখার বাক্স তৈরি হলো। এবার নির্দিষ্ট জায়গায় জয়স্টিক নিয়ে গেল সে। বাটন টিপতেই মনিটর জুড়ে দেখা দিল সাদা ওই জায়গাটা।

ত্রিকোণ জিনিসটা এখন অনেক বড় দেখাচ্ছে, কিন্তু এনলার্জ করায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

মনোযোগ দিয়ে জিনিসটা দেখলেন নাসিম, তারপর বোমা ফাটালেন, 'ওটা মেগালোডনের একটা দাঁত।'

ভুরু কুঁচকে ইমেজটা দেখল হ্যারল্ড ডেভিড। তারপর বিরক্ত স্বরে বলল, 'আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন, ডক্টর?'

কর্তৃত্বের সঙ্গে বললেন তামেশু, 'হ্যারল্ড, আমার কোনও অতিথির সঙ্গে এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা চলবে না।'

'সরি, মিস্টার সিনোসুকা। কিন্তু প্রফেসর যা বলছেন তা

অসম্ভব। আপনি নিজেই দেখুন?' স্টিলের একটা স্ট্রাটের দিকে আঙুল তাক করল সে। 'ওটা গার্ডার বিমের বল্টু। দৈর্ঘ্যে তিন ইঞ্চি।' অস্পষ্ট সাদা জিনিসটা আবারও মনোযোগ দিয়ে দেখল সে। 'এটা হতে পারে... কী যে... যাই হোক ওটা— দৈর্ঘ্যে সাত বা আট ইঞ্চি।'

তামেশুর দিকে ফিরল ইঞ্জিনিয়ার। 'আমরা জানি পৃথিবীতে এত বড় দাঁত কোনও প্রাণীর নেই।'

চুপ করে আছেন তামেশু।

'আর ওটা যদি সত্যিই দাঁত হয়ে থাকে, হয়তো ভূমিধসের সময় বেরিয়ে এসেছে,' মন্তব্য করল মানামি।

'হতে পারে,' বললেন নাসিম। 'কিন্তু জিনিসটা সাদা রঙের। মেগালোডনের ফসিলাইয্ড় দাঁত হয় ধূসর বা কালো। বয়সও জানা যায় টেস্ট করলে। কিন্তু দাঁত সাদা হলে বুঝতে হবে ওটার মালিক কিছুদিনের ভেতর মারা গেছে, অথবা কোনও কারণে একটা দাঁত হারিয়ে এখনও বেঁচে আছে।'

'আপনি নিশ্চয়ই দারুণ উৎসাহ বোধ করছেন?' জানতে চাইল মানামি।

'তা নয়,' বললেন নাসিম। 'তবে ওই দাঁতটা আমার দরকার। খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওটা প্যালিয়োণ্টোলজিস্টদের কাছে।'

'আপনি কি ভাবছেন সাবমারসিবল নিয়ে...' রেগে গেল মানামি। 'না, তা আমি হতে দেব না। কেউ যদি যায়, সে হচ্ছি আমি। টয়োডার সঙ্গে আমিই নামব ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে।'

'তোমাকে আগেই বলেছি, মানামি, এসব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দাও,' ধমকের সুরে বললেন তামেশু। 'এবার চলো অতিথিদের লেগুন দেখাতে নিয়ে যাই।'

ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রজেকশন রুম থেকে বেরিয়ে এল রানা, নাসিম ও মানামি।

সামান্য ঢালু করিডোর চলে গেছে বেশ কিছুদূর। শেষমাথায় বড় দরজা।

ওটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল মানামি, 'ওই দাঁত আপনার জন্য এত জরুরি কেন, ডক্টর?'

নাসিম জবাব দেয়ার আগেই বললেন তামেশু, 'হয়তো জানেন না, এটা মানুষের তৈরি সবচেয়ে বড় লেগুন।'

'তাই শুনেছি,' বললেন নাসিম।

'কাছ থেকে দেখলে অবাক হতে হবে।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন নাসিম।

তাঁরা পৌঁছে গেছেন দরজার কাছে।

চৌকাঠে পা রেখে তামেশু বললেন, 'সেই ছয় বছর বয়স থেকে এই লেগুন ছিল আমার স্বপ্নের ভেতর। খরচ হয়েছে তিন শ' মিলিয়ন ডলার। সাত বছর লেগেছে পরিকল্পনা তৈরি করতে। পরের চারবছরে প্রায় শেষ করে এনেছি কাজ। আমার যা ছিল, সবই ঢেলেছি এই লেগুনে।'

নাসিমের দিকে চাইলেন তামেশু, চোখে টলটলে অশ্রু। রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'খুব খারাপ হবে লেগুন চালু করতে না পারলে, আহমেদ-স্যান।'

'বাবা, এখন না হয় এসব থাক,' বলল মানামি।

আস্তে করে মাথা দোলালেন তামেশু, হাতের ইশারা করলেন। 'চলুন, আপনাদেরকে লেগুন ঘুরিয়ে দেখাই।'

বাঁশের চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছেন নাসিম আহমেদ ও মাসুদ রানা। প্রশান্ত মহাসাগরের জলে ডুব দিতে শুরু করেছে ডিমের কুসুমের মত লালচে সূর্য।

ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান্টালুসিয়া পর্বতের ঢালে বিগ সারে উপত্যকায় তামেশু সিনোসুকার বাড়ি, খুবই চমৎকার। প্রকাণ্ড

বাংলোর মত। সাগর থেকে আসছে ঝিরঝিরে শীতল হাওয়া। ওদিকে যতদূর চোখ যায়, কোথাও কিছু নেই। টলটল করছে নীল জল। হাওয়ার শব্দ বা পাখির কিচিরমিচির ছাড়া চারপাশ নিস্তব্ধ।

নাসিম ও রানাকে আজ রাতের জন্য এ বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তামেশু। রাজি হয়ে গেছেন নাসিম। বাধ্য হয়ে রানাকেও থাকতে হচ্ছে।

তামেশু বলতেই ডিনারে মস্ত বাসন ভরা চিংড়ির কাবাব পরিবেশন করবে, কথা দিয়েছে মানামি।

এইমাত্র বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন তামেশু, পরীক্ষা করলেন গ্যাসের গ্রিল জ্বলছে, তারপর চলে এলেন পুলের পাশে। ওখানেই বাঁশের চেয়ারে বসেছে রানা ও নাসিম।

'মানামি জানিয়ে দিয়েছে, একটু পর ডিনার,' বললেন তামেশু। 'আপনাদের যথেষ্ট খিদে আছে তো? আমার মেয়ে কিন্তু খুবই ভাল রাঁধুনি।'

সিনিয়র বন্ধুর দিকে চাইলেন নাসিম। 'ভাল রাঁধুনি হওয়ারই কথা, ভাল বংশের মেয়ে।' সামান্য বিরতি নিয়ে বললেন, 'এবার বলুন আপনার লেগুনের ব্যাপারে। প্রথমে এ চিন্তা এসেছিল কীভাবে? আপনি বলছিলেন লেগুন চালু না-ও হতে পারে... কেন?'

নাসিমের মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন তামেশু। চোখ বন্ধ করে ফেললেন। বড় করে শ্বাস নিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আপনারা এই সাগরের মিষ্টি সুবাসটা পাচ্ছেন? এটা প্রকৃতির নিজস্ব গন্ধ।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ঠিক।

'হ্যাঁ, পাচ্ছি,' বললেন নাসিম।

'আপনারা হয়তো জানেন না, পেশায় আমার বাবা ছিলেন জেলে। জাপানে থাকতে প্রতিদিন আমাকে সাগরে নিয়ে যেতেন

তিনি। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। আমি যখন মাত্র চার বছরের, তখন আমার মা মারা যান। কার কাছে রাখবেন আমাকে? কাজেই তিনি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন সাগরে।

'তারপর আমার যখন ছয় হলো, বাবা আমাকে নিয়ে চলে এলেন আমেরিকায়। তখন স্যান-ফ্রান্সিসকোতে আমাদের ক'জন আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু চারমাস পর জাপানিরা পার্ল হারবারে বোমা ফেলল। ফলে আমেরিকার সব জাপানিকে ধরে নিয়ে গিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্পে পুরে দিল সরকার। আহমেদ-স্যান, রানা-স্যান, আমার বাবা ছিলেন গর্বিত, স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি মানতে পারলেন না যে তাঁকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। নিজের ইচ্ছে মত মাছ ধরতে যেতে পারবেন না আর। বুক ভেঙে গেল তাঁর। এক সকালে হঠাৎ করেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর মরে যাওয়াই ভাল। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন। সুদূর এই বিদেশে আমি সত্যিই একা হয়ে গেলাম। একটা শব্দও বুঝতাম না ইংরেজির।'

'আপনি একেবারেই একা ছিলেন?' জানতে চাইল রানা।

মৃদু হাসলেন তামেশু। 'হ্যাঁ, মিস্টার রানা। তারপর আর একা থাকলাম না। তখনই দেখলাম প্রথম তিমি। জেলের জানালা দিয়ে ওদেরকে দেখতাম লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে। ওরা ছিল হাম্পব্যাক ওয়েইল। গান গাইত ওরা। আর একা লাগত না। আমার মন জুড়ে থাকত ওই তিমিগুলো। কোথায় চলেছে জানতাম না। তবুও ওরাই ছিল আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।'

চোখ বুজলেন তামেশু, ভাবতে শুরু করেছেন কী যেন। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'আমেরিকানরা আসলে অদ্ভুত মানুষ। একমিনিটে ঘৃণা করতে পারে, পর মুহূর্তে হয়তো ভালবেসে ফেলবে। আঠারো মাস পর আমাকে ছেড়ে দেয়া হলো জেল থেকে। আমাকে দত্তক নিলেন এক আমেরিকান নিঃসন্তান

দম্পতি— রন হুবার্ট ও নিতু। অদ্ভুত ভাল মানুষ ছিলেন ওঁরা। নিতু-মা ছিলেন ভারতীয়। আসলে কপালই ভাল ছিল। তাঁরা খুব ভালবাসতেন আমাকে। পড়িয়েছেন স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে, মৃত্যুর সময় অনেক টাকা রেখে গেছেন আমার জন্যে। তারপরও যখন খুব একা লাগত, আমাকে সঙ্গ দিত ছোটবেলার ওই তিমির মিষ্টি গান।'

'বুঝতে পারছি কেন এ প্রজেক্ট আপনার কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ,' বললেন নাসিম।

'তিমিদের বুঝতে পারা সবার জন্যেই জরুরি। ওরা নানাদিক থেকে আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত জাতি। এটা খুব অন্যায় যে ওদেরকে ধরে এনে ছোট ট্যাঙ্কে রাখা হবে, বা সামান্য খাবারের বিনিময়ে ওদেরকে দিয়ে ফালতু খেলা দেখানো হবে। ব্যাপারটা নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এই লেগুন সবসময় খোলা থাকবে। ইচ্ছে মত এখানে আসবে তিমি, আবার ইচ্ছে হলেই চলে যাবে যেখানে খুশি। এটা কোনও বদ্ধ ট্যাঙ্ক হবে না। আমি নিজে জেলে থেকেছি, কাজেই কখনও ওদেরকে আটকে রাখব না। কখনও না।' আবারও চোখ বুজলেন তামেশু। 'আহমেদ-স্যান, রানা-স্যান, জানি না আপনারা জানেন কি না, কিন্তু তিমিদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের।'

'কেন ভাবছেন লেগুন চালু করতে পারবেন না?' জানতে চাইল রানা।

আস্তে করে মাথা নাড়লেন তামেশু। 'এই প্রজেক্টের ফাণ্ড পাওয়ার জন্য তিনবছর ছোটাছুটি করেছি। ইউ.এস.-এর কোনও ব্যাঙ্ক আমার স্বপ্ন পূরণ করতে এগিয়ে আসেনি। তারপর জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেন্টারের চিফের সঙ্গে পরিচয় হলো। লেগুন তৈরি হবে কি হবে না তা নিয়ে তাঁদের কিছুই যায় আসে না, কিন্তু ভূমিকম্প মাপতে তাঁদের দরকার আমার তৈরি ইউনিস

সিস্টেম। টাকা দেবেন তাঁরা। মনে হলো চুক্তি করলে ভুল করব না। তাঁরা জমি কিনে দিলেন, সেই সঙ্গে চুক্তি হলো লেগুন খননের টাকাও দেবেন। বদলে আমি তৈরি করব ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে নামানোর উপযুক্ত পঁচিশটা ইউনিস। প্রথমে চারটেকে নামালাম। কিন্তু ইউনিস প্রজেক্টের রোবটগুলো কাজ শুরু করার একমাস পেরুবার আগেই নষ্ট হতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের টাকা দেয়া বন্ধ করে দিল জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেণ্টার।'

'লেগুনের কাজ সঠিক সময়েই শেষ হবে,' চট্ করে একবার রানার দিকে চাইলেন নাসিম। 'আমরা খুঁজে বের করব কেন ভেঙে পড়ছে ইউনিস, যদি কোনও ত্রুটি ধরা পড়ে আপনি সেটা শুধরে নেবেন।'

চোখে আশার আলো নিয়ে নাসিমের দিকে চাইলেন তামেশু। 'আপনি কি বলতে পারবেন কেন ওগুলো...'

'না, তামেশু, আমি এখন কিছুই বলতে পারব না,' মাথা নিচু করলেন নাসিম। 'হ্যারল্ড ডেভিড হয়তো ঠিকই বলেছে। ক্যানিয়নের পাথুরে দেয়ালের খুব কাছে রাখা হয়েছিল ওগুলোকে। তবে আমার মনে হয় না কোনও পাথর ওভাবে টাইটেনিয়াম চুরমার করতে পারে।'

'আপনি আমার বন্ধু, নাসিম,' বললেন তামেশু। 'আপনি হয়তো ওখানে নেমে...'

প্রৌঢ় মানুষটার দিকে চাইলেন নাসিম। 'তবে, একটা কথা ভাবছি।'

'তা কী?'

চুপ করে গেছেন নাসিম।

'আমি আমার গল্প বলেছি আপনাকে,' বললেন তামেশু। 'এক ফোঁটা মিথ্যাও বলিনি। এবার আপনি হয়তো আমাকে বলবেন ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে কী হয়েছিল।'

'কেন আপনার মনে হচ্ছে আমি ওখানে নেমেছিলাম?'

মৃদু হাসলেন তামেশু। 'আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধু, তাই না, নাসিম-স্যান? আমার ইন্সটিটিউটে কমপক্ষে ছয়বার বক্তৃতা দিয়েছেন আপনি। বন্ধুর খোঁজ নেব না ভাবছেন কেন? তা ছাড়া, নেভির ভেতর আমার লোক আছে। আমি জানি দুর্ঘটনার ব্যাপারে নেভি কী বলেছে। কিন্তু আপনার দিকের কথাগুলো আমার শোনা হয়নি।'

চোখ ডললেন নাসিম। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, যে ভাবেই হোক, নেভি থেকে এসব তথ্য পেয়ে গেছেন আপনি। এখন আমি কিছু বললে গোপনীয়তা ভঙ্গ করা হবে না। শেষবার যখন সাবমারসিবল নিয়ে ওখানে নামি, আমার সঙ্গে ছিল আরও দু'জন নেভাল সায়েন্টিস্ট। ওই ডিপ-সি সাবমারসিবলের নাম ছিল সি অ্যাডভেঞ্চার। আমি ছিলাম পাইলট। ওই খাদের নীচের স্রোত মাপতে শুরু করি আমরা। উদ্দেশ্য ছিল নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের পরিত্যক্ত প্লুটোনিয়াম রড চ্যালেঞ্জার ডিপে নিরাপদ কোথাও পুঁতে দেয়ার জায়গা খুঁজে বের করা।'

চোখ বুজলেন নাসিম। 'ঘটনার সময় আমরা ছিলাম তলদেশ থেকে চার হাজার ফুট উপরে। ওটা ছিল আট দিনের মধ্যে আমার তৃতীয় ডাইভ। এত কম সময়ের ভিতর কাউকে আবারও নীচে পাঠানো হয় না। কিন্তু নেভির কাছে তখন আর কোনও উপযুক্ত পাইলট ছিল না, তাই ইচ্ছের বিরুদ্ধেও যেতে হয়েছিল আমাকে। সায়েন্টিস্টরা স্রোতের গতিবিধি মাপছে। আমি পোর্টহোল দিয়ে চেয়ে ছিলাম নীচের কালো পানির দিকে। তখনই দেখতে পাই নীচে কী যেন ঘুরছে।'

'অত আঁধারে কী করে দেখলেন, নাসিম-স্যান?'

'আমি পুরো নিশ্চিত নই, কিন্তু মনে হচ্ছিল ওটা জ্বলজ্বল করছে। সাদা রঙের... ঠিক সাদা নয়, অ্যালবিনো। বিশাল।

প্রথমে ভাবলাম, ওটা বোধহয় কোনও তিমি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, এত নীচে আসতে পারবে না কোনও তিমি। তারপর হঠাৎ করেই ওটা হারিয়ে গেল। ভাবলাম, ভুল দেখেছি।'

'তারপর কী হলো?'

'সত্যি বলতে কি, তামেশু, এরপর কী হলো তা আমি কাউকে বলে বোঝাতে পারব না। শুধু মনে আছে, হঠাৎ বিশাল একটা মাথা এগিয়ে এল আমার দিকে। অন্তত তেমনই মনে হয়েছিল আমার। শুধু আমি না, নেভির দুজনও চিৎকার দিয়ে ওঠে ওটা দেখে। কিন্তু আমার বক্তব্য সমর্থন করবার জন্যে বেঁচে নেই ওদের কেউ।'

'বিশাল মাথা?'

'হ্যাঁ, ত্রিকোণ মাথা। প্রকাণ্ড। ট্রাকের চেয়েও বড়। একদম সাদা। মুখ খুলতেই দেখলাম মস্ত সব দাঁত। নেভির বড়কর্তারা বলেছে: কিছু একটা দেখে বা কল্পনা করে আমি ভীষণ ভড়কে যাই। সাবমারসিবল থেকে ফেলে দিই সমস্ত ওয়েইট প্লেট, তীরের মত উঠে আসি ওপরে। ডিকমপ্রেস করিনি। প্রচণ্ড ভয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলাম। আমার দোষে মারা গেল ওদের দুজন লোক।'

'নাসিম, আপনি লেকচারে যে মেগালোডনের কথা বলেন, ওই মাথা ছিল কি সেই প্রাচীন শ্বেত-হাঙরের?'

'হ্যাঁ। ওই দুর্ঘটনার পর নিজের থিয়োরি থেকে এক পা সরিনি আমি।'

'আপনার পিছু নিয়েছিল দানবটা?'

'মনে হয় না। অন্যদের সঙ্গে আমিও জ্ঞান হারাই... তারপর...'

'দু'জন সায়েণ্টিস্ট মারা যান।'

'হ্যাঁ।'

'তারপর আপনার কী হয়?'

আবারও চোখ ডললেন নাসিম।

'হাসপাতালে ছিলাম তিন সপ্তাহ। তারপর তিনমাস আমাকে আটকে রাখা হলো সাইকোঅ্যানালিসিসের জন্য। নরকের যন্ত্রণা পেতে হলো।'

'আপনি কি ভাবছেন ওই দানব ভাঙছে আমার ইউনিস রোবটগুলো?'

'জানি না।' দিগন্তের দিকে চেয়ে রইলেন নাসিম। 'সত্যি বলতে, পরে ওই স্মৃতি আমার কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। ওটা যদি সত্যিই মেগালোডন হতো, হঠাৎ করেই উধাও হলো কী করে? সরাসরি ওটার দিকে চেয়েছিলাম, পরক্ষণে দেখলাম ওটা ওখানে নেই।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন তামেশু। 'নাসিম-স্যান, আমি বিশ্বাস করি, ওখানে নিশ্চয়ই কিছু দেখেছেন আপনি। তবে ওটা হয়তো কোনও দানব নয়। নিশ্চয়ই জানেন, নীচে কোটি কোটি কেঁচোর মত প্রাণী আছে। জড়িয়ে পেঁচিয়ে থাকে ওরা। টয়োডা ওগুলোকে দেখেছে। সাদা রঙের। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে। ...আপনি বোধহয় একেবারে তলে নামেননি, নাসিম?'

'না, পুরো নামিনি।'

'টয়োডা নেমেছিল। গভীর সাগরে নামতে ভালবাসে ছেলেটা। ওর মনে হয়: মহাশূন্যের মতই সাগরের তলদেশ। নাসিম-স্যান, আমার মনে হয়, আপনি দেখেছেন একদঙ্গল টিউবওঅর্ম। স্রোত ওগুলোকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আপনি তখন ওদেরকে দেখতে পান। আর সে কারণেই হঠাৎ করে উধাও হয়েও যায়। আপনি ছিলেন খুব ক্লান্ত। চেয়ে ছিলেন ঘুটঘুটে কালো আঁধারে। নেভি আপনাকে বারবার নীচে পাঠিয়ে অনেক বেশি পরিশ্রান্ত করে তোলে। আট দিনের ভিতর তিন-

তিনবার গভীর সাগরে ডাইভ দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়, আর নিরাপদ তো নয়ই। প্রাণে বেঁচে ফিরে এসে এরপর সত্যিই ওই ধরনের দানব আছে কি না তা জানতে কয়েক বছর একটানা গবেষণা করেছেন।'

চুপ করে আছেন নাসিম।

ওঁর বাহুতে আস্তে করে হাত রাখলেন তামেশু। নরম স্বরে বললেন, 'বন্ধু, আমি আপনার কাছে সাহায্য চাইছি। এবার হয়তো সময় হয়েছে নিজের ভয়কে জয় করবার। আপনি কি আমার ছেলের সঙ্গে নামবেন ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে? ওখানে দেখতে পারেন টিউবওঅর্মের দানবীয় সব দঙ্গল। কাল্পনিক ভীতি ও দৃষ্টি বিভ্রম কেটে গেলে আবারও হয়ে উঠবেন পৃথিবীর সেরা ডাইভার। আমি জানি, এখনও ভেতরের আগুন মরে যায়নি আপনার। এই সুযোগে জয় করে নিন ভয়কে।'

নাসিমের চোখে টলটল করছে অশ্রু। হাত দিয়ে মুছে ফেললেন। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তামেশু। ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছে আমার ক্লস্ট্রোফোবিয়া। কিন্তু পথ বাতলে দিতে পারি। বলতে গেলে সেজন্যেই রানাকে সঙ্গে করে ধরে এনেছি। ও একজন অভিজ্ঞ ডাইভার। নুমার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে ও বহুবার ওদের সাবমারসিবলগুলো পরীক্ষা করতে গভীর সাগরে নেমেছে।'

'নুমা মানে? ঠিক...'

'মার্কিন একটা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান নুমা। ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি। সমুদ্রের নীচে নানা ধরনের গবেষণা করে ওরা। বাঙালি হয়েও রানা ওদের একজন অনারারি প্রজেক্ট ডিরেক্টর। মিথ্যা বলব না, তামেশু, আমার চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ আর দক্ষ ডাইভার ও। আপনার জন্যে ডাইভ দিতে ও আপত্তি করবে বলে মনে করি না।'

'সত্যিই?' বললেন তামেশু। এখনও পুরো নিশ্চিত নন কাজটা রানা পারবে কি না।

'দু'একবার ওর সঙ্গে গভীর সাগরে নেমেছি,' বললেন নাসিম। 'ওর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু শেখার ছিল আমার। কিন্তু এখন আর ওই কাজ আমার পক্ষে সম্ভবই নয়।'

'রানা-স্যান, আপনি সত্যিই নামবেন ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে?' রানার দিকে চাইলেন তামেশু, চোখে আশা।

'আমি দর্শক হয়ে এসেছি নাসিম ভাইয়ের সঙ্গে। সাগরে ডাইভ দেয়ার ব্যাপারে আমার তেমন আগ্রহ নেই, আবার কোনও আপত্তিও নেই,' বলল রানা। 'উপযুক্ত লোক যদি না পান, ঠিক আছে, নামব। কিন্তু তার আগে দেশে ফোন করে আমার বসের অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি পেলে নামব, তবে একটা কথা বুঝতে পারছি: মনে খুব কষ্ট পাবে আপনার মেয়ে।'

প্রশান্ত হাসলেন তামেশু। 'টয়োডা বলেছে মানামি ভাল পাইলট, কিন্তু বড় বেশি আবেগপ্রবণ। সাগরের সাত মাইল নীচে নামতে হলে আরও অনেক ধীরস্থির হতে হয়। আর সব ডাইভে যাক, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওখানে নয়।' নাসিমের দিকে চাইলেন তামেশু। 'আপনি বোধহয় আমার সমস্যার সমাধান করে দিলেন, বন্ধু। এসব ঝামেলার শেষে আপনি কি লেগুনে আমার সঙ্গে কাজ করবেন?'

হাসলেন নাসিম। 'আমি ভাবব। মন্দ হয় না সিনোসুকা ইন্সটিটিউটে রিসার্চের কাজে যোগ দিলে।'

দারুণ সুস্বাদু ডিনার শেষে মেয়েকে তাঁর পরিকল্পনা জানাতে বসলেন তামেশু।

কিচেন থেকে বেরিয়ে উঠানের দিকে রওনা হলো রানা ও নাসিম।

পিছনে শোনা গেল মানামির অসন্তুষ্ট কণ্ঠ।

জাপানি ভাষায় ঝড়ের বেগে কী সব বলছে মেয়েটা।

দু'একটা কথা কানে এল রানার।

ভীষণ খেপেছে মেয়েটা ওর ওপর। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'নাসিম ভাই, মানামি মানে জানেন?'

'না তো! কেন? কী মানে?'

'মানে হচ্ছেঃ লাভ অ্যাণ্ড বিউটি। সুন্দরী, কোনও সন্দেহ নেই তাতে; কিন্তু লাভের কোনও আলামত টের পাচ্ছেন ওর কথায়?'

হেসে ফেললেন নাসিম আহমেদ। বললেন, 'ঠিকই বলেছ তুমি, রানা। মানামি না হয়ে নামটা সুনামি হলে বেশি মানানসই হতো। সাঙ্ঘাতিক আবেগপ্রবণ!'

সাত

সিট ছেড়ে উঠে রানাকে পাশ কাটিয়ে রেস্টরুমের দিকে চলে গেল মানামি সিনোসুকা। কোলে ল্যাপটপ কমপিউটার রেখে কাজ করছেন নাসিম আহমেদ। হেড রেস্টে মাথা এলিয়ে দিল রানা। আরও আড়ষ্ট হয়ে গেছে মানামির সঙ্গে ওর সম্পর্ক। যতবার চোখে চোখ পড়ছে, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখছে ওকে মেয়েটা।

পাঁচ ঘণ্টা আগে স্যান-ফ্রান্সিসকো ছেড়ে রওনা হয়েছে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের বিমান। এর ভিতর একটা কথাও বলেনি রানার সঙ্গে। হ্যারল্ড ডেভিডের সঙ্গে আলাপ করছে মাঝে মাঝে।

বিমানে উঠেই রানাকে ল্যাপটপের বিশেষ একটি প্রোগ্রাম দেখিয়েছেন নাসিম। ওটা অ্যাবিস গ্লাইডার-টুর ফ্লাইট সিমিউলেটর।

অ্যাবিস গ্লাইডার-টু একজনবাহী ডিপ-সি সাবমারসিবল। ওই জিনিসই টয়োডা সিনোসুকাকে নিয়ে গিয়েছিল ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের নীচে। ঠিক হয়েছে, রানা ব্যবহার করবে দ্বিতীয় অ্যাবিস গ্লাইডার-টু। এরই ভিতর ওই সাবমারসিলের বেসিক অপারেশন্স বুঝে নিয়েছে ও। কাজে নামার আগে আরেকবার নাসিম আহমেদের সঙ্গে বসে ঝালিয়ে নেবে।

আপাতত মনে রেখেছে, অ্যাবিস গ্লাইডার-টু ব্যবহার করে দুটো কমপিউটারের জয়স্টিক। ওগুলোর কাজ মিডউইং ও টেইল ফিন নিয়ন্ত্রণ করা। নীচের দিকে একবার রওনা হলে কিছুক্ষণ পরেই গাঢ় আঁধার নামবে, তখন পাইলটকে প্রায় অন্ধের মতই ন্যাভিগেট করতে হবে। শুধু রিডআউট থেকে পাবে সামান্য তথ্য।

মূল কথা, চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকতে হবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাজার হাজার ফুট সাগরের তলায়।

এখনও চোখ বুজেই আছে রানা। কোনও কাজ নেই ওর। প্রকাণ্ড প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে অনেকক্ষণ লাগবে।

প্রথমে বিমান নামবে গুয়ামে।

ওখান থেকে হনলুলু।

ওখানে রিফিউয়েল করে নেবে।

আবারও মানামির কথা ভাবতে শুরু করেছে রানা।

বাবার সিদ্ধান্তে খুবই কষ্ট পেয়েছে মেয়েটা। ও পুরো নিশ্চিত ছিল ভাইয়ের সঙ্গে নামতে পারবে অ্যাবিস গ্লাইডার-টু নিয়ে।

নাসিমের উপরও রেগে গেছে মেয়েটা। সে-ই তো নিয়ে এসেছে নচ্ছার ওই মাসুদ রানাকে।

আনমনে মৃদু হাসল রানা। মনে পড়ল, তামেশু সিনোসুকার সঙ্গে নাসিমের কথাগুলো। জাপানি ভদ্রলোক বলেছিলেন, নাসিম বোধহয় টিউবওঅর্ম দেখেছেন।

ওই জিনিস জন্মায় হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের চারপাশে। টিউব লাইটের মত সাদাটে আলো বেরোয় ওগুলোর গা থেকে। মুখ নেই, কিছু হজমও করতে পারে না। বেঁচে থাকে শুধু দেহের ভিতর জীবিত ব্যাকটেরিয়ার কারণে। কেঁচোগুলো ট্রেঞ্চের গন্ধক ভরা পানি থেকে সংগ্রহ করে ওগুলোকে জোগান দেয় হাইড্রোজেন সালফাইড, আর ওটাই দরকার ব্যাকটেরিয়াগুলোর। নিজেরাও হজম করে, আবার মালিকের পেট ভরিয়ে দেয় খাবার দিয়ে।

বেশ কিছুদিন হলো গভীর সাগরে নামছে মানুষ। আগে সবাই ভাবত, গভীর ওই আঁধার খাদে কোনও প্রাণের চিহ্ন নেই। বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন, যেখানে আলো নেই, সেখানে খাবারও থাকবে না। সাগরের গভীর খাদে ঘুটঘুটে অন্ধকার, আলো নেই, কাজেই ফটোসিনথেসিস হবে না। ওই পরিবেশে বাঁচবে না কোনও প্রাণী।

কিন্তু রানা নিজেই দেখেছে, সাগরের অনেক গভীরে হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের ভয়ঙ্কর উষ্ণ পানি, বিষাক্ত কেমিকেল ও মিনারেলের কারণে তৈরি হয় অদ্ভুত ফুড চেইন। পানিতে মিশে থাকা ঘন গন্ধকের কারণে মারা পড়ার কথা বেশিরভাগ প্রাণীর, কিন্তু ওই জিনিস খেয়ে জীবিত কেঁচো বা শামুক জাতীয় প্রাণীর দেহে আরামেই থাকে গভীর সাগরের ব্যাকটেরিয়াগুলো। নানান কেমিকেল ভেঙে প্রচুর খাবার তৈরি করে ওরা অন্যের জন্য। ব্যাকটেরিয়াকে দেহে ধারণ করে বেঁচে আছে কেঁচোগুলো, আবার তাদেরকে ছিঁড়ে খেয়ে বেঁচে আছে হরেক জাতের মাছ।

বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন: কেমোসিনথেসিস।

কেমিকেল থেকে শক্তি নিচ্ছে ব্যাকটেরিয়ারা, তাদের

প্রয়োজন নেই সূর্যের আলোর।

মাত্র কয়েক বছর হলো মানুষ বুঝতে শুরু করেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন পরিবেশেও টিকে থাকে কোনও না কোনও প্রাণ।

টয়োডা ওর বাবাকে বলেছে, তলদেশে অনেক জায়গাতেই পঞ্চাশ ফুট বৃত্তের কেঁচোর দঙ্গল দেখেছে সে। হয়তো সত্যি নাসিম আহমেদ ওদেরই এক গুচ্ছ দেখেছেন। হয়তো ঝিমুনির ঘোরে কল্পনায় দেখতে পান বিশাল ত্রিকোণ মাথা।

এমন হতেই পারে, আবারও না-ও হতে পারে। ঘটনা যা-ই হোক, নেভির ধারণা: তাদের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ লোক মারা গেছে ওঁর অহেতুক ভীতির কারণে। আর নিজেকে বুঝ দেয়ার জন্য নাসিম বছরের পর বছর ধরে মেগালোডনের বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন লেকচার সার্কিটে।

কোন্‌টা ঠিক, জানি না, ভাবল রানা। তবে, ডক্টর নাসিম আহমেদকে আপন বড় ভাইয়ের মত মনে করি। আমার উচিত নিজে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে নামা। হয়তো নিজেই দেখব ওখানে বিধ্বস্ত ইউনিস ছাড়া সত্যিই আর কিছু নেই। কিংবা হয়তো...

ঘটনা যাই হোক, চলেছে ও সাত মাইল গভীর এক খাদে। হিমালয়ের আস্ত এভারেস্ট পর্বতটাকে সাগরের ওই খাদে নামিয়ে দিলে থই না পেয়ে টুপ করে ডুবে যাবে।

রানার পঞ্চাশ সিট পিছনে ডক্টর নাসিম আহমেদের কারকারোডন মেগালোডন নিয়ে লেখা হার্ড বাউণ্ড বইটা বন্ধ করল সাংবাদিক ডন রে। চোখ থেকে খুলে ফেলল বাইফোকাল চশমা। ঘাড়ের পিছনে গুঁজে দিল বালিশ, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল নিশ্চিন্তে।

প্রশান্ত মহাসাগরের নীল ঢেউ ছুঁয়ে উড়ে চলেছে নেভির প্রকাণ্ড সিএইচ-৫৩ই সুপার স্ট্যালিয়ন ট্র্যান্সপোর্ট হেলিকপ্টার। একবার

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চাইল পাইলট, দেখে নিল মাসুদ রানা, নাসিম আহমেদ ও হ্যারল্ড ডেভিডকে।

'ওই যে, সামনের জাহাজটা।'

'যাক, পৌঁছে গেলাম,' বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড।

এবার জাগাতে হবে মানামিকে। গুয়ামের নেভাল স্টেশন পিছনে পড়বার পর ঘুমিয়ে পড়েছে মেয়েটা।

দিগন্তে চাইল রানা। ওখানে সাগরের ধূসর এক রেখা আলাদা করেছে আকাশটাকে। কোথাও কোনও কিছু নেই। বড় ক্লান্ত লাগছে ওর, বার কয়েক পিটপিট করে নিল চোখ। পনেরো ঘণ্টার বেশি হলো আকাশপথে চলেছে। মাঝে সামান্য সময়ের জন্য মাটিতে নেমেছে বিমান, তারপর আবারও হেলিকপ্টারে উঠে এগিয়ে চলা।

আবারও সাগরের দিকে চাইল রানা। এবার দেখতে পেল জাহাজটা। ছোট একটা বিন্দুর মত। ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। মাত্র একমিনিট পর ওটার খোলের লেখা পড়া গেল: নিতু।

নিতু আসলে ডি-কমিশণ্ড অলিভার হ্যাযার্ড পেরি ক্লাস গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট। সব রণ-সাজ সরিয়ে নেয়া হয়েছে, অর্থাৎ এখন জাহাজে কোনও অস্ত্র নেই। দূর-সাগরে গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনবছর আগে নেভির কাছ থেকে চার শ' পঁয়তাল্লিশ ফুটের স্টিলের জাহাজটা কিনেছে সিনোসুকা ইন্সটিটিউট, ওটার নাম দেয়া হয়েছে তামেশু সিনোসুকার পালক মা'র নামে।

গভীর সাগরে গবেষণার জন্য খুবই উপযুক্ত ওই ফ্রিগেট।

বো-র কাছ থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে স্যাম মিসাইল লঞ্চার। সামনের দিকে দীর্ঘ ডেক। ওখানে রাখা আছে নানান যন্ত্রপাতি। স্টার্নের পিছনে ট্র্যানসমে রিইনফোর্সর্ড-স্টিলের উইঞ্চ, সহজেই ওজন নেবে ভারী সাবমারসিবলের, অনায়াসেই নামিয়ে

দেবে সাগরে। উইঞ্চের পিছনে প্রকাণ্ড এক স্পুল, ওখানে রয়েছে কয়েক মাইল দীর্ঘ স্টিলের কেবল।

উইঞ্চ থেকে চল্লিশ ফুট সামনে স্টার্নে দুটো হ্যাঙার। একটার ভিতর দুটো অ্যাবিস গ্লাইডার-টু, অন্য হ্যাঙারে হেলিকপ্টার। দুই হ্যাঙারের মেঝেতে বল্টু দিয়ে আটকে দেয়া হয়েছে রেললাইন। ওগুলোর মাধ্যমে হ্যাঙার থেকে বের করা হয় ক্রাফটগুলোকে।

বো থেকে একটু পিছনে দ্বিতীয় ডেকে ছোট পাইলট হাউস। ওখানে ন্যাভিগেটরের কন্সোল বোর্ড, নিয়ন্ত্রণ করছে জিই এলএম ২৫০০ গ্যাস-টারবাইন ইঞ্জিনগুলোকে। পাইলট হাউসের সঙ্গে রয়েছে সংক্ষিপ্ত এক করিডোর, যাওয়া যায় কমাণ্ড ইনফরমেশন সেন্টারে। এই সিআইসি এয়ারকুলড, প্রায় আঁধার। সিলিঙে জ্বলছে মৃদু নীলচে বাতি। দেয়ালে কমপিউটার কন্সোলগুলোয় সর্বক্ষণ ঝলমল করছে মনিটার। আগে ফ্রিগেটের স্যাম, হারপুন মিসাইল, টর্পেডো এবং অন্যান্য অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করা হতো ওয়েপন্স স্টেশন থেকে, নানা কাউন্টারমেযারের ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু এখন এসব জায়গা নিয়েছে শক্তিশালী সব কমপিউটার। গভীর সাগরের চ্যালেঞ্জার ডিপে ইউনিস সিস্টেম নামিয়ে দেয়ার পর থেকে, সংগ্রহ করা হচ্ছিল সাত মাইল নীচের ডেটা।

নিতু'র সিআইসির ভিতর রয়েছে রেথিয়োন এসকিউএস-৫৬ সোনার ও রেথিয়োন এসপিএস-৪৯ রেইডার সিস্টেম। আপার ডেক থেকে আরও পঁচিশ ফুট উপরে উঠেছে ওগুলোর ঘুরন্ত ডিশ। এসব সিস্টেম সংযুক্ত হয়েছে বিশেষ একটি কমপিউটারে, প্রতিটি তথ্য পৌঁছে দিচ্ছে বারোটা কমপিউার কন্সোলের কাছে।

কণ্ট্রোল ডেকের নীচে গ্যালি ও ক্রু কোয়ার্টার। এখন নেই তিন সারি কফিনের মত বাঙ্কগুলো। ভিতর অংশ পাল্টে নেয়া হয়েছে। প্রতিটি ঘর হয়ে উঠেছে আরামদায়ক। জাহাজে থাকতে পারবে বত্রিশজন ক্রু। ওই ডেকের নীচে ইঞ্জিনরুম ও মেইন

মেশিনারি। ওসব চালায় দুই শাফটের প্রপেলার। অত্যন্ত দ্রুতগামী জাহাজ নিতু, গতি তুলতে পারে ঊনত্রিশ নট।

পিছনের ডেকের কাছে পৌঁছে গেছে নেভির কপ্টার, নীচে চেয়ে রানা দেখল প্রকাণ্ড রিইনফোর্সড-স্টিলের উইঞ্চ। ওটাই সাত মাইল নীচে কেব্‌ল নামিয়ে দেবে চ্যালেঞ্জার ডিপে। রানার পাশেই জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছে মানামি।

জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে এক জাপানি যুবক। বয়স হবে তার তেইশ কি চব্বিশ। রোটরের হাওয়া পাত্তা দিচ্ছে না। হাত নাড়ছে, মানামির উদ্দেশেই।

ছিপছিপে শরীর টয়োডার, তামাটে হয়ে গেছে দিনের পর দিন রোদে থেকে। রানার পাশ থেকে হাত নাড়তে শুরু করেছে মানামি। খুশি মনে হাসছে। 'টয়োডা!'

দু'মিনিট পর কপ্টার থেকে মানামি নামতেই ওর ব্যাগগুলো তুলে নিল টয়োডা। ভাইকে জড়িয়ে ধরল মানামি। নাসিমের পাশে নেমে পড়ল রানা, মনে মনে বলল, দুই ভাইবোনকে দেখলে মনে হয় যমজ।

'টয়োডা, এঁরা ডক্টর নাসিম আহমেদ এবং মিস্টার মাসুদ রানা,' বলল মানামি।

ব্যাগ নামিয়ে রাখল টয়োডা, দুই অতিথির সঙ্গে একে একে হাত মেলাল। রানাকে দেখে নিল একবার। 'আচ্ছা, তা হলে আপনিই আমার সঙ্গে চ্যালেঞ্জার ডিপে নামছেন? আপনি মানসিক ভাবে তৈরি তো?'

'তাই তো মনে হয়,' বলল রানা, 'না নেমে কী করে বুঝি?' টের পেল, জাপানি যুবকের ভিতর প্রতিযোগিতার প্রবল একটা স্রোত বইছে।

বোনের দিকে চাইল টয়োডা। 'প্রফেসর আহমেদ জানেন তো যে ডক্টর ম্যাককমন জাহাজে আছেন?'

'না বোধহয়।' নাসিমের দিকে চাইল মানামি। 'গতকাল এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছেন বাবা?'

নাসিমের মনে হলো বুক আঁকড়ে আসছে তাঁর। তিক্ত হয়ে গেল মন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ফিল ম্যাককমন এ জাহাজের ক্রু? না, এ ব্যাপারে কিছুই বলেননি উনি।'

'এতে কোনও সমস্যা হতে পারে ভাবছেন?' বলল টয়োডা।

আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন নাসিম আহমেদ। শুধু বললেন, 'যখন তিনবছর আগে নেভির হয়ে একের পর এক ডাইভ দিতাম, তখন আমার শারীরিক অবস্থা বুঝবার দায়িত্ব ছিল ওই ডাক্তার ফিল ম্যাককমনের।'

'পরে বোধহয় তাঁর সঙ্গে আর আপনার যোগাযোগ ছিল না,' মন্তব্য করল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড।

'আমরা পরস্পরকে পছন্দ করতে পারিনি কখনও,' বললেন নাসিম। 'তামেশু যদি আগে বলতেন, হয়তো এখানে আসতামই না আমি।'

'বোধহয় সে কারণেই বাবা কিছু বলেননি,' হাসল টয়োডা।

'আমি যদি জানতাম, নিজেই বলতাম,' বলল মানামি। 'এখনও দেরি হয়ে যায়নি, ডক্টর। আমরা আবারও ডেকে আনতে পারি কপ্টার, চাইলে আপনি মিস্টার রানাকে নিয়ে...'

'তার দরকার আছে বলে মনে করি না,' বললেন নাসিম। 'যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেই হবে। লোকটা যদি ঝামেলা করে, বাধ্য হয়েই তোমার বাবাকে জানাব।'

ক্রমেই আড়ষ্ট হয়ে উঠছে পরিবেশ, টের পেল রানা।

বোনের দিকে চাইল টয়োডা। 'মিস্টার রানা কেমন করেছেন প্রোগ্রাম সিমিউলেটরে?'

'একেবারে মন্দ নয়,' চট্ করে রানাকে দেখে নিল মানামি। 'তবে ওখানে মেকানিকাল বাহু বা এস্কেপ পডের কন্ট্রোল ছিল

না।'

'সত্যি করে নেমে যাওয়ার আগে একবার প্র্যাকটিস রানের সুযোগ পাবেন,' রানাকে বলল টয়োডা। 'এরই ভেতর সব বুঝে নেবেন।'

'তুমি তৈরি হলেই রওনা হব আমরা,' বলল রানা। 'এবার একবার দেখাও গ্লাইডারগুলো।'

বোনের ব্যাগগুলো তুলে নিল টয়োডা, ওর সঙ্গে রওনা হয়ে গেল অন্যরা হ্যাঙারের দিকে।

গ্যারাজের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে কালচে চেহারার এক লোক, মাথায় লাল টুপি। সঙ্গে দু'জন ফিলিপিনো ক্রু।

'ডক্টর আহমেদ, মিস্টার রানা, ইনি ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন,' পরিচয় করিয়ে দিল টয়োডা।

আমেরিকান পলিনেশিয়ান রিকি ব্র্যাডসেন, ষাঁড়ের মত শক্তিশালী। কণ্ঠটা মেঘের ডাকের মত গুরুগম্ভীর। কণ্ঠে ঝুলছে ছোট্ট ক্রস। একবার করে নাসিম ও রানার হাত ঝাঁকিয়ে দিল সে। 'ওয়েলকাম টু নিতু।'

'আপনার জাহাজে আসতে পেরে খুশি হয়েছি,' বললেন নাসিম।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

মানামিকে সম্মান দেখানোর জন্য লাল টুপি স্পর্শ করল রিকি ব্র্যাডসেন। খুব সম্মান দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, 'ম্যাডাম।'

তার কাঁধ চাপড়ে দিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড। 'তুমি কিন্তু মোটা হয়ে যাচ্ছ, ব্র্যাডসেন।'

মুখ কালো হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। 'ওই থাই মহিলার কারণেই শুয়োরের মত মোটা হয়ে উঠছি দিন দিন।'

হেসে ফেলল হ্যারল্ড। রানা ও নাসিমের উদ্দেশে বলল, 'ক্যাপ্টেনের বউ দুর্দান্ত রাঁধুনি। এবার বোধহয় সময় হয়েছে কিছু

মুখে দেওয়ার। খিদেয় পেট জ্বলছে।'

কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এক ফিলিপিনো ক্রুকে নির্দেশ দিল ব্র্যাডসেন। দেরি না করে মেইন কেবিনের দিকে ছুট দিল তরুণ।

'একঘণ্টা পর খেতে ডাকবে,' বলল ক্যাপ্টেন।

টয়োডার কথায় ঘড়-ঘড় আওয়াজে গ্যারাজ ডোর খুলে ফেলেছে দ্বিতীয় ফিলিপিনো ক্রু।

ভিতরে ঢুকল ওরা সবাই।

পাশাপাশি রাখা রয়েছে দুটো অ্যাবিস গ্লাইডার-টু।

'আপনার কী মনে হয়?' রানার দিকে চাইল টয়োডা।

'চমৎকার জিনিস,' মন্তব্য করল রানা।

'ডক্টর যখন ডাইভ দিতেন, তারপর আরও কিছু মডিফিকেশন আনা হয়েছে,' বলল টয়োডা।

'অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান নিয়ে অগভীর পানিতে নেমেছি,' কয়েক মুহূর্ত দুই জলযান দেখে নিয়ে মন্তব্য করলেন নাসিম। 'অ্যাবিস গ্লাইডার-টু তখনও ড্রয়িং বোর্ডে।'

সাবমারসিবলগুলো দৈর্ঘ্যে দশ ফুট, চওড়ায় চার। দেখতে মোটাসোটা টর্পেডোর মত, তবে ডানা আছে। একজনবাহী ভেসেল, পিছন দিয়ে ঢুকবে পাইলট, তারপর জয়স্টিক ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করবে জলযান। শুয়ে চালাতে হয়। অ্যাবিস গ্লাইডারের নাকের কারণে পরিষ্কার দেখা যাবে প্রায় তিন শ' ষাট ডিগ্রি। অনায়াসেই চারপাশ দেখে নেয়া যায়।

'লেক্সান,' নোজ কোনের দিকে আঙুল তাক করল হ্যারল্ড। 'এসব প্লাস্টিক এতই মজবুত, ব্যবহার করা হয় প্রেসিডেনশিয়াল লিমাযিনের জানালায়। এসকেপ পড এই জিনিস দিয়েই তৈরি।'

প্লাস্টিক নোজ কোনে টোকা দিলেন নাসিম। 'মাত্র কিছুদিন হলো এসকেপ পড যুক্ত হয়েছে। মূল মডেলে এটা ছিল না।'

'ঠিকই বলেছেন,' বলল টয়োডা। 'অ্যাবিস গ্লাইডার-টু বিশেষ

ভাবে তৈরি করা হয়েছে শুধু ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে নামার জন্য। নীচে যাওয়ার পর ডানা বা লেজ আটকে যেতে পারে, বা ছিঁড়েও যেতে পারে, তাই এই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আসলে আপনি পিছন দিক দিয়ে ঢুকবেন লেক্সান এসকেপ পডে। গ্লাইডার যদি বিপদে পড়ে, আপনার ডানদিকে পাবেন একটা মেটাল বক্স, ওটার লিভার টান দিলেই খসে পড়বে পিছনের ভারী লেজ ও ডানা। আপনার এসকেপ পড হয়ে উঠবে বুদ্বুদের মত, উঠে আসবে সহজেই।'

ভুরু কুঁচকে টয়োডা সিনোসুকার দিকে চাইল হ্যারল্ড ডেভিড। 'টুর যদি দিতে হয়, তো আমি দেব, টয়োডা। ওই ডিযাইন আমিই তৈরি করেছি।'

ইঞ্জিনিয়ারের দিকে চেয়ে হেসে ফেলল টয়োডা। 'সরি।'

'ঠিক আছে,' সাবমারসিবলের দিকে আঙুল তুলল হ্যারল্ড। 'আপনারা তো জানেন, গভীর সাগরে সাবমারসিবল নামাতে হলে দুটো বিষয়ে খেয়াল রাখতে হয়। বয়্যাণ্ট হতে হবে, আবার পানির প্রচণ্ড চাপও সহ্য করতে হবে। আরও বড় সমস্যা হচ্ছে সময়। নীচে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে সেটাও হিসাবে রাখতে হয়। অ্যালভিন, ফ্রেঞ্চদের নটিল, বা রাশান মির ওয়ান বা টু ভারী ভেসেল, একমিনিটে মাত্র পঞ্চাশ বা এক শ' ফুট নামতে পারে। ওই গতিতে চ্যালেঞ্জার ডিপের নীচে পৌঁছুতে লাগবে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি।'

'তার চেয়ে বড় কথা, ওগুলো নামতে পারে মাত্র বিশ হাজার ফুট নীচে,' তথ্য জোগান দিল টয়োডা।

'আর জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেণ্টারের শিনকাই ৬৮০০?' বললেন নাসিম। 'আমি তো শুনেছি ওটা একেবারে নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।'

'না, ওটা তৈরি করা হয়েছে বড়জোর একুশ হাজার ফুট নীচে

যাওয়ার জন্য,' শুধরে দিল হ্যারল্ড ডেভিড। 'আপনি ভাবছেন জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেন্টারের আনম্যাণ্ড সাব শেইকোর কথা। গত্ সপ্তাহে টয়োডা অ্যাবিস গ্লাইডার-টু নিয়ে নেমে যাওয়ার আগে শেইকো একমাত্র ভেসেল ছিল যেটা সাগরের নীচের মাটি স্পর্শ করেছে। মানুষ নিয়ে, বা মানুষ ছাড়া, চ্যালেঞ্জার ডিপে নামতে পেরেছে শুধু ষাট সালের ট্রিয়েস্ট। পঁয়ত্রিশ হাজার সাত শ' আটানব্বুই ফুট গভীরতায় আধ ঘণ্টা ছিল ওটা, তারপর শুরু হয়ে যায় মেকানিকাল সমস্যা।'

'সবচেয়ে গভীরে যাওয়ার রেকর্ড এখন আমার,' হাসল টয়োডা। রানার দিকে চাইল। 'আর দু'এক দিন পরেই আপনার সঙ্গে ওই মুকুট ভাগাভাগি করতে হবে আমাকে।'

'আমারই যাওয়ার কথা ছিল,' বিড়বিড় করে বলল মানামি।

মানামি বা টয়োডাকে পাত্তা দিল না ইঞ্জিনিয়ার, 'যাই হোক, এসব সাবের খোল তৈরি হয়েছে টাইটেনিয়াম অ্যালয় দিয়ে। ইউনিস সিস্টেমের মতই। ভারী সাবগুলোকে নামতে গিয়ে শেষ করতে হয় অর্ধেক পাওয়ার সোর্স, তারপর ভেসে উঠবার জন্য ফেলতে হয় ভারী প্লেট। কিন্তু ভাসতে পারে এমন রিএনফোর্সড সিরামিক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে অ্যাবিস গ্লাইডার-টু। প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চাপ নিতে পারে ষোল হাজার পাউণ্ডেরও বেশি। আমার এই সাব ডানার কারণে সাগরের-তলে উড়তে পারে পাখির মত। প্রতি মিনিটে নামতে পারে ছয় শ' ফুট। আবার উঠে আসার সময় ওয়েইট প্লেট ফেলতে হয় না। ফলে টনকে টন ব্যাটারির শক্তি লাগে না।'

'টয়োডা, কীভাবে তুলবে ভাবছ বিধ্বস্ত ইউনিস?' জানতে চাইলেন নাসিম।

'দেখুন সাবের পেটের কাছে কী,' বলল টয়োডা। 'থাবা আছে ওই মেকানিকাল বাহুর। সাবের নোজ কোনের নীচ দিয়ে সরাসরি

ছয় ফুট সামনে বাড়তে পারে ওটা। ওই থাবা তৈরি করা হয়েছে স্পেসিমেন তুলে আনার জন্য। আমরা যখন নামতে শুরু করব, আগে নামবেন মিস্টার রানা, পরে আমি। অনুসরণ করব। আমারটার মেকানিকাল বাহুর থাবার সঙ্গে থাকবে কেবল। নষ্ট ইউনিসের গায়ের কেসিঙে বেশকিছু বল্টু আছে। মিস্টার রানা একবার ইউনিসের উপরের আবর্জনা সরিয়ে দেয়ার পর কেবল আটকে দেব, নিতুর উইঞ্চ টেনে তুলবে নষ্ট আনম্যান্‌ড্‌ সাব।'

'ভাল বুদ্ধি,' বললেন নাসিম।

'দু'জনের কাজ আসলে,' বলল টয়োডা। 'প্রথমবার নীচে নেমে কেবলে আটকে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আবর্জনার কারণে তুলে আনতে পারিনি। পাথর-কাদা সরিয়ে দিলে আটকে দেব স্টিলের কেবল। ওখানকার জোরালো স্রোতও বাধা দিচ্ছিল।'

'তুমি হয়তো অনেক বেশি নার্ভাস ছিলে?' বলল মানামি।

'কাকে এসব বলছ?' চোখ পাকাল টয়োডা। বুকে টোকা দিল বার কয়েক। 'আমি কোনও কিছু ভয় পাই না।'

'তুমিই তো বলেছিলে ওখানে ভয় লাগছিল?' হাসল মানামি। 'ওখানে সাত মাইল নীচে ঘুটঘুটে আঁধার, কিন্তু তোমাকে আঁকড়ে ধরতে পারে ক্লস্ট্রোফোবিয়া, চারপাশে হাজার হাজার পাউণ্ড প্রচণ্ড চাপ।' চট্‌ করে একবার রানাকে দেখে নিল মানামি। 'যখন তখন খোল ফাটতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে মরতে হবে।'

'তুমি হিংসেয় জ্বলছ, মানামি,' বলল টয়োডা। 'ওখানে নামতে দারুণ লাগে আমার। মনটা পড়ে আছে, আবার কখন নামব। আগে ভাবতাম প্যারাশুট বা বানজি জাম্পিং দারুণ মজার, কিন্তু সাগরের অত নীচের রোমাঞ্চই আলাদা।'

চট্‌ করে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে চাইলেন নাসিম, চোখে ফুটে উঠেছে দুশ্চিন্তা। 'তুমি কি নিজেকে অ্যাড্রেনালিন জাঙ্কি মনে করো, টয়োডা?'

কথাটা শুনে উত্তেজনা মিলিয়ে গেল যুবকের। 'না-না, আমি আসলে বোঝাতে চেয়েছি... হ্যাঁ, অ্যাড্রেনালিন জাঙ্কিও বলা যায় আমাকে। কিন্তু, ডক্টর, নীচের ব্যাপারটাই অন্যরকম। চ্যালেঞ্জার ডিপে নেমে যাওয়া মানেই যেন চলে গেলাম ভিন্ন কোনও গ্রহে। সবগুলো জ্বালামুখ থেকে পানির সঙ্গে বলকে বেরিয়ে আসছে কালো ধোঁয়ার মত মিনারেলস, চারপাশে অদ্ভুত সব অচেনা মাছ...' আস্তে করে মাথা দোলাল সে। 'আপনাকে এসব বলছি কেন, আপনি নিজেই তো ওখানে নেমেছেন। ...তবে মিস্টার রানা হয়তো কখনও ওখানে যাননি।'

'তোমার চেয়ে অনেক বেশিবার নেমেছে,' গম্ভীর সুরে বললেন নাসিম।

সাবের পিছনে সিনোসুকা ইন্সটিটিউটের লোগো দেখছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর তরুণ টয়োডার দিকে চাইল, তারপর চাইল নাসিম আহমেদের দিকে।

'সত্যি, ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ একেবারেই অন্যরকম, কাজেই আমি আশা করব, তুমি আরও সিরিয়াস হবে, টয়োডা,' বললেন নাসিম। প্রসঙ্গ পাল্টে নিলেন তিনি, 'এবার বলো কোথায় পেতে পারি ডক্টর ম্যাককমনকে?'

চট্ করে বোনের দিকে চাইল টয়োডা। 'তিনি বোধহয় আছেন সিআইসিতে।'

'রানা, তুমি যেতে চাও আমার সঙ্গে?' জানতে চাইলেন নাসিম।

'চলুন, নাসিম ভাই,' বলল রানা।

'সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকে প্রথম করিডোরের শেষে ডানদিকে,' জানিয়ে দিল টয়োডা। 'আপনাদের ব্যাগেজ পৌঁছে দেব নয় আর দশ নম্বর কেবিনে। এক ডেক নীচেই ওগুলো। দরজায় নম্বর আছে।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলালেন নাসিম।

ওরা রওনা হয়ে গেল কমাণ্ড ইনফর্মেশন সেন্টার লক্ষ্য করে।

'তো পরে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাব জাহাজ,' পিছন থেকে বলল ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন।

আট

করিডোর ধরে কিছুদূর যেতেই ডানদিকে পাওয়া গেল 'অপারেশন্স' লেখা দরজা। নাসিমের পর প্রায়ান্ধকার ঘরে ঢুকল রানা। ভিতরে একের পর এক কমপিউটার, রেইডার ও সোনার ইকুইপমেণ্ট গুনগুন গুঞ্জন তুলছে।

কণ্ট্রোল প্যানেলে ঝুঁকে আছে মোটা এক লোক, চুলগুলো ধূসর, চোখে কালো ফ্রেমের ভারী চশমা। কমপিউটারের কি-বোর্ডে দীর্ঘ আঙুল বুলিয়ে চলেছে ঝড়ের গতিতে। টের পেয়েছে কেউ ঢুকেছে ঘরে। সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। নাসিম আহমেদের উপর চোখ পড়তেই গম্ভীর হয়ে গেল। আবারও কমপিউটারের দিকে ফিরল, মনোযোগ দিল মনিটরের উপর। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'মাছ ধরতে সাগরে, নাসিম?'

জবাব দেয়ার আগে ক' মুহূর্ত দ্বিধা করলেন নাসিম আহমেদ, তারপর বললেন, 'না, অন্য কাজে, ডক্টর ম্যাককমন।'

'কোন্ নরক থেকে এলে?'

'তামেশু সিনোসুকা সাহায্য চেয়েছে আমার।'

ঘরের গুমোট পরিবেশ বেশ টের পাচ্ছে রানা।

'জাপানিদের বোধহয় রুচি বলতে কিছু নেই, যার তার কাছে সাহায্য চেয়ে বসে।'

'আমরা পাশাপাশি কাজ করব, ডাক্তার ম্যাককমন, কাজেই পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা উচিত আমাদের দু'জনেরই।'

'কী জন্য এসেছ?'

'আসুন, আলাপ করার আগে মাসুদ রানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

ঘুরে চাইল না ডাক্তার।

বিরক্তি বাড়ল রানার।

ওদেরকে মানুষ বলেই মনে করছে না মোটকু ডাক্তার।

'মাসুদ রানা আমার ছোট ভাইয়ের মত, চ্যালেঞ্জার ডিপে নেমে নষ্ট ইউনিস তুলতে সাহায্য করবে। একা কাজটা পারবে না টয়োডা।'

'তা জানি,' ঘুরে দাঁড়াল ম্যাককমন, চলে গেল ঘরের আরেক প্রান্তে, ওখানে ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালল মগে। 'তবে যেটা বুঝতে পারছি না তা হলো, তোমার সাহায্য চাওয়ার কী আছে! আর কে মাসুদ রানা? হয়তো তোমার মতই চাকরিচ্যুত সাবমারসিবল পাইলট? কোন্ বিশেষ যোগ্যতা আছে তার?' টিটকারির সুরে বলেছে লোকটা।

'অনেকের চেয়ে ঢের বেশি যোগ্য রানা,' রাগ চেপে বললেন নাসিম। 'ও এসেছে বলে খুশি হওয়া উচিত আপনাদের। গত বায়ান্ন বছরে চ্যালেঞ্জার ডিপে কেউ নামেনি।'

'নেমেছে,' তিক্ত সুরে বলল ম্যাককমন। 'ওখানে নেমে মারা পড়েছে তারা।'

'এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই, ম্যাককমন।

আমি...' সঠিক শব্দ খুঁজে পেলেন না নাসিম। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'দেখুন, গত তিনবছর ধরে এমন দিন নেই আমি ভাবিনি সি অ্যাডভেঞ্চারের ওই দুর্ঘটনার কথা। সত্যি বলতে, এখনও জানি না ওখানে কী ঘটেছিল। শুধু জানি, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করি, ওখানে কিছু দেখেছি আমি। ওটা যে-কোনও সময়ে আমার সাবে হামলা করত, কাজেই দেরি না করে উঠে আসি।'

এবার নাসিমের মুখোমুখি হলো ডাক্তার ম্যাককমন, দু'জনের নাক থাকল মাত্র তিন ইঞ্চি দূরে। লোকটার দুই চোখ থেকে তীব্র ঘৃণা ঝরছে, দেখলেন নাসিম।

'সামান্য ক্ষমা-প্রার্থনা যথেষ্ট নয়, নাসিম,' কর্কশ স্বরে বলল ম্যাককমন। 'জীবন তোমার জন্য বড় সহজ হতে পারে, কিন্তু আমরা ভুলে যাইনি, তোমার জন্য মারা গেছে দু'জন সায়েন্টিস্ট। তুমি দিবাস্বপ্ন দেখছিলে তখন। প্রাচীন এক দানব দেখতে পাও। কিন্তু এসব কল্পনা করতে গিয়ে মেরে ফেলো তোমার টিমের দু'জনকে। কয়েক বছরের ট্রেইনিং ভুলে যাও। ভীষণ ভয় পেয়েছিলে। কিন্তু জানো, কী কারণে তোমাকে ঘৃণা করি? গত তিনবছর ধরে নিজের ক্যারিয়ার গড়তে চাইছ ভিত্তিহীন কল্পনার উপর ভর করে। তুমি নিজেই জানো, কোথাও নেই মেগালোডন। নিজেকে বুঝ দিয়ে চলেছ তবুও।' রাগ নিয়ে মাথা নাড়ল ফিল ম্যাককমন। এক পা পিছিয়ে গিয়ে ডেস্কের উপর নিতম্বের ভর দিল। 'তুমি আমাকে অসুস্থ করে তুলছ, নাসিম। ওই দু'জনের মরবার কথা ছিল না। কী জবাব দেবে ওদের পরিবারকে? তিনবছর ধরে বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখাওনি, কপচে চলেছ: গভীর সাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভয়ঙ্কর এক কারকারোডন মেগালোডন।'

'জানি না আসলে কী সত্যি, ডক্টর ম্যাককমন,' নরম স্বরে বললেন নাসিম। 'সত্যিই যদি একপাল টিউবওঅর্ম দেখে থাকি,

হ্যালুসিনেশনের ভিতর ছিলাম। হয়তো তাই। সেক্ষেত্রে মস্ত ভুল করেছি। নিজেও মরতে বসেছিলাম। ...আমার পক্ষে আর সাবমারসিবল নিয়ে সাগর-তলে যাওয়া সম্ভব হবে না। আর তাই আমার ভাইকে নিয়ে এসেছি। ও হয়তো আমাকে বলতে পারবে সেদিন ওখানে আমি কী দেখেছি।'

'আমি যাজক নই, নাসিম, তোমার কনফেশন নেয়ার কাজও আমার নয়,' বলল ম্যাককমন। 'তোমার অপরাধ বোধটুকু নিজের কাছেই রেখো।'

'কে বলেছে আমি আপনাকে কৈফিয়ৎ দিচ্ছি!' চাপা স্বরে বললেন নাসিম। 'নিজেকে কী মনে করেন আপনি? সিনিয়র বলে এতদিন কিছু বলিনি, এখনও ভদ্র ভাবে কথা বলছি আপনার সঙ্গে। আপনি কী করেছেন, সেটা জানা আছে আপনার? ওই দুর্ঘটনার পিছনে আপনার নিজের কী অবদান?' হাঁপাচ্ছেন নাসিম আহমেদ। 'আপনি ছিলেন ক্রুদের শারীরিক রেকর্ডের দায়িত্বে। আপনি ফ্রেড স্কিলারকে বলেন, আমি তৃতীয় ডাইভের জন্যে মেডিক্যালি ফিট। আট দিনের ভিতর তৃতীয়বার আমাকে নামতে হয় ওখানে। আপনার কী মনে হয়, আমার শারীরীক-মানসিক অবস্থা কেমন থাকতে পারে তা দেখবার কথা কার?'

'ফালতু কথা বলবে না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ডাক্তার।

'ফালতু কথা কেন, ডক্টর ম্যাককমন?' তিক্ত হাসলেন নাসিম। 'আপনারা দুজন মিলে আমাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে চরম অপমান করলেন। কিন্তু আমি আপনাদের বিরুদ্ধে কোথাও নালিশ করিনি। করলে আপনারাও রেহাই পেতেন না!' উত্তেজিত হয়ে পায়চারি শুরু করেছেন। 'আপনি নিজেই তো অফিশিয়াল রিপোর্টে লিখেছেন: ''সাইকোসিস অভ দ্য ডিপ।'' যথেষ্ট বিশ্রাম না দিয়েই ওসব ডাইভ দিতে আমাকে বাধ্য করেন আপনি এবং ফ্রেড স্কিলার। এর দায়-দায়িত্ব নেবে কে? আপনি, না স্কিলার?'

'পুরো দোষ তোমার!'

'হ্যাঁ, ওটা ছিল আমার পাইলটিং এরর,' প্রায় ফিসফিস করে বললেন নাসিম। 'কিন্তু ওই সাবে আমার থাকারই কথা ছিল না, যদি না স্কিলার আর আপনি আমাকে ডাইভ দিতে বাধ্য করতেন। ঠিক তিনবছর পর আবারও সাগরে এসেছি, সঙ্গে আমার ভাই, সে হয়তো আবিষ্কার করবে এমন কিছু, যেটা আপনাদের কল্পনার ভিতরেই নেই। তারপর হয়তো নিজেদের দোষ দেখতে পাবেন। তিনবছর আগে যা ঘটেছে, তার সমস্ত দায় নিতে হবে তখন আপনাদের দুজনকে।' দরজার দিকে রওনা হয়ে গেলেন ডক্টর নাসিম, মনে হলো একটা ঘোরের ভিতর হাঁটছেন।

'একমিনিট দাঁড়াও, নাসিম,' পিছন থেকে বলল ডাক্তার ম্যাককমন। 'আট দিনের ভেতর ওটা তৃতীয় ডাইভ ছিল তোমার, ঠিক। কিন্তু তোমাকেই চেয়েছিলেন কমাণ্ডিং অফিসার স্কিলার। আর আমি এখনও বিশ্বাস করি তুমি মানসিকভাবে সুস্থ ছিলে। খুব দক্ষ পাইলট ছিলে। যাকে নিয়ে এসেছ, সে-ও হয়তো ভাল পাইলট। কিন্তু তার মাথা খেয়ে নিয়ো না। ওকে অনুরোধ করতে যেয়ো না তোমার দাঁত তুলে আনতে।'

'ওঁর দাঁত নয়, ডাক্তার; মেগালোডনের দাঁত,' প্রথমবারের মত বলল রানা। 'আর সত্যি যদি পাই, নিশ্চয়ই তুলে আনব।'

দরজার চৌকাঠে পৌঁছে গেছেন নাসিম, ওখান থেকে ঘুরে চাইলেন ম্যাককমনের দিকে। 'আমার বা রানার দায়িত্ব আমরা বুঝি, মিস্টার ম্যাককমন। আপনি নিজের দায়িত্ব বোঝেন তো?'

কমাণ্ড ইনফরমেশন সেন্টার থেকে বেরিয়ে গেলেন নাসিম আহমেদ। কড়া কয়েকটা কথা বলতে গিয়েও চুপ রইল রানা, পিছু নিল নাসিমের।

যে-কোনও ডাক্তারই বলবে, সাগরের গভীরে এক সপ্তাহের ভেতর তিনবার ডাইভ দেয়া ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

বিশ মিনিট পর শাওয়ার সেরে পোশাক পাল্টে গ্যালিতে এল রানা ও নাসিম আহমেদ। টেবিলে বসে পড়েছে বারোজন ক্রু। মুরগি ও আলু খাওয়ার ফাঁকে হৈ-চৈ করছে সবাই। সায়েন্স টিমের কাউকে দেখা গেল না, তারা খেয়ে নিয়েছে আগেই।

টয়োডার পাশে বসেছে মানামি, আরেক পাশে খালি চেয়ার। উল্টো দিকে আরেকটা খালি চেয়ার আছে, সেখানে গিয়ে বসলেন নাসিম। মানামির পাশে বসে পড়বার আগে রানা জানতে চাইল, 'এই সিট কি কারও জন্যে বুক করা?'

'না, বসে পড়ুন,' প্রায় নির্দেশ দিল মানামি।

একটু চমকেই গেল রানা। অবশ্য ওর জানা আছে, জাপানি মেয়েরা অন্য জাতের মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি কর্তৃত্বপরায়ণ।

মানামির পাশে বসে পড়ল রানা।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ও ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেনের সঙ্গে উত্তপ্ত তর্ক করছে টয়োডা। বোঝা গেল নাসিম ও রানাকে এড়াবার জন্য আসেনি ডাক্তার ফিল ম্যাককমন।

'মিস্টার রানা!' উত্তেজিত স্বরে বলল টয়োডা, 'ভাল হলো আপনি ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন। মনে আছে, আমাদের প্র্যাকটিস ডাইভিঙের কথা? ওই চিন্তা বাদ দিতে হবে।'

'কেন?' জানতে চাইল রানা।

ওর দিকে চাইল ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেন, কোঁৎ করে গিলে নিল মুরগির মাংস, তারপর বলল, 'পুব থেকে ঝড় আসতে পারে। প্র্যাকটিসের সময় মিলবে না। এই সপ্তাহে যদি নামতে চান, কাল ভোরেই নেমে পড়তে হবে।'

'আপনি মানসিকভাবে তৈরি না থাকলে আগেই বলে দিন, আমি যাব টয়োডার সঙ্গে,' বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল মানামি।

'না, উনি পারবেন, তাই না, মিস্টার রানা?' চোখ টিপল টয়োডা রানার দিকে চেয়ে। 'হয়তো আগে কখনও ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে নামেননি, কিন্তু অন্য ট্রেঞ্চে তো...'

'অন্য ট্রেঞ্চে নামা এক কথা, কিন্তু ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে নামা একেবারেই অন্যকিছু,' বলল মানামি। 'ডক্টর নাসিমও তো নেমেছিলেন। তার ফলাফল ভাল হয়নি।'

'এসব কে বলল তোমাকে?' জানতে চাইলেন নাসিম। টের পেলেন, মানামির কথায় চুপ হয়ে গেছে ক্রুদের সবাই।

'ডক্টর, আমি কি মিথ্যে বলছি? এখন জাহাজের সবাই এ নিয়েই আলাপ করছে। আপনারা আসার আধঘণ্টা পর আমাদের জাহাজের ক্রুদের বেতারের মাধ্যমে ইন্টারভিউ নিয়েছে এক সাংবাদিক।'

'সাংবাদিক?' চমকে গেছেন নাসিম। 'সে জানবে কী করে...' হঠাৎ নাসিম টের পেলেন, মরে গেছে তাঁর খিদে।

'এক লোক, নাম ডন রে,' বলল মানামি। 'ওই লোকই লেকচার সার্কিটে আপনাকে প্রশ্ন করেছিল। সে জানিয়েছে, আপনার কারণে সাবমারসিবলে মারা পড়ে দু'জন লোক। সে-ই আমাদেরকে বলেছে, আপনি ভীষণ ভয় পান, হ্যালুসিনেশন হয় আপনার, কল্পনার ভিতর দেখতে পান ভয়ঙ্কর এক মেগালোডন।'

ডক্টর নাসিমের দিকে চাইল টয়োডা। 'কথাটা কি সত্যি নয়, ডক্টর?'

থমথমে নীরবতা নামল ঘরে।

আস্তে করে সামনে থেকে ট্রে সরিয়ে দিলেন নাসিম। 'কথাটা ঠিক। কিন্তু ওই সাংবাদিক একথা বলেনি যে আমি ছিলাম অতিরিক্ত পরিশ্রান্ত। একই সপ্তাহে আগেও দুবার নামতে হয়েছিল গভীর সাগরে। সেদিন নীচে নামতে বাধ্য করা হয় আমাকে। আমার মেডিক্যাল অফিসার বলেছিল, আবারও ডাইভ দিলে

কিছুই হবে না। আজও জানি না, আমি কল্পনা করেছিলাম, না সত্যি সত্যিই দেখেছিলাম মেগালোডন। তারপর তিনবছর পেরিয়ে গেছে, তোমাদের বাবা আমার সাহায্য চাওয়ায় এসেছি। আগেও বহুবার গভীর সাগরে একের পর এক মিশনে গেছি, তখনও তুমি কৈশোর পেরোওনি, টয়োডা। আর আজ পরিষ্কার বলতে চাই, আমার সঙ্গে করে যাকে এনেছি, সে দুনিয়ার অন্যতম সেরা অ্যাকুনট। এখন তোমার যদি কোনও আপত্তি থাকে, টয়োডা, তোমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাবে না রানা, নিজেই নামবে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে!'

রানার দিকে চাইলেন তিনি।

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা।

'ইচ্ছে হলে নিজেকে গুটিয়ে নিতে পারো তুমি, টয়োডা!' বললেন নাসিম। উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

'আমি নামব, টয়োডা সঙ্গে আসুক বা না আসুক,' শান্ত স্বরে বলল রানা।

নার্ভাস হাসল টয়োডা সিনোসুকা।

'না, ঠিক আছে, মিস্টার রানার সঙ্গে নামতে আপত্তি নেই আমার। রাগ করবেন না, ডক্টর, হ্যারল্ডের সঙ্গে আলাপ করছিলাম— ওই যে আপনার ভয়ানক প্রাগৈতিহাসিক দানবের ব্যাপারে। হ্যারল্ড বলছিল ট্রেঞ্চের ভিতর ওরকম প্রকাণ্ড হাঙর থাকতে পারে। পানির হাজার হাজার পাউণ্ড ওজনের চাপও সহ্য করে দিব্যি আছে সে। আসলে ডক্টর, আমি আপনার পক্ষেই আছি। অবশ্য, এমন নয় যে আপনার থিয়োরি বিশ্বাস করি। কিন্তু ওখানে ওই নীচে নিজেই দেখেছি অদ্ভুত সব মাছ। পানির প্রচণ্ড চাপ তাদের সহ্য হয়ে গেছে। তা হলে মেগা হাঙর থাকাটাই বা অসম্ভব হবে কেন?' এক কান থেকে শুরু করে আরেক কান পর্যন্ত হাসতে শুরু করেছে টয়োডা।

মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করেছে কয়েকজন ক্রু।

খাবার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন নাসিম, ঠিক করেছেন কেবিনে ফিরবেন। 'আমার খিদে নেই, পরে দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে,' বললেন তিনি।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় খপ্ করে তাঁর বাহু ধরল টয়োডা। 'চলে যাচ্ছেন কেন, ডক্টর? বলুন না আপনার সেই হাঙরের কথা? জানতে চাই আমি। কাল যখন মিস্টার রানার পাশে নামব, দেখলে কীভাবে চিনব ওটাকে?'

'ওটা হবে মস্ত এক হাঙর, কিন্তু একটা দাঁত কম থাকবে!' বলে উঠল মানামি।

হাসতে শুরু করেছে ক্রুরা।

রাগ সামলে নিলেন নাসিম, আবারও গিয়ে বসে পড়লেন চেয়ারে। 'ঠিক আছে, টয়োডা, সত্যিই যদি ওই দানব সম্পর্কে জানতে চাও, বলতে আপত্তি নেই আমার। প্রথমে তোমার জানতে হবে হাঙর পরিবার টিকে আছে চার শ' মিলিয়ন বছর ধরে। আর মানুষের পূর্বপুরুষ গাছ থেকে মাটিতে নেমেছে মাত্র দুই মিলিয়ন বছর আগে। হাঙরের প্রজাতির ভেতর সেরা ছিল কারকারোডন মেগালোডন। সাগরের রাজা ছিল ওরা। প্রকৃতি ওদেরকে কেবল টিকে থাকার জন্যে তৈরি করেনি, প্রতিটি সাগরে আর সব মেরিন প্রজাতির উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছিল। আমরা আসলে সাধারণ কোনও হাঙরের কথা বলছি না। আমরা বলছি ভয়ঙ্কর এক যুদ্ধ-যন্ত্রের কথা। আপাতত ভুলে যাও ষাট ফুটি শ্বেত-হাঙরের কথা। মেগালোডন ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে দক্ষ শিকারি। ডায়নোসরের আমলে সত্তর মিলিয়ন বছর আগে অন্যসব শিকারির চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর দানব ছিল মেগালোডন। ওটার ছিল সাত থেকে নয় ইঞ্চি দীর্ঘ ক্ষুরধার দাঁত। আর ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ আটটা সেনসরি অঙ্গ।'

হাসতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেন। 'ডক্টর, কী বলছেন এসব? ওই হাজার হাজার বছর আগের মরা মাছ কে-ই বা দেখতে পেয়েছে?'

মুচকি মুচকি হাসছে কয়েকজন ক্রু।

আবারও নীরবতা নেমেছে ঘরে।

রানা ছাড়া সবাই ডক্টর নাসিমের জবাব আশা করছে।

'ফসিলাইয্‌ড্ দাঁত দেখে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন ওগুলো ছিল প্রকাণ্ড ও ভীষণ হিংস্র, অনায়াসে মস্ত সব মাছ শিকার করত।'

'সেনসরি অর্গানের কথা বলুন,' মনে হলো বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছে টয়োডো।

'ঠিক আছে, বলছি,' চিন্তাগুলো গুছিয়ে নিতে চাইলেন ডক্টর নাসিম। খেয়াল করলেন, চুপ হয়ে গেছে ক্রুরা। মনোযোগ দিয়েছে তাঁর কথায়। 'মেগালোডন ছিল শ্বেত-হাঙরেরই আত্মীয়। ওদেরও ছিল আটটা সেনসরি অর্গান। ওগুলো ব্যবহার করে শিকার খুঁজে নিত, পিছু নিত শিকারের। সবচেয়ে জরুরি অর্গান ছিল অ্যাম্পুলা অভ লোরেনযিনি। মেগালোডনের স্নাউটে ত্বকের নীচে ছিল জেলি ভরা ক্যাপসুল। ওগুলো পানির ইলেকট্রিকাল ডিসচার্জ চট্ করে টের পেত। সহজ ভাষায় বললে, মেগালোডন শিকারের হৃৎপিণ্ড বা পেশির ইলেকট্রিকাল ফিল্ড বা নড়াচড়া টের পেত কয়েক শ' মাইল দূর থেকে। তার মানে, গুয়ামের সৈকতের কাছে কেউ যদি ধীরেসুস্থে সাঁতার কাটে, মেগালোডন শুনতে পাবে এখান থেকে।'

নাসিম থামলেন, একটা কথা নেই কারও মুখে।

সবার চোখ পড়ে আছে তাঁর উপর।

'অ্যাম্পুলা অভ লোরেনযিনির মতই সমান শক্তিশালী ছিল মেগালোডনের ঘ্রাণেন্দ্রিয়। মানুষের মত নয়, ওরা ওদের নাকের ফুটো এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে নিতে পারত। এক ফোঁটা পানির

বিলিয়ন অণুর ভিতর বিশেষ একটা অণু চট্ করে চিনতে পারত। অর্থাৎ এক অণু থেকেই টের পেত পানিতে রক্ত, ঘাম না প্রস্রাব কোন্‌টা আছে। এবং বুঝে নিত ওটা আসছে কোথা থেকে। তোমরা সে-কারণেই দেখো মাথা নাড়তে নাড়তে আসছে শ্বেত-হাঙর। ওরা আসলে পানির নানাদিকের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে শিকার খুঁজে বের করে। প্রাপ্তবয়স্ক মেগালোডনের নাকের এক একটা ফুটো বড় আকারের মাল্টার সমান।

'এবার বলছি, ওই দানবের ত্বকের বিষয়ে। ওটাও সেনসরি অর্গান। দেহের দু'পাশে রয়েছে দুটো রেখা, লম্বা সরু ড্রেনের মত। ওখানে আছে নিউরোমাস্ট। এসব নিউরোমাস্ট পানির ভিতর সামান্যতম কম্পনও ধরতে পারে, বহুদূর থেকে টের পায় শিকারের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। আর...'

'এক্সকিউয মি,' উঠে দাঁড়াল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড। 'এবার আমাকে জরুরি কাজে যেতে হবে।'

'শুনেই যান না,' হালকা সুরে বলল টয়োডা। 'কালকে তো স্কুল নেই। একটু রাত জাগলেও মা বকবে না।'

কড়া চোখে টয়োডাকে দেখল হ্যারল্ড। 'কালকে তোমাকে সাগরে নামতে হবে, সে খেয়াল আছে? এখন সবারই গিয়ে বিশ্রাম নেয়া উচিত।'

'হ্যারল্ড ঠিকই বলেছেন, টয়োডা,' বললেন নাসিম। 'তা ছাড়া, বেশিরভাগটাই শিখে নিয়েছ। তবুও চট্ করে তোমাকে জানিয়ে দিই, মেগালোডনের বিশাল এক পাকস্থলী আছে। ওটা ওই হাঙরের ওজনের চারভাগের একভাগ। ফ্যাটি এনার্জি রিযার্ভ করে, পানির চাপ অনুযায়ী শরীরকে মানিয়ে নেয়। এমন কী চ্যালেঞ্জার ডিপের মত গভীর খাদেও।'

'ঠিক আছে, প্রফেসর,' বলল হ্যারল্ড ডেভিড, 'তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, ওই খাদে সত্যিই আছে মেগালোডন শার্ক। তা হলে

ওটা উঠে আসে না কেন? উপরে তো রয়ে গেছে অঢেল খাবার। নীচে সে তুলনায় ধরতে গেলে কিছুই নেই।'

'এর উত্তর সোজা,' বলল মানামি। 'ওটা যদি সাত মাইল উঠে আসে, বুম করে ফেটে যাবে ওর পেট।'

'কথাটা ভুল বললে,' জানালেন নাসিম। 'মানুষের মত করে চাপ সহ্য করতে হয় না হাঙরদের, ওরা অনায়াসেই সহ্য করে নিতে পারে। কিন্তু মেগালোডনরা এরই ভেতর সাত মাইল নীচের চাপ সয়ে নিয়েছে। পূর্ণবয়স্ক মেগালোডনের ওজন পঁয়তাল্লিশ টন, তার পঁচাত্তর ভাগই পানি, সেসব আছে পেশি ও কার্টিলেজের ভেতর। ওটার পাকস্থলী প্রকাণ্ড, যদি ধীরে ধীরে উঠে আসতে শুরু করে, ডিকমপ্রেশন করেই আসবে। ভয়ঙ্কর কষ্ট হবে উঠে আসতে, কিন্তু বাঁচবে প্রাণীটা।'

'তা হলে উঠে আসে না কেন?' বলল মানামি।

'তুমি আমার লেকচারে মন দাওনি,' বললেন নাসিম। 'আমি আগেও বলেছি, মেগালোডন বেঁচে আছে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের গরম পানির কারণে। ওই উত্তাপ আসছে হাইড্রোথার্মাল ভেন্টগুলো থেকে। কিন্তু ওগুলোর উপরের কয়েক মাইলে রয়েছে বরফ-ঠাণ্ডা পানি। বেশিরভাগ মেগালোডন মারা গেছে হাজার বছর আগে, পানির তাপমাত্রা কমে যাওয়ায়। তখন শুরু হয় শেষ বরফ-যুগ। মেগালোডন যদি ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে থাকে, ওগুলো উঠে আসতে পারে না উপরের হিমশীতল পানি পেরিয়ে। আসলে ওরা আটকা পড়েছে ওই খাদে। চাইলেও ঠাণ্ডা পানি ভেদ করে উঠে আসতে পারবে না।'

'আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে আপনার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর আছে,' বলল হ্যারল্ড ডেভিড। সন্দেহ প্রকাশ পেল তার কণ্ঠে। 'কিন্তু এখনও বলেননি ওরা অত নীচে কী খেয়ে বাঁচে। ওরা তো ষাট ফুট দৈর্ঘ্যের এক-একটা দানব। পেট ভরায় কী দিয়ে?'

'ধরে নেয়া যায় ওদের খাবার ফুরিয়ে গেছে,' টিটকারির সুরে বলল মানামি। 'আর তাই ইউনিস রোবটগুলোকে খেতে চাইছে।'

হেসে উঠল টয়োডা। পরক্ষণে গম্ভীর হয়ে গেল।

'ইউনিস রোবটগুলোকে গিলে নিতে পারবে মেগালোডন?'

হো-হো করে হেসে ফেলল মানামি ও হ্যারল্ড।

'তোমাদের নিজেদের ওজন ভুলে গেছ,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'হয়তো কখনও শেখোওনি কীভাবে জ্ঞানী, বয়স্ক, শিক্ষিত গুরুজনকে সম্মান দিতে হয়।'

'বাদ দাও, রানা,' বললেন নাসিম। 'না, টয়োডা, ওরা যা-তা খাবে না। স্নাউট দিয়ে স্পর্শ করেই বুঝবে, নতুন এই জিনিসটা খাবার নয়। কিন্তু ইউনিস সিস্টেম থেকে বেরুচ্ছে ইলেকট্রিকাল ইমপাল্‌স্‌, ওটা সহজেই টের পাবে মেগালোডন। এসব সিগনাল শুনে হয়তো বিরক্ত হতে পারে, রাগের মাথায় হামলাও করতে পারে।'

'তার মানে, ওরা টাইটেনিয়াম রোবট চিবিয়ে দেখবে না, তা হলে ওরা খায় কী?' বলল টয়োডা।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন নাসিম, তারপর বললেন, 'সত্যি বলতে কি, আমি জানি না ওরা কী খায়। তবে প্রকৃতি সবাইকেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার সময় দেয়। এমন হতে পারে ওদের মেটাবোলিযম কমে গেছে। ওখানে অক্সিজেন খুবই কম, খিদেও কম লাগার কথা। হয়তো নিজেদের জন্য একটা করে রাজ্য তৈরি করে নিয়েছে। খুব বেশি মেগালোডন নেই ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে। আর পালকে পাল প্রকাণ্ড টিউবওঅর্ম আছে খুশিমত খাওয়ার জন্য। মেগালোডনের অভাব হবে না প্রোটিনের। আর...'

'আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন টিউবওঅর্ম খেয়ে বেঁচে আছে ষাট ফুটি হাঙর?' ভুরু কুঁচকে নাসিমকে দেখল ইঞ্জিনিয়ার। 'পাগলের মত হয়ে যাচ্ছে না কথাটা? আপনিও জানেন, আমিও

জানি, ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে বাঁচার উপায় নেই মেগালোডনের।'

'কী করে জানলেন, ডেভিড?' জানতে চাইল রানা, বিরক্ত। 'আপনার মন বদ্ধ কূপের মত হতে পারে, কিন্তু অবিশ্বাস্য বলে জগতে কিছু নেই। আপনি নিজের চোখে দেখেননি বলেই বিশ্বাস করছেন না। আপনি তো বাংলাদেশ দেখেননি, তাই বলে কি ওই দেশটা নেই? পৃথিবীতে অনেক লোক পাবেন যারা বিশ্বাসই করে না মানুষ চাঁদে গেছে। আপনার অবস্থাও হয়তো তেমন।'

'তাই বলে টিউবওঅর্ম খেয়ে ষাট ফুটি কোনও...'

'তা ছাড়া ওখানে আছে প্রকাণ্ড সব স্কুইড,' বলল রানা। 'একেকটার ওজন হতে পারে দু'টন। মেগালোডনের তো খাবারের অভাব হওয়ার কথা নয়। আর প্রাচীন সব মাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাই বা কে কসম খেয়ে বলতে পারবে?'

আস্তে করে মাথা নাড়ল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। 'আপনিও দেখছি প্রফেসরের মত কথা বলছেন। কিন্তু এসবই ওঁর থিয়োরি। কল্পনা করছেন উনি। আর এর মূল কারণ, আমি বলব, অপরাধবোধ পুড়িয়ে চলেছে তাঁর ভেতরটা।'

দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

শিস দিল টয়োডা। 'যাই হোক, আমি খুশি যে প্রফেসর হ্যালুসিনেশনের ভিতর ছিলেন, নইলে শুনতে পেতাম এই রোমাঞ্চকর গল্প।' বোনের দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে সে। 'এবার আরাম করে ঘুমাতে পারব। গুড নাইট, মানামি।' বোনের কপালে চুমু দিয়ে উঠে পড়ল টয়োডা, রওনা হয়ে গেল ইঞ্জিনিয়ারের পিছনে।

পাঁচ সেকেণ্ড পর করিডোর থেকে ভেসে এল দমফাটা হাসির আওয়াজ।

মুখ কালো করে বসে রইলেন নাসিম আহমেদ।

'চলুন, আমরাও উঠে পড়ি,' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলালেন প্রফেসর।

'গুড নাইট, মানামি,' চেয়ার ছাড়ল রানা। নাসিমের পিছনে বেরিয়ে এল গ্যালি থেকে।

'আমি কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ব, বড্ড ক্লান্তি লাগছে,' বিমর্ষ ভঙ্গিতে বললেন নাসিম।

'ঠিক আছে, নাসিম ভাই, শুয়ে পড়ুন, আমি জাহাজটা ঘুরে দেখে আসি,' বলল রানা।

নাসিম চলে যেতে ডেকে উঠে এল ও। রেলিং ধরে দাঁড়াল।

আজ অস্বাভাবিক শান্ত সাগর। কিন্তু পুবাকাশে ঘন কালো মেঘ। আধখানা চাঁদের দিকে চাইল রানা। ওটা বারবার ভেসে উঠছে মহাসাগরের বুকে। তিরতির করে কাঁপছে ঢেউগুলো। নিজের বুকেও অদ্ভুত কম্পন, টের পেল রানা। নিতে চলেছে এভারেস্ট জয়ের মত মস্ত ঝুঁকি।

একটু পর উপরের ডেকে ডাক্তার ফিল ম্যাককমনকে দেখল। লোকটা এখনও নিজের কাজে ব্যস্ত।

আরও কিছুক্ষণ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল রানা, তারপর জাহাজটা এক চক্কর ঘুরে দেখে ঢুকল নিজের কেবিনে।

ভোরে উঠতে হবে, নামতে হবে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের সবচেয়ে বিপজ্জনক অংশে। জানা নেই কী দেখবে চ্যালেঞ্জার ডিপে গিয়ে।

তিন মিনিট পেরুবার আগেই ঘুমিয়ে পড়ল সিঙ্গল কটে শুয়ে।

নয়

তামাটে ভোর আসতেই হালকা নাস্তা করে নিয়েছে ওরা, তারপর

তৈরি হয়েছে— মাসুদ রানা ও টয়োডা সিনোসুকা।

এইমাত্র ওয়েট সুট পরে ডেকে উঠেছে রানা, আসবার পথে চিফ ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছে, আগেই সাগরে নেমে গেছে টয়োডা, ডুব দিয়ে অপেক্ষা করছে বিশফুট নীচে।

সাবধানে সাবমারসিবলে ঢুকল রানা, নিজেকে আটকে নিল পাইলট হার্নেসে। নোজ কোনের ভিতর দিয়ে চাইল। একটু দূরে প্রকাণ্ড উইঞ্চ, নামিয়ে দিয়েছে স্টিলের কেবল। টয়োডার সাবের মেকানিকাল বাহুতে আটকে দেয়া হয়েছে হুক। এতে অনেক সময় লেগেছে। দশমিনিট চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছিল টয়োডা, পরে মেকানিকাল বাহুর থাবার সঙ্গে হুক লাগিয়ে দিয়েছে দুই ডুবুরি।

ফ্রিগেট নিতুর দু'পাশে দুটো ছোট উইঞ্চ, কাজই শুধু অ্যাবিস গ্লাইডার নামানো বা তুলে নেয়া। এখন তারই একটা ধীরে ধীরে রানার সাব নামিয়ে দিচ্ছে অস্থির কালো পানিতে। প্রকাণ্ড হার্নেসের দু'পাশে দুই ফ্রগম্যান নিশ্চিত করছে ঠিকভাবে নামছে সাব। বড় উইঞ্চের কাজ শুধু টয়োডার সাবমারসিবলকে কেবল দেয়া।

ক্যাপসুলের ভিতর চুপ করে শুয়ে আছে রানা। দেখল, দুই ফ্রগম্যান সাব থেকে খুলে দিল হার্নেস। নেমে পড়েছে ও প্রশান্ত মহাসাগরে। নিতুর রেলিং থেকে চেয়ে আছে হতাশ মানামি, পরক্ষণে হারিয়ে গেল।

তলিয়ে গেছে সাব। লেক্সান নোজ কোনে টোকা দিল এক ফ্রগম্যান, বুঝিয়ে দিল সব ঠিকভাবেই চলছে। ছেড়ে দেয়া হয়েছে অ্যাবিস গ্লাইডার-টুকে।

টুইন ইঞ্জিন চালু করে সামনে থ্রটল ঠেলল রানা। ঠিক করে নিল মিডউইং, নীচের দিকে নাক তাক করে রওনা হয়ে গেল।

সাড়া দিচ্ছে ভেসেল। অবশ্য রানার মনে হলো, অনেক ভারী

এই সাব। আসলে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান এটার চেয়ে অনেক হালকা।

ক' সেকেণ্ড পর টয়োডাকে খুঁজে পেল রানা।

ইউনিস ইউনিট তুলবার জন্য যে কেবল, সেটার হুক মেকানিকাল থাবার ভিতর ঠিকভাবেই আছে।

পাশাপাশি হতেই পরস্পরকে দেখতে পেল ওরা।

হাসল টয়োডা, খুশিমনে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল।

'অ্যাবিস গ্লাইডার কেমন লাগছে, মিস্টার রানা?' রেডিয়োতে বলল।

'ভালই তো।'

জয়স্টিক আরও সামনে ঠেলল রানা। সাড়া দিয়ে ডাইভ শুরু করল দশ ফুটি সাবমারসিবল।

স্টিলের কেবল নিয়ে পিছু নিল টয়োডা।

তিরিশ ডিগ্রি অ্যাংগেলে নামছে ওরা।

মস্ত কোন ঘোরানো সিঁড়ির মত বিরাট জায়গা নিয়ে চক্কর কাটতে কাটতে ধীরে ধীরে নেমে যাবে তলদেশে।

ক' মিনিট পর একেবারেই ম্লান হলো ভোরের আলো। পুরো ধূসর হয়ে গেল পানি। তার দুই মিনিট পর কুচকুচে কালো হয়ে গেল চারপাশ।

ডেপথ গজ দেখল রানা।

গভীরতা মাত্র বারো শ' পঞ্চাশ ফুট।

উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রানা, অদ্ভুত লাগছে পজিশনটা। হার্নেস না থাকলে নোজ কোনে গিয়ে মাথা দিয়ে গুঁতো দিত।

'বিশ্রাম নাও,' মনে মনে নিজেকে বলল রানা। 'পাড়ি দিতে হবে বহু পথ।'

'সব ঠিক তো, মিস্টার রানা?' রেডিয়োতে ভেসে এল ডাক্তার ফিল ম্যাককমনের কণ্ঠ। তার কাজ দুই পাইলটের ভাইটাল সাইন

মনিটর করা। সে এখন বসে আছে কার্ডিয়াক মনিটরের সামনে।

'হ্যাঁ, ঠিক আছি,' বলল রানা। বড় করে দম নিয়ে চুপ করে শুয়ে রইল। একবার ভাবল স্পট লাইট জ্বেলে সাগর দেখবে, কিন্তু তা করল না।

সাবের ব্যাটারির পাওয়ার নষ্ট করা উচিত হবে না।

চোখের সামনে অদ্ভুত সব মাছ, দেহ থেকে আসছে আলো।

মনে মনে বলল রানা, অ্যাবিসোপেলাজিক অ্যানিমেল।

মাছ, স্কুইড বা চিংড়ি জাতের প্রাণী— সবাই আঁধার রাজ্যের বাসিন্দা।

সামনে চার ফুটি এক কালপার ইল মস্ত হাঁ করল, ওর মতলব ছিল গিলে নেবে নোজ কোনটাকে। খুব কাছ থেকে সুঁচের মত অসংখ্য দাঁত দেখল রানা। লেক্সান প্লাস্টিকে একটা টোকা দিতেই নিঃশব্দে ছিটকে ভাগল ইল।

বামে চাইল রানা। একটু দূরেই চক্কর কাটছে গভীর সাগরের অ্যানজেল ফিশ, মুখে ভুতুড়ে আলো। রানার মনে পড়ল, ওই মাছের রড ফিন আছে। জোনাকির মত আলো জ্বালে। ছোট মাছ ভাবে ওখানে খাবার, ছুটে আসে খিদে নিয়ে, আর অমনি— গপ্!

হঠাৎ শীত লেগে উঠল ওর।

চট্ করে দেখে নিল টেম্পারেচার গজ।

বাইরে তাপমাত্রা বেয়াল্লিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

পাইলট ক্যাপসুলের থার্মোস্ট্যাট বাড়িয়ে নিল ও।

টয়োডার খোঁজে চারপাশে চাইল।

সাবের বাইরের দিকের বাতি জ্বেলেছে সে।

রানা নিজেও একই কাজ করল।

বেশিদূর গেল না সাদা রশ্মি, যেটুকু গেল, তার ওপাশে ঘন কালো আঁধার।

কিছুক্ষণ নেমে যাওয়ার পর রানা টের পেল, কপাল বেয়ে

ভুরুর ভিতর নামছে ঘাম। সুইচ টিপে বন্ধ করে দিল হিটার।

'আপনারও একা লাগছে, তাই বাতি জ্বাললেন?' রেডিয়ো করল টয়োডা।

'চারপাশ দেখে নিলাম,' বলল রানা। 'এবার এসো বাতি নিভিয়ে দিই।'

'তাই বোধহয় ভাল,' বলল টয়োডা। 'বলে দিয়েছে ব্যাটারি কম খরচ করতে।'

রানার সাবের বাতি নিভে যেতেই সে-ও আলো নিভিয়ে দিল।

'তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো, টয়োডা?' জানতে চাইল রানা।

'এখনও না, কিন্তু ওই কেব্‌লটা পেঁচিয়ে যাচ্ছে মেকানিকাল আর্মের সঙ্গে। ঠিক টেলিফোন-রিসিভারের কর্ডের মত।'

'পরে ছাড়িয়ে নিতে পারবে, না ওপরে উঠে ঠিক করে নেবে?' জানতে চাইল রানা।

'না-না, উঠব না। নীচে যাওয়ার পর লাটিমের মত বিশবার উল্টো পাক ঘুরে নিলেই হবে।' স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে হাসল টয়োডা।

ওর কণ্ঠে উত্তেজনা টের পেল রানা।

'মিস্টার ডেভিড,' চিফ ইঞ্জিনিয়ারের উদ্দেশে বলল। 'টয়োডা বলছে মেকানিকাল আর্মের সঙ্গে পেঁচিয়ে যাচ্ছে কেবল। ওপর থেকে ঠিক করা যায়?'

'না, সে উপায় নেই,' জাহাজ থেকে বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। 'ও সবকিছু নিয়ন্ত্রণেই রেখেছে। আমরা মনিটর করছি। আপনি নিজের দিকে খেয়াল রাখুন। হ্যারল্ড আউট।'

তিলতিল করে সময় পেরুচ্ছে।

অনেকক্ষণ পর হাতঘড়ি দেখল রানা।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলো সাগরে নেমেছে ওরা।

আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে কোমর থেকে নীচের সব পেশি। টানটান চামড়ার হার্নেসে শিথিল করে দিল দু'পা। লেক্সান প্লাস্টিকের ভিতর দিয়ে চাইল।

চারপাশে পানির চাপ এখন প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ষোল হাজার পাউণ্ডেরও বেশি।

একবার ডেপথ গজ দেখল।

নেমে এসেছে চৌত্রিশ হাজার ফুট নীচে।

শিরশির করে উঠল ওর মেরুদণ্ড।

আগে কখনও এত গভীরে নামেনি।

গাঢ় আঁধার থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে কন্ট্রোল প্যানেলের রিডআউট দেখল।

বাইরের তাপমাত্রা ছত্রিশ ডিগ্রি।

ক্রমেই বাড়ছে তাপ।

আটত্রিশ...

চল্লিশ...

বেয়াল্লিশ...

'আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি, টয়োডা,' বলল রানা।

'ঠিকই বলেছেন,' বলল জাপানি যুবক। 'এবার ঢুকে পড়ব ট্রপিকাল কারেন্টে। কালো জ্বালামুখগুলো পেরিয়ে নেমে যাওয়ার সময় আরও বাড়বে তাপমাত্রা। ওই যে, ওখানে টিউবওঅর্ম।'

নীচে চেয়ে কিছুই দেখতে পেল না রানা।

'টু ও-ক্লকের দিকে তাকান,' বলল টয়োডা। 'না, দেখতে পাবেন না। নীচের জ্বালামুখ দিয়ে উঠে আসছে কালো ধোঁয়ার মত মিনারেল।'

সত্যিই, ঘন কালো মেঘের মত উঠছে হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের উগরে দেয়া পানি। তলদেশে ছড়িয়ে পড়ছে ভারী সব ধাতু ও বিষাক্ত মিনারেল।

হয়তো ওই ধোঁয়ার কারণেই তিনবছর আগে সাদা দানবকে একটু পরে আর দেখতে পাননি নাসিম, আঁধারে মিলিয়ে গিয়েছিল ওটা।

'টয়োডা!' কার্ডিয়াক মনিটর দেখে প্রায় ধমকে উঠল ডাক্তার ফিল ম্যাককমন। 'কী করছ! মাত্রাছাড়া উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। নিজেকে শান্ত করো।'

'আমি ঠিক আছি... একটু উত্তেজিত,' বলল টয়োডা।

ডিজিটাল টেম্পারেচার রিডআউট দেখল রানা।

ক্রমেই বাড়ছে তাপ।

পঞ্চাশ ডিগ্রি...

ষাট...

আরও বাড়ছে গরম।

নব্বুই ডিগ্রি...

ওরা ঢুকে পড়েছে উষ্ণ ক্যানিয়নের ভিতর।

নীচে একের পর এক হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট।

'টয়োডা, সার্চ লাইট জ্বেলে নাও,' সতর্ক করল রানা। 'আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ঘন পানি এড়িয়ে যেতে হবে।'

'সাবধান করার জন্য ধন্যবাদ, মিস্টার রানা,' বলল টয়োডা। 'মনে ছিল না সাবের সিরামিক সিল গলে যেতে পারে।'

রানা জ্বেলে নিয়েছে সার্চলাইট।

নীচে দেখা গেল অন্তত বারোটা চিমনি আকৃতির জ্বালামুখ। কোনও কোনওটা তিরিশ ফুট উঁচু। পেট থেকে বেরুচ্ছে কালো পানি।

ওই অদ্ভুত জিয়োলোজিকাল ফর্মেশন রানা আগেও দেখেছে।

পৃথিবীর বুকে হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের মাধ্যমে ছিটকে বেরিয়ে আসছে অতি উত্তপ্ত পানি। সঙ্গে আনছে গন্ধক, তামা, লোহা এবং অন্যান্য মিনারেল। সাগরের ফাটল ধরা তলদেশে জমছে সব।

ঠাণ্ডা হওয়ার পর সরু সরু আগ্নেয়গিরির মত চিমনি তৈরি করছে। কখনও কখনও সাগরের বুকে নাক তুলছে অনেক উপরে। জ্বালামুখের ভিতর থেকে যে পানি ছিটকে আসছে, ওটার সঙ্গে থাকছে ঘন গন্ধক।

পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা এসব জ্বালামুখের নাম দিয়েছেন: 'ব্ল্যাক স্মোকার'।

ধোঁয়া উদ্গিরণ করা দুই জ্বালামুখের মাঝ দিয়ে চলেছে রানা।

বেশি দূর দৃষ্টি চলছে না।

পারদের মত হয়ে উঠেছে চারপাশ।

বাইরের তাপমাত্রা দেখল ও।

দুই শ' তিরিশ ডিগ্রি।

সাড়ে সাত হাজার ওয়াটের সার্চলাইটের বাতি অনুসরণ করে নীচের কালো পানির দিকে নেমে চলেছে রানা।

একটু পর পরিষ্কার হয়ে গেল সাগরের পানি।

সার্চলাইটের বাইরে চারপাশে শুধু কুচকুচে কালো আঁধার।

চুপ করে চেয়ে রইল রানা।

টয়োডা ঠিকই বলেছে।

ওরা যেন পৌঁছে গেছে পৃথিবীর বাইরে, ভিন্ন কোনও জগতে।

মিডউইং ব্যবহার করে নেমে যাওয়ার অ্যাংগেল কমিয়ে নিল ও। তিরিশ সেকেণ্ড পর থেমে গেল। সাগর তলদেশ থেকে বিশ ফুট উপরে ভাসছে। অপেক্ষা করছে টয়োডার জন্য।

নীচে বিছিয়ে আছে অসংখ্য দানবীয় শেলফিশ। একেকটা এক ফুট থেকে দেড় ফুট। সাদা রঙের, জ্বলজ্বল করছে আলো পড়ে। হাজার হাজার, ঘিরে রেখেছে ভেন্টগুলোকে। দেখলে মনে হয় ঈশ্বরকে পূজা দিচ্ছে ভক্ত উপাসক।

চোখের কোণে নীচে নড়াচড়া দেখল রানা।

ফাটল ধরা তলদেশে শত শত শামুক, ঝিনুক, লবস্টার,

কাঁকড়া— সব সাদা রঙের। আলো পড়ে চকচক করছে। আঁধার খাদে আলো নেই, কাজেই দৃষ্টিশক্তি হয়তো আছে, কিন্তু তার ব্যবহার নেই এ অঞ্চলে।

আঁধার, গভীর সাগরে বাতির ব্যবস্থা করে নিয়েছে অনেক মাছ। কেউ ব্যবহার করছে লুসিফেরেন কেমিকেল, আবার কেউ নিজের দেহের ভিতর রেখেছে আলো দেয়া ব্যাকটেরিয়া।

প্রকৃতি এখানে চকচকে সাদা করে দিয়েছে প্রতিটি প্রাণীর ত্বক। ওই দেখিয়ে শিকার জোগাড় করে ওরা, চিনে নেয় একে অপরকে।

পৃথিবীর বুকে জীবন এমনই।

সাগরের প্রতিটি খাদে রয়েছে শত শত প্রজাতির মাছ ও অন্যান্য প্রাণী। প্রথম প্রথম চমকে গিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা, তারপর মেনে নিয়েছেন, তাঁদের ধারণা ছিল পুরোপুরি ভুল— সূর্যের আলো না থাকলেও কোনও না কোনও প্রাণী ঠিকই জীবন চালিয়ে নেয়। প্রকৃতিই রক্ষা করে তাদেরকে।

একসারি দানবীয় শামুক ও মাসেলের পাশে প্রকাণ্ড বড় এক দঙ্গল জ্বলজ্বলে টিউবওঅর্ম দেখল রানা। উষ্ণ পানিতে লকলক করছে ইয়া মোটা স্প্যাঘেটির মত। ওগুলোর দেহ থেকে বেরুচ্ছে মৃদু টিউবলাইটের মত আলো। অবশ্য দু' প্রান্ত রক্তের মত লাল। একেকটা লম্বায় কমপক্ষে বারো ফুট, মোটা পাঁচ ইঞ্চি। এতই বেশি এরা, সংখ্যা গোনা অসম্ভব। পানির ব্যাকটেরিয়া খেয়ে বাঁচে ওরা, ওদের ছিঁড়ে খায় ছোট ছোট সব মাছ।

আঁধার জগতে তৈরি হয়েছে অদ্ভুত এক ফুড চেইন।

কিন্তু ওই ফুড চেইনের শীর্ষে কে? ভাবল রানা।

জায়ান্ট স্কুইড?

না, আর কোনও অচেনা প্রাণী?

এই সাত মাইল গভীর সাগর-তলে প্রতি এক বর্গ ইঞ্চিতে

চাপ সহ্য করছে এরা ষোলো হাজার পাউণ্ডেরও বেশি।

আর ওকে রক্ষা করছে মাত্র কয়েক ইঞ্চি পুরু অ্যালয়, ভাবল রানা।

নাসিম আহমেদের কথা মনে পড়ল।

তিনি বলেন মেগালোডনের কথা।

এখানে এসে তেমন কিছু দেখতে পাইনি বলে আমি খুশি, ভাবল রানা। ও জিনিস না থাকলেই তো ভাল!

অ্যাবিস গ্লাইডার-টু-র গতি কমিয়ে দিল। উপরে দেখতে পেল উজ্জ্বল আলো। নেমে আসছে টয়োডার সাব।

রেডিয়োতে বলল রানা, 'এবার পথ দেখাও, টয়োডা।'

গতি কমে গেল জাপানি যুবকের সাবের। ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল। যথেষ্ট দূরত্ব রেখেছে রানার কাছ থেকে।

দুই অ্যাকুনট পরস্পরের দৃষ্টির আড়ালে যেতে চাইছে না।

অবশ্য টয়োডার কেব্‌ল থেকে সরে আছে রানা।

রেডিয়োতে ভেসে এল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিডের কণ্ঠ, 'বামে পড়বে ক্যানিয়নের দেয়াল। দূরত্ব আন্দাজ আড়াই শ' ফুট।'

সাগরতলের দশফুট উপর দিয়ে টয়োডার পিছু নিয়েছে রানা।

নীচে ফাটল ধরা পাথুরে জমিন।

কিছুদূর যাওয়ার পর বামে পড়ল ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল। আলো গিয়ে পড়েছে দূরে। ওরা আসলে ঢুকে পড়েছে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এক উপত্যকায়।

রানার মনে হলো, ভুল করে সাগরের সাত মাইল নীচে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নটাকে।

সিমাউণ্ট চারপাশে।

একেকটার বয়স কম করে দুই শ' মিলিয়ন বছর।

একটা ফাটলের ভিতর দিয়ে চলেছে ওরা।

টয়োডাকে নজরে রেখেছে রানা।

'সামনের পানি বিক্ষুব্ধ,' সাবধান করল টয়োডা।

রানা টের পেল, কুকুরের লেজের মত নড়তে শুরু করেছে ওর সাবের লেজ।

'যখন তখন এদিকে ভূমিধস হতে পারে,' মন্তব্য করল রানা।

'ভুল হোক আপনার কথা, নইলে...'

'সামনে কিছু দেখলে?' জানতে চাইল রানা।

'এখনও না, কিন্তু নষ্ট ইউনিসের হোমিং সিগনাল ধরছে রেইডার। খাদের উত্তর দিকে। একটু পর দেখতে পাব।' কয়েক মুহূর্ত পর বলল টয়োডা, 'সামনে চওড়া হয়েছে উপত্যকা। ক্যানিয়নের দেয়াল থেকে ষাট ফুট দূরে রাখা হয়েছিল ইউনিস। আমাদের বামে পড়বে।'

ডানে চাইল রানা। সিমাউন্ট হারিয়ে গেছে। দূরে আঁধার সাগর। বামে বহু উপরে উঠেছে ক্যানিয়নের প্রাচীর। শেষমাথা চোখের আড়ালে।

কন্সোল স্ক্রিনে টিপটিপ করতে দেখল রানা লাল বিন্দু।

'ওই যে!' দীর্ঘ বিরতি শেষে নীরবতা ভাঙল টয়োডা।

কয়েকটা পাথরের নীচে বাতিল লোহার মত পড়ে আছে নষ্ট ইউনিস, দুমড়ে গেছে দেহ।

টয়োডা দশ ফুট উপরে স্থির হলো বিধ্বস্ত জলযানের, রাস্তার জোরালো বাতির মত আলো ফেলেছে সার্চলাইট দিয়ে ওটার উপর।

'ঠিক আছে, মিস্টার রানা, এবার কাজে নামতে পারেন।'

নষ্ট ইউনিসের কাছে চলে গেল রানা।

চারপাশ দিন হয়ে উঠেছে টয়োডার সাবের আলোয়।

ভাঙা জলযানের উপর নিজের সার্চলাইটও ফেলল রানা।

কী যেন অন্যরকম মনে হলো ওর।

আগে দেখা ওই ছবির মত নয়।

আবর্জনার উপর মনোযোগ দিল।

ওখানে কী যেন নড়ছে।

'কিছু দেখলেন?' রেডিয়ো করল টয়োডা।

'না, এখনও কিছু না,' বলল রানা। সাদা কিছু দেখলেই সতর্ক হবে। আরও কাছে চলে গেল, উঁকি দিল পাথরগুলোর উপর দিয়ে।

হ্যাঁ, ওই তো!

'টয়োডা, আমি বোধহয় নাসিম ভাইয়ের ওই মেগ্যালোডনের দাঁত খুঁজে পেয়েছি,' চাপা স্বরে বলল রানা।

সাবের মেকানিকাল আর্ম বাড়িয়ে দিল ও, তুলে নিতে চাইল আট ইঞ্চি সাদা ত্রিকোণ জিনিসটা।

খুব সাবধানে গন্ধক ও লোহার স্তূপ থেকে তুলতে শুরু করেছে ওটা।

'আরে, মিস্টার রানা!' হো-হো করে হেসে ফেলল টয়োডা। 'আপনি তো মাৎ করে দিলেন আমাদের সবাইকে!'

মেকানিকাল আর্ম ব্যবহার করে জিনিসটা তুলে নিয়েছে রানা।

ওটা একটা সাদা রঙের মৃত স্টারফিশ।

'জিনিসটা কী মেগালোডনের...' রেডিয়োতে জানতে চাইলেন নাসিম আহমেদ, একটু কেঁপে গেল ওঁর কণ্ঠ।

'একটা মরা স্টারফিশ, মিস্টার রানার তরফ থেকে আপনার জন্য বিশেষ উপহার,' জানাল টয়োডা।

'ডক্টর আহমেদ, মিস্টার রানা পেয়ে গেছেন আপনার দাঁত,' জাহাজ থেকে ভেসে এল মানামির শ্লেষের হাসি।

গলা ছেড়ে হাসছে ডাক্তার ফিল ম্যাককমন ও ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড।

'আপনাকে আরেকটা দাঁত খুঁজে দেব, ডক্টর আহমেদ,' কপট

সান্ত্বনা দিল টয়োডা। রানার উদ্দেশে বলল, 'লেগে থাকুন, রানা, আজ হোক বা কাল, আপনি ডক্টরের হারিয়ে যাওয়া দাঁত নিশ্চয়ই ফেরত আনতে পারবেন।'

চুপ করে রইল রানা। এমন রাগ হলো, মন চাইল ক্যানিয়নের দেয়ালে গুঁতো লাগিয়ে দেবে সাব দিয়ে।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল টয়োডা, 'এবার আমাকে নিয়েও হাসতে পারেন। দেখুন, সাবের মেকানিকাল আর্মের দিকে।'

ছয় ফুটি মেকানিকাল আর্মে ভালভাবেই পেঁচিয়ে গেছে স্টিলের কেবল। ওগুলোর ভিতর দিয়ে প্রায় চোখেই পড়ছে না জিনিসটা।

'কেবল ছাড়িয়ে নিতে বেশ সময় লাগবে, টয়োডা— পারবে তো?' জানতে চাইল রানা।

'দুশ্চিন্তা করবেন না, ছাড়িয়ে নেব। আপনি পাথর আর কাদা সরাতে শুরু করুন।'

'ডক্টর আহমেদ, আপনি বোধহয় ভেবেছিলেন ষাট ফুটি স্টারফিশ পাবেন?' রেডিয়োতে ভেসে এল ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ডের টিটকারি ভরা কণ্ঠ।

জবাবে কিছু বললেন না নাসিম।

চাপা শ্বাস ফেলে মেকানিকাল আর্ম নিয়ে কাজে নেমে পড়ল রানা।

পাঁচ মিনিট পর পরিষ্কার হয়ে গেল ইউনিসের চারপাশ।

'চমৎকার!' প্রশংসা করল টয়োডা। তখনও ধীরে ধীরে ঘুরছে সাব নিয়ে। গিঁঠ খুলে আসছে কেবলের।

'সাহায্য লাগবে?' জানতে চাইল রানা।

'না, ওখানেই থাকুন। আর একমিনিট।'

তলদেশ থেকে বিশ ফুট উপরে ভাসছে রানা। ভাবছে, হয়তো ঠিকই বলেছিলেন তামেশু সিনোসুকা, অন্যরাও।

হ্যালুসিনেশন হয়েছিল নাসিম ভাইয়ের। গভীর সাগরে কল্পনায় দেখেছিলেন মস্ত এক দানব, আর ওই ভুলের কারণে মারা পড়েছে নেভির দু'জন সায়েন্টিস্ট। খতম হয়ে গেছে ওঁর নিজের ক্যারিয়ার। ভবিষ্যতে কেউ বিশ্বাস করবে না ওঁকে। আরও আঘাত আসছে। নাসিম ভাইকে ছেড়ে গিয়ে তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কণ্ঠে ঝুলে পড়তে চলেছে তাঁর স্ত্রী।

আজ চ্যালেঞ্জার ডিপে নেমে মেগালোডনের ছায়াও দেখেনি ওরা, ছড়িয়ে পড়বে এই খবর। দুনিয়ার সব প্যালিয়োনটোলজিস্ট ঝাঁপিয়ে পড়বে নাসিম ভাইয়ের উপর। ওঁকে নিয়ে হাসি-তামাশা হবে, নানান আর্টিকেলে লেখা হবে: কোথাকার এক বাঙালি প্যালিয়োন্টোলজিস্ট গাঁজা খেয়ে নেশার ঘোরে কী না কী দেখেছে, উঠে এসে যা খুশি তাই বোঝাবার চেষ্টা করছে মানুষকে।

মন খারাপ হয়ে গেল রানার।

মেগালোডনের একটা দাঁতও যদি পেত?

নাহ্, তার বদলে তুলেছে ও মরা স্টারফিশ!

আসলে আর কিছুই করার নেই ওর।

এবার...

ব্লিপ!

ওই আওয়াজ পেয়ে গভীর চিন্তা থেকে উঠে এল রানা। রেইডারের দিকে চাইল। সাগর-তলের এ পাহাড়ি এলাকায় স্ক্রিনে দেখা দিয়েছে লাল এক বিন্দু।

খুব দ্রুত আসছে ওটা।

ব্লিপ!

ব্লিপ!

ব্লিপ... ব্লিপ... ব্লিপ...

চমকে গেছে রানা। ওটা যা-ই হোক, বিশাল আকৃতির!

'টয়োডা, রেইডার চেক করো,' দ্রুত বলল রানা।

'রেইডার? ...আরে... কী আসছে ওটা!'

'হ্যারল্ড?' ডাকল রানা।

একটু আগেও খিকখিক আওয়াজ আসছিল, এখন চুপ হয়ে গেছে লোকটা। ওপরের সবাই চুপ। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমরাও দেখতে পেয়েছি। ইউনিসের সঙ্গে কেবল আটকে দিয়েছে টয়োডা?'

মুখ তুলে চাইল রানা।

ব্যস্ত হয়ে উঠেছে টয়োডা। এখন আর সাব ঘুরিয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছে না কেবল। মেকানিকাল আর্ম নেড়ে গিঁঠ ছাড়াতে চাইছে।

'না, এখনও কাজ শেষ হয়নি,' বলল রানা। 'আকারে ওটা কত বড়?'

'শান্ত থাকো, রানা,' চাপা স্বরে বললেন নাসিম।

'আপনারা যা ভাবছেন তা সম্পূর্ণ ভুল,' বলল ডাক্তার ম্যাককমন। 'হ্যারল্ডের ধারণা ওটা এক ঝাঁক মাছ।'

রেইডারের দিকে আবারও চাইল রানা।

ওর মনে হলো না মাছের ঝাঁকের তৈরি ওই বিন্দু।

আসছে সোজা ওদের দিকেই।

'হোমিং বিকন অফ করো, রানা,' সতর্ক করলেন নাসিম। 'মেগালোডন হোমিং বিকনের কারণেও তেড়ে আসতে পারে।'

'টয়োডা, বিকন বন্ধ করো,' নির্দেশ দিল রানা। নিজেও সুইচ অফ করে দিয়েছে। 'ভুলেও নড়বে না!'

'কী?' অবাক স্বরে বলল টয়োডা, কোনওদিকে খেয়াল ছিল না ওর। 'আমি তো প্রায় খুলে এনেছি...'

'টয়োডা-রানা, ওটা যদি কারকারোডন মেগালোডন হয়, সাবের ইলেকট্রিকাল ইমপালস পেয়ে ছুটে আসছে হামলা করতে,' সতর্ক করলেন নাসিম। 'সব ধরনের পাওয়ার অফ করো!'

'জলদি, টয়োডা!' সাবমারসিবলের পাওয়ার সুইচ অফ করে দিল রানা। নিভিয়ে দিল সাড়ে সাত হাজার ওয়াটের সার্চলাইট।

ধক-ধক করছে টয়োডার হৃৎপিণ্ড। বন্ধ করেছে মেকানিকাল আর্ম নাড়া। 'এবার কী করতে হবে, হ্যারল্ড?' জানতে চাইল চিফ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে।

'নাসিম ও তার সাগরেদ উন্মাদ হয়ে গেছে,' গলা শোনা গেল ডাক্তার ম্যাককমনের।

হ্যারল্ডও বলে উঠল, 'সময় নষ্ট হচ্ছে, টয়োডা। এবার কেবল আটকে দাও, উঠে আসতে শুরু করো।'

'টয়োডা, সার্চলাইট...' তাড়া দিতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল রানা।

পাঁচ শ' গজ দূরে প্রকাণ্ড কী যেন চক্কর কাটছে পানিতে।

ফ্লুরেসেন্ট বাতির মত মৃদু আলো আসছে তার দেহ থেকে!

দশ

হঠাৎ করেই নিভে গেল টয়োডার সার্চলাইট।

নরকের ঘুটঘুটে আঁধার ঘিরেছে দুই সাবমারসিবলকে। নিজের হাতও দেখতে পাচ্ছে না রানা। চুপ করে অপেক্ষা করছে, দুরু-দুরু কাঁপছে বুক।

কালিগোলা আঁধারে প্রকাণ্ড জিনিসটার ত্বক থেকে বেরুচ্ছে ম্লান ফ্যাকাসে আলো। দুই সাবকে ঘিরে নিঃশব্দে ঘুরছে, ভাসছে আকাশের চিলের মত। ক্রমেই ছোট করে আনছে বৃত্ত।

গলার কাছে কী যেন আটকে গেছে বলে মনে হলো রানার, শুকনো ঢোক গিলল অজান্তে।

মস্ত মাথা ও ত্রিকোণ স্নাউট নিয়ে এগোতে শুরু করেছে ওটা।

বাঁকা চাঁদের মত লেজ অনেক পিছনে।

রানা আঁচ করল, ওই মেগালোডন দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে চল্লিশ ফুট, ওজন হবে তিরিশ হাজার পাউণ্ড। দানবীয় শামুকের মতই, দেহ থেকে আসছে ম্লান আলো।

আবারও ঘুরে গেল ওটা, ক্যানিয়নের প্রাচীরের পাশে ভাসছে এখন। রানা দেখতে পেল ওটার যৌনাঙ্গ— পুরুষ।

রেডিয়োতে ফিসফিস করল ভীত টয়োডা, 'মিস্টার রানা, আমি এখন বিশ্বাস করি সবই। এবার কী করব বলুন!'

'শান্ত থাকো,' উপর থেকে নিচু স্বরে বললেন নাসিম। 'ওটা বুঝতে চাইছে শিকারের আকার। নিশ্চিত নয় সাবমারসিবল খাবার জিনিস কি না। একদম নড়বে না।'

'টয়োডা, রিপোর্ট করো!' ক্যাপসুলের ভিতর গর্জে উঠল ডাক্তার ম্যাককমনের কণ্ঠ। 'এসব বাজে কথায় কান দিয়ো না।'

'আপনি চুপ করুন তো!' চাপা ধমক দিলেন নাসিম।

'ওটা আমাদেরকে দেখছে,' ফিসফিস করে বলল টয়োডা।

মনে মনে প্রার্থনা শুরু করেছে মানামি, তার ফাঁকে বিড়বিড় করে বলল রেডিয়োতে, 'টয়োডা...'

জবাব দিল না তার ভাই। চুপ করে দেখছে বিশাল হাঙর। পেটের ভিতর সেঁধিয়ে যেতে চাইছে হাত-পা। অবশ অনুভূতি।

মাত্র একবার সুযোগ পাবে ওরা, বুঝে গেছে রানা। ট্রপিকাল স্তর পেরিয়ে উঠে যেতে হবে খোলা শীতল পানিতে। ওখানে আর পিছু নিতে পারবে না মেগালোডন। টের পেল, ক্যানিয়নের মেঝের তাপ লেগে তপ্ত হয়ে উঠছে সাব।

দরদর করে ঘামছে ও।

পুরুষ মেগালোডন আরও সরে এল। ধবধবে সাদা লাগছে। নীলচে-ধূসর চোখ দেখতে পেল রানা পরিষ্কার।

ঘুরল দানবটা, তারপর সোজা তেড়ে এল ওদের দিকে!

আঁধারে ভূতের মত ফ্যাকাসে আলো নিয়ে মস্ত হাঁ করেছে মেগালোডন। সারি সারি চোখা এবড়োখেবড়ো দাঁত।

চট্ করে সার্চলাইট জ্বেলে দিল রানা।

সাড়ে সাত হাজার ওয়াটের বাতি পড়েছে চির আঁধারে অভ্যস্ত মেগালোডনের চোখে।

সাঁৎ করে ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে নিল ওটা, ঝড়ের গতি তুলে হারিয়ে গেল দূরের আঁধারে।

রেডিয়োতে চেঁচিয়ে উঠল টয়োডা, 'শাবাশ, মিস্টার রানা! আলো দেখে পালিয়েছে ব্যাটা...'

পনেরো টন দানবের লেজের ঝাপটায় তৈরি প্রবল স্রোত এসে লাগল দুই সাবমারসিবলের গায়ে। চরকির মত ঘুরে গেল টয়োডার সাব। ওটাকে আটকে রেখেছে ইস্পাতের কেব্ল।

কিন্তু ক্যানিয়নের দেয়ালে গিয়ে জোর বাড়ি খেল রানার সাবের পিছন দিক। চুরমার হয়ে গেল প্রপেলার দুটো।

দুই অ্যাকুনটের পঞ্চাশ ফুট উপরে প্রচণ্ড বেগে চক্কর কাটছে মেগালোডন। তারপর হঠাৎ ডাইভ দিয়ে নেমে এল বিধ্বস্ত সাবের দিকে।

উল্টে গেছে রানার জলযান।

ক্যাপসুলের ভিতর থেকে ও দেখতে পেল, বিদ্যুদ্বেগে ওর দিকেই আসছে ফ্যাকাসে আলো।

সাদা স্নাউট উঁচু করল দানব, সামনে বাড়ল উপরের চোয়াল। বেরিয়ে এসেছে ক্ষুরের মত সাত ইঞ্চি লম্বা দাঁতগুলো!

আস্তে করে চোখ বুজে ফেলল রানা, কিচ্ছু করার নেই ওর।

মাত্র এক সেকেণ্ড কষ্ট হবে, হাজার হাজার পাউণ্ডের চাপ

পিষে ফেলবে ওর দেহটাকে— টেরও পাবে না, কীভাবে ভয়ঙ্কর ওই দাঁতগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে ওটা।

আবারও চোখ মেলল রানা।

শেষমুহূর্তে বাঁক নিল মেগালোডন। চরকির মত ঘুরে সাগরের মেঝে থেকে সরে গেল। শক্তিশালী লেজ তৈরি করেছে প্রবল স্রোত।

ছিটকে গেল রানার সাব। পরপর কয়েকটা ডিগবাজি দিয়ে থামল ক্যানিয়নের দেয়ালে আরেক ঠোকর খেয়ে। আবারও সিধে হয়েছে।

হার্নেস থেকে ছিটকে পড়েছে রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল, কপালে উষ্ণ কী যেন— আঠালো। হাত নিয়ে যেতে চাইল কপালে, কিন্তু পারল না, জ্ঞান হারাল।

ও দেখতে পেল না, অ্যাবিস গ্লাইডার-টুর ইঞ্জিন চালু করেছে টয়োডা, দেরি করেনি পূর্ণগতি তুলতে। খাড়া ভাবে উঠে যাচ্ছে প্রায় নব্বুই ডিগ্রি কোণ তৈরি করে।

ওপর থেকে আসছে একের পর এক প্রশ্ন, পাশ থেকে পানির জোরালো ঝাপটা। কোনওদিকে খেয়াল দিল না টয়োডা, যেন রেসিংকারের ড্রাইভার। কানের ভিতর দুপদুপ করছে রক্তের চাপ। জয়স্টিকের উপর স্থির রেখেছে হাত। জানে, কোনও ভুল করলে মরবে! রানার কী হলো এখন দেখার সময় নেই।

'টয়োডা!' শুনতে পেল ও। 'নোড়ো না, একদম না!'

ডক্টর নাসিম আহমেদের নির্দেশ কানে তুলল না ভীত যুবক, ঘাড় ফিরিয়ে খুঁজছে সাক্ষাৎ যমটাকে।

আবারও ক্যানিয়ন থেকে উঠে আসছে অ্যালবিনো দানব, রকেটের গতি তুলে। ভীষণ খেপেছে, পালাতে চেষ্টা করছে ওর শিকার!

টয়োডা আন্দাজ করল, সাদা দানবের চেয়ে বারো শ' ফুটের

মত এগিয়ে আছে সে, আর দু'তিন হাজার ফুট উঠলেই হিমশীতল পানি। তারপর ওকে আর ধরতে পারবে না ওটা।

কালো জ্বালামুখের কাছে পৌঁছে গেল টয়োডা। ধূসর হয়ে উঠেছে পানি। কোথাও নেই মেগালোডন।

সাবের বাইরের তাপমাত্রা চেক করল ও।

বাহান্ন ডিগ্রি।

ক্রমেই কমছে তাপ।

আমি উঠে যেতে পারব, স্বস্তি নিয়ে ভাবল টয়োডা। মনে মনে ভাবল, রানার কী হলো! কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাকে।

ঠিক তখনই চোখের কোণে সাদা কী যেন দেখল।

তিন সেকেণ্ড পর একপাশ থেকে সাবের উপর হামলে পড়ল মেগালোডন।

যেন দ্রুতগামী রেলইঞ্জিন, গুঁতো দিয়েছে বেবি অস্টিন গাড়িকে।

উল্টে গিয়ে চরকির মত ঘুরতে লাগল অ্যাবিস গ্লাইডার-টু।

নিভে গেছে ভিতরের সব বাতি।

ভীষণ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল টয়োডা।

তখনই শুনল, মুড়মুড় করে ভাঙছে সেরামিক ও লেক্সান।

'বাঁ... বাঁচাও!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল টয়োডা, সশব্দে ফোঁপাচ্ছে।

এক সেকেণ্ড পর বিপুল পানির ভয়ঙ্কর চাপ চিঁড়ের মত চ্যাপ্টা করে দিল ওর দেহ, ফেটে গেল মাথা।

উষ্ণ রক্তের ঘ্রাণ পেয়েছে মেগালোডন, তীব্র আনন্দে শিউরে উঠল তার সেনসরি সিস্টেম। সংকীর্ণ চেম্বারে গুঁজে দিতে চাইল স্নাউট, কিন্তু একটু দূরে রয়ে গেল টয়োডার লাশ।

বিধ্বস্ত সাব চোয়ালে নিয়ে আবারও ট্রপিকাল স্রোতের দিকে নামতে শুরু করেছে মেগালোডন।

নিকষ কালো আঁধারে জ্ঞান ফিরল রানার।

কোথাও কোনও আওয়াজ নেই, থমথম করছে চারপাশ।

পায়ের টনটনে ব্যথা সচেতন করে তুলল ওকে।

কীসে যেন চাপ খেয়ে আছে পা।

সাবধানে পা টেনে নিল রানা।

উষ্ণ কী যেন পড়ল চোখে। মুছতে গিয়ে টের পেল, ওটা রক্তের ফোঁটা। চোখের সামনে হাত নিল, কিন্তু কিছুই দেখল না।

কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম? ভাবল ও।

সব ধরনের পাওয়ার অফ করা।

আগুনের মত গরম হয়ে উঠেছে সাবের ভিতর অংশ।

সাগরের একেবারে তলদেশ, ভাবল রানা।

অন্ধের মত কণ্ট্রোলগুলোর দিকে হাত বাড়াল। টের পেল, কখন যেন পড়ে গেছে পাইলটের হার্নেস থেকে।

ও আছে ক্যাপসুলের আরেক প্রান্তে।

হামাগুড়ি দিয়ে ককপিটে ফিরল রানা। কণ্ট্রোল প্যানেল ছুঁয়ে টিপে দিল পাওয়ার সুইচ।

কিছুই হলো না।

সাগরের সাত মাইল নীচে বিকল হয়ে গেছে ওর অ্যাবিস গ্লাইডার-টু।

সাবের নোজ কোন্ দিয়ে উঁকি দিল রানা। আবছা আলো আসছে বাইরে থেকে। ঘাড় ঘুরিয়ে উপরে চাইল।

ওই যে মেগালোডন!

পানি কেটে নেমে আসছে নীচে।

মস্ত চোয়ালে শিকার।

এখনও টয়োডার সাবের সঙ্গে রয়ে গেছে স্টিলের কেবল, ঢিল পড়েছে বলে পেঁচাতে শুরু করেছে মেগালোডনের বুকে।

চেয়ারে বরফের মূর্তির মত জমে গেছে ডাক্তার ফিল ম্যাককমন। কয়েক মুহূর্ত পর ফাঁকা মনিটরের দিকে আঙুল তাক করল সে, 'আমাদের জানতে হবে নীচে কী হচ্ছে!'

নীরব হয়ে গেছেন নাসিম। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। দোষ দিয়ে চলেছেন নিজেকে।

নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছেন তিনি রানাকে।

রেডিয়োতে বারবার বলছে মানামি: 'টয়োডা? শুনতে পাচ্ছ? ...টয়োডা?'

ইণ্টারকমে ক্যাপ্টেন ব্র্যার্ডসেনের সঙ্গে আলাপ করছে হ্যারল্ড ডেভিড। ক্রুরা পৌঁছে গেছে স্টার্নে, চালু করা হয়েছে বড় উইঞ্চ।

'ডাক্তার ম্যাককমন, রিকি জানিয়েছে স্টিলের কেবল নড়ছে, টয়োডার সাব এখনও ওটার সঙ্গেই আছে।'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল ম্যাককমন, চলে গেল টিভি মনিটরের সামনে। পিছনের ডেকে দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড উইঞ্চ। 'মারা যাওয়ার আগেই ওকে টেনে তুলতে হবে। যদি পাওয়ার হারিয়ে থাকে, আমরাই এখন ওর একমাত্র ভরসা।'

মুখ কালো করে বসে আছেন নাসিম। মনের চোখে দেখছেন হাস্যরত রানার মুখ। আর চকচকে দুটি বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

'রানার কী হবে?' জানতে চাইল মানামি।

'তাকে তুলে আনার উপায় নেই আমাদের,' বলল হ্যারল্ড। 'কিন্তু তোমার ভাইকে হয়তো বাঁচাতে পারব।'

কন্সোলের দিকে ঝুঁকে গেল ম্যাককমন। মাইকে বলল, 'রিকি, তুমি কি ওখানে?'

স্পিকারে গমগম করে উঠল ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ, 'আমরা কি তুলতে শুরু করব?'

'হ্যাঁ, এখুনি।'

মেগালোডনটাকে মাথার উপর দিয়ে ভেসে যেতে দেখল রানা। বারবার মুখ হাঁ করছে ওটা, ফলে থরথর করে কাঁপছে পেটের পেশি। খুব আগ্রহ নিয়ে ভাঙা সাবে ভরতে চাইছে স্নাউট। খেয়াল নেই বুকে আরও পেঁচিয়ে যাচ্ছে স্টিলের কেবল।

দানবের পিছনের সাগরে চোখ গেল রানার।

ওখানে ছায়ার মত সরে গেল আরেকটা কী যেন।

টানটান হয়ে উঠছে ঢিলা কেব্‌ল, কয়েক সেকেণ্ড পর মেগালোডনের সাদা দেহ পেঁচিয়ে টেনে তোলা শুরু হলো। চাপ পড়ে ছিঁড়ে গেল মেগা হাঙরের বুকের পাশের ফিনগুলো।

চারপাশ থেকে মেগালোডনকে আঁকড়ে ধরেছে কেব্‌ল, খিঁচুনি শুরু হলো ওটার মাংসপেশিতে। ভয়ঙ্কর রেগে গিয়ে বন করে ঘুরল, দ্রুতগতিতে চালাল লেজ। বুঝে গেছে, বাঁচতে চাইলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে। কিন্তু যতই ঝাপ্টা-ঝাপ্টি করছে, ততই আরও জড়িয়ে যাচ্ছে কেবলের ফাঁদে।

হতবাক হয়ে দেখছে রানা।

খেপে গেছে মেগালোডন, কিন্তু স্টিলের ভারী কেবল ছিঁড়বার সাধ্য তার নেই। বুকের দু'পাশের ফিন আটকা পড়েছে, ভাসিয়ে রাখতে পারছে না নিজেকে। বারবার এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে দানব। ক্যানিয়নের দেয়ালে তৈরি হচ্ছে জোরালো স্রোত। প্রচণ্ড পরিশ্রম করছে বলে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে।

কয়েক মিনিট ঝট্‌কা-ঝট্‌কি করার পর কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিল শিকারি মাছ, চুপ করে রইল। জড়িয়ে যাওয়া কেবলের ভিতর থাকল শুধু মাঝে মাঝে ওটার গিলের কম্পন।

ধীরে ধীরে কেব্‌ল টেনে তুলছে নিতু। ওই কেবলের টান খেয়ে শীতল পানির দিকে রওনা হয়ে গেল মেগালোডন।

মাঝে মাঝে ঝট্‌কা দিচ্ছে, মরতে চলেছে পানির ভিতর শ্বাস আটকে। ওটার লেজের তৈরি স্রোত লাগছে এসে ক্যানিয়নের ভিতর।

ক' মুহূর্ত পর হঠাৎ কোথা থেকে এল আরেকটা মৃত্যুশীতল আলো। যেন মস্ত কোনও চাঁদ। ভেসে চলেছে মাথার উপর দিয়ে। উঁচু টেইল ফিন দেখল রানা। প্রথমে ওর মনে হলো ওটা কোনও সাবমেরিন।

এক সেকেণ্ড পর শ্বাস আটকে ফেলল রানা।

আগের মেগালোডনের চেয়ে কমপক্ষে বিশফুট বেশি লম্বা এটা, মাদি মেগালোডন। ওজন বিশ বা পঁচিশ টন। আস্তে করে নাড়ছে লেজ। আর সেই ধাক্কা এসে লাগছে রানার বিধ্বস্ত সাবে। নালার ভিতর থেকে ভেসে উঠল ওর অ্যাবিস গ্লাইডার-টু, আবারও নেমে গেল মেঝেতে। সরসর করে সরে গিয়ে গুঁতো দিল ক্যানিয়নের দেয়ালে। দু'বার ডিগবাজি দিয়ে থামল। মেঝে থেকে ভেসে উঠেছে কাদা ও বালি। জানালার ওপাশ থেকে উঁকি দিল রানা। ধীরে ধীরে আবারও মেঝেতে নামছে কাদা-বালি। স্ত্রী মেগাটাকে দেখতে পেল রানা, হতক্লান্ত পুরুষের দিকে উঠছে। মনে হলো, স্বামীর বিপদে সাহায্য করতে চলেছে।

এক শ' ফুট দূরে পৌঁছে থামল একটু, তারপর হঠাৎ করেই গতি তুলল মিসাইলের মত। মস্ত হাঁ করেছে, দেখতে না দেখতে পৌঁছে গেল প্রিয় সঙ্গীর কাছে, দাঁত বসিয়ে দিল ওটার নরম তলপেটে। সেই ধাক্কা খেয়ে কমপক্ষে পঞ্চাশ ফুট উপরে ছিটকে উঠল পুরুষ মেগালোডন।

নয় ইঞ্চি দাঁতগুলো দিয়ে খুবলে তুলে স্বামীর পেটের মাংস চিবাচ্ছে স্ত্রী। পরিষ্কার দেখা গেল পুরুষ মেগালোডনের ধুপপুক করা হৃৎপিণ্ড ও কাঁপতে থাকা পাকস্থলী। মস্ত ক্ষত থেকে গলগল করে বেরুতে শুরু করেছে রক্ত।

মাঝের ঢিলা কেবল টেনে নিল নিতুর উইঞ্চ। কেবলের সঙ্গে উঠছে পুরুষ মেগালোডন। অনুসরণ করল স্ত্রী মেগা, সঙ্গীর প্লেট থেকে কামড়ে নিল পাকস্থলী ও নাড়িভুঁড়ির বড় একটা অংশ।

উপরে ফ্যাকাসে আলো দেখছে রানা।

মৃত সঙ্গীর সঙ্গে উঠে যাচ্ছে স্ত্রী মেগা। বুক-পেটে গুঁজে দিয়েছে স্নাউট। খেতে খেতে চলেছে। একেক কামড়ে সঙ্গীর সাদা পেটের মস্ত সব অংশ উধাও হচ্ছে ওর নিজের পেটে।

মাদিটা পোয়াতি, যে-কোনও দিন প্রসব করবে। পাগল করে রেখেছে তাকে জন্মের খিদে। এখন আর কিছুতেই সরবে না খাবার থেকে। যেখানে কখনও যায়নি, সেই বরফ-ঠাণ্ডা পানিরও তোয়াক্কা করবে না। খুব কষ্টও হচ্ছে না, ভয়ঙ্কর চোয়াল ভরে দিয়েছে সঙ্গীর পেটে। গপগপ করে গিলছে মাংস। ওর নিজের শরীরকে ঘিরে রেখেছে পুরুষ মেগালোডনের শত শত গ্যালন উষ্ণ রক্ত, রক্ষা করছে ওটাকে অসহ্য শীত থেকে। ক্রমেই উপর থেকে আরও উপরে উঠছে স্ত্রী মেগা।

সাগরের তলদেশ থেকে চেয়ে রইল রানা। অনেক উপরে সাদা ম্লান আলো। বুঝতে দেরি হলো না, হিম-ঠাণ্ডার ভিতর দিয়ে উপরে চলেছে ক্ষুধার্ত মেগালোডন।

মুখ সরিয়ে এদিক ওদিক চাইল রানা। কী যেন চেপে আসতে চাইছে বুকে। আঁধার ক্যানিয়নে একা ও। পুরো সাত মাইল উপরে বাতাস, খোলা আকাশ, সূর্য, চেনা অনেকে।

আর দেখা হবে না কারও সঙ্গে!

নিতুর ডেকে বেরিয়ে এসেছে মানামি, ডাক্তার ফিল ম্যাককমন ও ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড। স্টার্নে হাজির হয়েছে জাহাজের মেডিকেল টিম। এ ছাড়া রেলিং ধরে সাগরের দিকে চেয়ে আছে কমপক্ষে আট-দশজন ক্রু।

সবাই আশা করছে, এখন যে-কোনও সময়ে ভেসে উঠবে অ্যাকুনটরা।

উইঞ্চের স্টিলের ফ্রেমের ও-রিং থেকে ঝুলছে পুলি, ওদিকে চেয়ে আছে ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন। নীচের মালের ওজন নিতে গিয়ে কোঁকাতে শুরু করেছে পুলি, যে-কোনও সময়ে খটাং করে ভেঙে পড়তে পারে।

'টয়োডার সাবের সঙ্গে কী আসছে, জানি না,' গম্ভীর সুরে বলল ক্যাপ্টেন। 'কিন্তু ওটা অনেক বেশি ভারী।'

দেরি করলে অক্সিজেনের অভাবে দম আটকে মরতে হবে, পরিষ্কার বুঝছে রানা। সাবের ডানা দুমড়ে গেছে প্রথম ধাক্কায়। তার উপর নষ্ট হয়েছে ইঞ্জিন। খসে পড়েছে প্রপেলার। এ জিনিস নিয়ে উঠতে পারবে না। এবার ইমার্জেন্সি লিভার ব্যবহার করতে হবে। সাব থেকে ছাড়িয়ে নিতে হবে লেক্সান এসকেপ পড।

দরদর করে ঘামছে রানা, ঝিমঝিম করছে মাথা। রক্তক্ষরণের জন্য এমন হচ্ছে কি না, জানে না। অক্সিজেনের অভাবেও হতে পারে। পেটের নীচে স্টোরেজ কমপার্টমেণ্ট হাতড়াতে শুরু করে টেনে খুলল হ্যাচ।

এখানেই থাকার কথা বাড়তি অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক।

কোথায় ওটা?

কয়েক সেকেণ্ড পর পেয়ে গেল রানা।

খুলে দিল ট্যাঙ্কের ভালভ।

পডের ভিতর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল।

ককপিটের হার্নেসের স্ট্র্যাপ আটকে নিল রানা। ডানে হাত বাড়িয়ে পেয়ে গেল ধাতব বাক্স। ল্যাচ খুলে ঢাকনি সরিয়ে দিল। খপ্ করে ধরল ইমার্জেন্সি লিভার। নিজেকে মানসিক ভাবে তৈরি করে নিয়ে টান দিল হ্যাণ্ডেল ধরে।

পিছনে ঝিকিয়ে উঠল অত্যুজ্জ্বল আলো, চিরে দিল চারপাশের ঘন আঁধারকে। মনে হলো কে যেন হার্নেসের সঙ্গে চেপে ধরেছে ওকে। প্রায় বিস্ফোরণের মত করে সাবের ভারী অংশ ছেড়ে পানির ভিতর বেরুল ক্যাপসুল। ক্যানিয়নের মেঝে থেকে ছিটকে রওনা হয়েছে। ভারসাম্যের জন্য পডের রয়েছে খাটো দুটো ডানা, মুচড়ে গেছে বিস্ফোরণের কারণে, ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকে চলেছে পড, সেই সঙ্গে রওনা হয়ে গেছে উপরে।

কাঁচের মত পরিষ্কার ক্যাপসুল বেশ গতি তুলে উঠছে। কয়েক ঘণ্টা লাগবে সাগর-সমতলে উঠতে। ঘামে ভিজে জবজব করছে পোশাক, ক্রমেই বাড়ছে তাপমাত্রা। রানা জানে, একটু পর শুরু হবে প্রচণ্ড হিমশীত।

প্রশান্ত মহাসাগরের পান্না-সবুজ জলে মস্ত বুদ্বুদের সঙ্গে উঠে এল উজ্জ্বল লাল ফেনা, এক সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল বিশাল এক সাদা মাথা। উঠে আসছে পুরুষ মেগালোডন। ইস্পাতের বাঁধনের নীচে ছেঁড়া ছেঁড়া লালচে মাংসপেশি— দীর্ঘ মেরুদণ্ডের চারপাশ থেকে খুবলে তুলে নেয়া হয়েছে মাংস।

হতবাক হয়ে গেছে জাহাজের সবাই।

এই দানব হাঙরকে বেকায়দায় পেয়ে খেয়েছে কারা যেন!

উইঞ্চের টান খেয়ে চওড়া ডেকে উঠে এল মৃত মেগালোডন। মুখে এখনও টয়োডা সিনোসুকার সাবমারসিবল।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মানামি, চেয়ে রইল শূন্য চোখে। যেন বুঝতে পারছে না কত বড় ক্ষতি হয়ে গেছে।

ঘুটঘুটে আঁধারে গত দু'ঘণ্টা ধরে অবিরাম উঠছে পড। রক্তক্ষরণ ও ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা প্রায় অচেতন করে দিয়েছে রানাকে। এখন আর কোনও সাড়া নেই হাত-পায়ে। চুপ করে চেয়ে আছে কুচকুচে

কালো পানির দিকে। মনে এখনও আশা, উপরে দেখতে পাবে মৃদু আলো।

ও যেন জেদ করেছে, কিছুতেই জ্ঞান হারাবে না।

সবুজ সাগরের দিকে চেয়ে আছে ডাক্তার ফিল ম্যাককমন, চোখ থেকে নামিয়ে ফেলল বিনকিউলার, খালি চোখে চাইল চারপাশে। ব্রিজের উপর থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ছে যোডিয়াক সার্চ বোটগুলো, ফ্রিগেট নিতু থেকে সিকি মাইল দূরে ছড়িয়ে গেছে।

ডাক্তার ম্যাককমনের পাশে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে হ্যারল্ড ডেভিড। চাপা শ্বাস ফেলল, 'বোধহয় নেভির চপার ডাকা উচিত ছিল।'

'বড় দেরি হয়ে গেছে। আগামী দশ মিনিটের ভিতর উঠে না এলে...' কথাটা শেষ করল না ম্যাককমন।

দু'জনই জানে, মেগালোডনের আক্রমণে মাসুদ রানা খুন না হয়ে থাকলে, মারা পড়বে সাগরের নীচের ভয়ঙ্কর শীতে।

শতবারের মত প্রকাণ্ড সাদা মাথাটার দিকে চাইল ম্যাককমন।

ওখানে ডেকে সায়েন্স টিম পরীক্ষা করছে মেগা হাঙরের লাশ। তাদের সঙ্গেই আছেন ডক্টর নাসিম আহমেদ, কোনও কথাই বলছেন না। আমসির মত শুকিয়ে গেছে মুখ। সায়েন্স টিমের একজন ছবি তুলছে মৃত মেগালোডনের।

'ওটা যদি... টয়োডাকে শেষ করে... তা হলে ওটাকে শেষ করল কে?' বেসুরো কণ্ঠে বলল ডাক্তার।

রক্তাক্ত মাথার দিকে চাইল হ্যারল্ড। 'জানি না। কিন্তু এটা জানি, ওটা ভূমিধসে মরেনি।'

অশান্ত সাগরে দুলছে হলদে যোডিয়াক। বো-তে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে মানামি সিনোসুকা। অন্য অ্যাবিস গ্লাইডার-টুর পড

খুঁজছে ওর দুই চোখ। মাসুদ রানার পড না পাওয়া পর্যন্ত নিজের অন্তরের কষ্ট ও ব্যথা নিয়ে ভাবারও উপায় নেই। সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই খুঁজে পেতে হবে ওই পড।

বোটের পিছনে ইঞ্জিনের গতি কমিয়ে দিয়েছে ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন। বিক্ষুব্ধ হাওয়ার শোঁ-শোঁ শব্দের উপর দিয়ে জানাল, 'আবারও পুরো একটা চক্কর দিয়ে আসি।'

'একটু অপেক্ষা করুন!' ঢেউয়ের ভিতর কী যেন দেখেছে মানামি। জিনিসটা স্টারবোর্ড বো থেকে একটু দূরে। 'ওদিকে চলুন।'

মস্ত এক ঢেউয়ে উপর দেখা গেল লাল ভিনাইল পতাকা।

যোডিয়াক নিয়ে ওদিকে রওনা হয়ে গেল ক্যাপ্টেন, কিছুক্ষণ পর নেমে আসা ঢেউয়ে চেপে পৌঁছে গেল ক্যাপসুলের খুব কাছে। স্বচ্ছ লেক্সান এসকেপ পডের ভিতর পরিষ্কার দেখা গেল রানার দেহ।

'এখনও বেঁচে আছে?' বো-তে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল ব্র্যাডসেন।

ঝুঁকে ভাল করে দেখল মানামি। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, বেঁচে আছে।'

এগারো

ডাক্তার ফিল ম্যাককমন বুঝছে না, কীভাবে এত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। বারো ঘণ্টা লেগেছে গুয়ামের অরা হার্বার নেভাল বেসে ফ্রিগেট নিতু পৌঁছুতে।

ডকে হাজির হয়েছে দুটো জাপানি টেলিভিশন কোম্পানির ক্রুরা। একটি স্থানীয় টিভিও হাজির। এ ছাড়া রয়েছে খবরের কাগজের সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররা। নেভি থেকেও এসেছে ক'জন, নেভির গুয়াম টাইমস পত্রিকায় লেখা ও ছবি প্রকাশ করবে।

ম্যাককমন জাহাজ থেকে নামতেই তাকে ঘিরে ধরেছে সবাই। একের পর এক প্রশ্ন আসছে দানব হাঙর সম্পর্কে। জানতে চাইছে সবাই, কী করে মারা গেল সাবমারসিবল পাইলট টয়োডা সিনোসুকা। সবার জানা শেষ, জাহাজ থেকে কপ্টারে তুলে চিকিৎসার জন্য সরিয়ে নেয়া হয়েছে দ্বিতীয় সাবমারসিবলের পাইলট মাসুদ রানাকে।

'প্রফেসর নাসিম আহমেদ কোথায়?' জানতে চাইল এক সাংবাদিক। 'এখন তো প্রমাণ হয়ে গেছে, তাঁর কথাই ঠিক। সাগরের গভীরে এখনও রয়ে গেছে কারকারোডন মেগালোডন!'

'জীবিত পাইলটের কী অবস্থা?'

'তাঁর নাকি কংকাশন হয়েছে? হাইপোথারমিয়া আর রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে?'

'সুস্থ হয়ে উঠবে সে,' বলল ফিল ম্যাককমন।

তার ছবি তুলতে শুরু করেছে ফটোগ্রাফাররা। কিন্তু তা পাঁচ সেকেণ্ডের জন্য। ক্রেনে করে উঁচু করা হয়েছে মেগালোডনের প্রকাণ্ড লাশ। ম্যাককমনকে ফেলে হাঙরের ছবি তুলতে ছুট দিল ফটোগ্রাফাররা সবাই।

এ সুযোগে তরুণী এক জাপানিজ মেয়ে মাইক্রোফোন তুলে ধরল ম্যাককমনের নাকের কাছে। 'আপনারা কোথায় সরিয়ে নেবেন ওই হাঙর?'

'যত দ্রুত সম্ভব সিনোসুকা ইন্সটিটিউটে।'

'ওটার শরীরের এই অবস্থা কেন?'

'এখনও জানি না আমরা। এমন হতে পারে পেঁচিয়ে যাওয়া কেবলের কারণে ছিঁড়ে পড়েছে।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ কামড়ে তুলে নিয়ে গেছে,' ঝোপের মত ভুরুওয়ালা এক টাকমাথা আমেরিকান বলল। 'এমন কি হতে পারে, এটাকে আক্রমণ করেছিল আরেকটা হাঙর?'

'হতে পারে, কিন্তু...'

'আপনি কি বলতে চান সাগরে ওই ধরনের হাঙর আরও আছে?'

'কেউ কি কখনও দেখেছে...' শুরু করেছিল ডাক্তার ম্যাককমন। থামতে হলো তাকে।

'এখন তো পরিষ্কার দেখছি আমরা।'

মাথার উপর হাত তুলল ম্যাককমন। 'প্লিয! প্লিয, আপনারা এক এক করে প্রশ্ন করুন।' গুয়ামের খবরের কাগজের মোটা সাংবাদিকের দিকে মাথার ইশারা করল সে। লোকটা আকাশে কলম তুলেছে।

'আমি আসলে জানতে চাই, এখন কি সাগরে নামা নিরাপদ?'

ডাক্তার ফিল ম্যাককমন আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, 'আমি শুধু বলব,. আপনাদের চিন্তার কোনোই কারণ নেই। যদি ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে এমন আরও হাঙর থাকে, তারা আটকা পড়েছে প্রায় বরফ-ঠাণ্ডা পানির নীচে। ট্রপিকাল স্রোত ছেড়ে উঠে আসতে পারবে না। মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে আটকা পড়েছে। আরও বহু মিলিয়ন বছর ওখানেই থাকতে হবে।'

'ডক্টর ম্যাককমন?'

ঘুরে চাইল ডাক্তার। পাশে এসে থেমেছে সাংবাদিক ডন রে। নিরীহ সুরে জানতে চাইল সে, 'বলুন তো ডক্টর, প্রফেসর আহমেদ নাকি মেরিন প্যালিয়োনটোলজিস্ট?'

নাক কুঁচকে ফেলল ম্যাককমন। পরক্ষণে চট্ করে দেখে নিল

সাংবাদিকদের। 'হ্যাঁ, উনি ওই বিষয়ে কিছু কাজ করেছেন, কিন্তু...'

'আরও কিছু কাজ করেছেন; তাই নয়? আমি তো শুনেছি তিনি ডায়নোসর হাঙর নিয়ে লেকচার দেন। ওগুলোর নাম বোধহয় কারকারোডন মেগালোডন?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। পরে নিজেই উনি আপনাদেরকে বলবেন ওই বিষয়ে। এবার দয়া করে...'

'ওই ক্রেনের ওটা কি একটা...'

'আপাতত আমাকে মাফ করতে হবে, অনেক কাজ পড়ে আছে,' ভিড় ঠেলে ভাগতে চাইল ম্যাককমন।

চারপাশ থেকে বোমার মত এসে পড়ছে একেকটা প্রশ্ন।

পিছনে গর্জে উঠল কে যেন, 'গ্যাংওয়ে!'

ডকে মেগালোডন নামাবার কাজ শুরু করেছে ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেন।

কয়েকজনকে ঠেলে সামনে বাড়ল এক ফটোগ্রাফার।

'ক্যাপ্টেন, আমি কি দানবের সঙ্গে আপনার একটা ছবি তুলতে পারি?'

ক্রেন অপারেটরের দিকে ইশারা করল ব্র্যাডসেন।

উঠে এসেছে মেগালোডনের মাথা, ডেকের উপর ঝাড়ু দিচ্ছে রক্তাক্ত মেরুদণ্ড ও বুকের দুপাশের ফিন। আকাশের দিকে মস্ত হাঁ করে আছে মুখ। আরও ভাল অ্যাংগেল পাওয়ার জন্য বাঁদরের মত এক লাফে সরে গেল ফটোগ্রাফার। কিন্তু ওই লাশ এতই বড়, ক্যামেরার ফ্রেমে আঁটল না। মুসকো ব্র্যাডসেনকে ছোট্ট বাচ্চার মত দেখাল প্রকাণ্ড দানবের পাশে।

'হাসুন, ক্যাপ্টেন!' কে যেন চেঁচিয়ে উঠল।

ভীষণ গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর করে বলল ব্র্যাডসেন, 'হাসির কী আছে?'

ঝাঁঝালো রোদে আরাম করে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে অ্যানি আহমেদ, পাশে ইয়টের টিকউড ডেকে ব্রা খুলে রাখা, সারাদেহে চকচক করছে দামি তেল। ভাল করে ট্যান করে নিচ্ছে।

'তুমি সবসময় বলো ক্যামেরার চোখে ট্যান খুব সুন্দর লাগে,' বলল ম্যাক্স ডোনোভান। সুইম ট্রাঙ্ক পরে থেমেছে অ্যানির পাশে। পিছনে সূর্য থাকায় ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না।

কপালে হাত রেখে উপরে চাইল অ্যানি। মিষ্টি করে হাসল, 'এই ট্যান শুধু তোমার জন্য, ডার্লিং।' চিত হলো সে। চোখদুটো দামি, ছোট্ট টেলিভিশনের পর্দায়। 'এবার সোনা, আমার জন্য আরেকটা ড্রিঙ্ক নিয়ে এসো।'

'যো হুকুম, মহারানি,' লোভনীয় শরীর থেকে চোখ সরাল ম্যাক্স। 'তুমি যা বলবে তাই করব।' ভদকা ও টনিকের মিক্স করবার জন্য ইয়ট লাভ অ্যাট সি'র কেবিনের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

কিন্তু মাত্র একমিনিট পর চেঁচিয়ে উঠল অ্যানি।

ড্রিঙ্ক ফেলে দৌড়ে আসতে শুরু করেছে ম্যাক্স।

উঠে বসেছে অ্যানি, খপ্ করে তোয়ালে তুলে নিয়ে ঢাকল ব্রোঞ্জের মত রুপালি উদ্ধত স্তন। আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল টিভি।

'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'কী হলো?' হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ম্যাক্স।

টিভিতে দেখতে পেল ছোট পর্দা জুড়ে অসংখ্য দাঁত আর ভয়ঙ্কর এক চোয়াল। যে মাছই হোক, ঝুলছে জাহাজের ক্রেন থেকে।

'...সন্দেহ নেই এটা প্রাগৈতিহাসিক হাঙর, নাম কারকারোডন মেগালোডন। ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক শ্বেত-হাঙর। কেউ কল্পনা করেনি সাগরের সাত মাইল নীচে ওটা আজও টিকে আছে। ডক্টর

আহমেদ জানতেন। তিনি হয়তো ওটার বিষয়ে তথ্য দিতে পারবেন। কিন্তু আপাতত তিনি আছেন নেভাল হসপিটালে তাঁর এক ভাইয়ের পাশে। এক সাবমারসিবল দুর্ঘটনায় তাঁর ভাই আহত। ওখানে কাউকে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। আমরা পরে এ বিষয়ে কথা বলব ডক্টর আহমেদের সঙ্গে। ...এবার, বাণিজ্য সংবাদঃ আজ মহাচিনে ব্যবসায়ীক...'

আর দেরি করল না অ্যানি, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর ছুট দিল পাইলট হাউস লক্ষ্য করে।

'কোথায় চললে?' পিছন থেকে জানতে চাইল ডোনোভান।

'অফিসে কথা বলতে হবে,' দূর থেকে ভেসে এল অ্যানির কণ্ঠ। গিয়ে ঢুকেছে পাইলট হাউসে। 'ফোন কই!' স্তন সামলাবার ফাঁকে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করল।

একপাশের ফোন দেখিয়ে দিল লোকটা। কয়েক পলক দেখল অ্যানির চকচকে পিঠ।

অফিসে ফোন করবার জন্য ডায়াল করতে শুরু করেছে অ্যানি। তেরো সেকেণ্ড পর ওর সেক্রেটারি জানাল, সারা সকাল ধরে অ্যানির সঙ্গে কথা বলতে চাইছে ডন রে। নাম্বারগুলো টুকে নিল অ্যানি, তারপর ওভারসি কোড ব্যবহার করে ডায়াল করল গুয়ামে।

কয়েক সেকেণ্ড পর টের পেল রিং শুরু হয়েছে।

'ডন রে বলছি।'

'ডন, ওখানে কী ঘটছে?'

'অ্যানি? সারা সকাল থেকে তোমাকে... কোথায় ছিলে?'

'ওসব আমার ব্যাপার। কী ঘটছে ওখানে? কোত্থেকে এল ওই হাঙর? নাসিম কোথায়? ওর সঙ্গে কেউ কথা বলেছে?'

'আস্তে, আস্তে, অ্যানি! তোমার মনে আছে নাসিমের এক ভাই গিয়েছিল ওকে অনুষ্ঠান থেকে সরিয়ে নিতে? সে পানির নীচে

দুর্ঘটনায় পড়েছে। এখন আছে নেভাল হসপিটালে। সঙ্গে নাসিম। কারও সঙ্গে কথা বলেনি। অ্যানি, সত্যিই আছে ওই দানব হাঙর। ভুল ভেবেছিলে তোমার স্বামীকে। এখন প্রমাণ হয়ে গেছে ওই জিনিস ষাট ফুট লম্বা হতে পারে!'

অসুস্থ বোধ করছে অ্যানি।

'অ্যানি, লাইনে আছ?'

'এটা হতে পারে দশ বছরের সেরা কাহিনি,' ফিসফিস করে বলল অ্যানি। 'আর নাসিম খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করছে। আমি বাদ পড়ে গেছি সব থেকে!'

'কথা ঠিক,' বলল ডন রে। 'কিন্তু তুমি নাসিমের বউ, এটাও তো ঠিক। সে হয়তো তোমাকে বলতে পারবে আরও একটা হাঙরের কথা।'

একবার হৃৎস্পন্দন থেমে গিয়েও আবার চালু হলো অ্যানির। 'ওরকম আরও হাঙর আছে?'

'সিনোসুকার ছেলেকে যে হাঙর খেয়ে নিয়েছে, তাকে আবার খেয়ে ফেলেছে আরও একটা। এখন এসব নিয়েই আলাপ করছে সবাই। সিনোসুকা ইন্সটিটিউটের কেউ মুখ খুলছে না। তোমার স্বামী নাসিম আহমেদ হয়তো তোমাকে সব খুলে বলবে।'

ঝড়ের গতিতে ভাবতে শুরু করেছে অ্যানি। 'ঠিক আছে, আমি গুয়ামে আসছি। কিন্তু সমস্ত খবর জোগাড় করার চেষ্টা করো তুমি। প্রথম কাজ: জানতে হবে কর্তৃপক্ষ কীভাবে ঠেকাবে অন্য হাঙরটাকে।'

'কেউ এখনও জানে না ওটা উঠে এসেছে কি না। ফ্রিগেট নিতুর ক্রুরা শপথ করে বলছে, ওই ট্রেঞ্চ থেকে অন্য কোনও হাঙর ওঠেনি। ওরা নাকি আটকা পড়েছে অনেক নীচে।'

ব্যস্ত হয়ে বলল অ্যানি, 'আমি যা বলছি করো। ভেতরের খবর বের করতে পারলে বাড়তি দশ হাজার ডলার দেব। তোমার

জানতে হবে অপর হাঙরটা উঠে এসেছে কি না। গুয়ামে নেমেই তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

'তুমিই বস্, ঠিক আছে।'

ফোন রেখে দিল অ্যানি।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ম্যাক্স ডোনোভান। 'কী হচ্ছে আসলে, অ্যানি?' জানতে চাইল।

'এখন তোমার সাহায্য খুব দরকার, ম্যাক্স। গুয়ামে কাউকে চেনো তুমি?'

অরা নেভাল হাসপাতালে মাসুদ রানার ঘরের বাইরে পাহারা দিচ্ছে নেভির এক এমপি। একটু আগে রোগীর ভাই বিদায় নিয়েছে। এখন কারও আসবার কথা নয়। আগেই ভাগিয়ে দেয়া হয়েছে সাংবাদিকদের। কিন্তু করিডোর ধরে এগিয়ে আসছে এখন সুন্দরী এক জাপানি মেয়ে।

'সরি, ম্যাম, প্রেসের কাউকে ঢুকতে দেব না আমরা,' বলল তরুণ সৈনিক।

'আমি সাংবাদিক নই।'

সন্দেহ নিয়ে মেয়েটার দিকে চাইল সৈনিক। 'আপনি তো মনে হয় রোগীর আত্মীয়ও নন?'

'আমার নাম মান্যমি সিনোসুকা। ওই জাহাজে মিস্টার রানার পাশে...'

'ও... এক্সকিউয মি,' চিনতে পেরে দরজা থেকে সরে গেল সৈনিক। 'কিছু মনে নেবেন না, ম্যাম। ...আমি দুঃখিত যে আপনার ভাই...' চোখ সরিয়ে নিল সে।

'ধন্যবাদ,' অস্পষ্ট স্বরে বলল মানামি।

পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল।

জানালার পাশে চোখ বুজে শুয়ে আছে রানা, কপাল জুড়ে গজ

ব্যাণ্ডেজ। খুব ক্লান্ত লাগছে ওকে দেখতে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

'আমি দুঃখিত...' দুর্বল স্বরে বলল রানা। এইমাত্র চোখ মেলে দেখেছে মানামিকে। আশ্চর্য হয়ে গেছে মেয়েটির পরিবর্তন দেখে। মনে হচ্ছে, যেন সেই মানামিই নয়।

নীরবে মাথা দোলাল মেয়েটা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'আমি খুশি যে তুমি ফিরতে পেরেছ।'

রানার বেডের পাশে থামল মানামি। চোখে দুশ্চিন্তা।

'তোমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ... আগামীকাল পৌঁছুবেন।'

সরাসরি তাকাল রানা মেয়েটার চোখে। 'মানামি, আমাদের সবারই ভীষণ ভুল হয়েছিল। আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন নাসিম ভাই। কথাগুলো মেনে নিয়ে আমাদের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল।'

'দোষটা তোমার বা নাসিম আহমেদের নয়। হয়তো ভাবছ, যদি সাগরে না নামতে, আমার ভাই...' আস্তে করে মাথা নাড়ল মানামি। 'ডিনারে টিটকারি দিচ্ছিলাম সবাই মিস্টার আহমেদকে। তুমি তখন বলেছিলে সত্যিই ওরকম কিছু থাকতে পারে। মানিনি কেউ, ভেবেছি তোমরা বোকার স্বর্গে বাস করছ।'

নীরবতা নামল ঘরে।

চুপ করে আছে রানা। ভাবছে কী সান্ত্বনা দেবে মেয়েটিকে।

কিছুক্ষণ পর বলল মানামি, 'আমাকে সান্ত্বনা দিয়ো না, রানা। এ কষ্ট আমার একারই থাকুক। কিন্তু তোমাকে বলছি, টয়োডা প্রাপ্ত-বয়স্ক মানুষ ছিল। কারও কথা মানত না, সাগরে ও নামতই। তুমি বা নাসিম-স্যান বারণ করলেও যেত। আমরা ভেঙে পড়েছি ভয়ঙ্কর বাস্তবতা দেখে। কেউ জানি না এরপর কী

হবে, সামনে কী হতে চলেছে...' টপটপ করে অশ্রু নামল মানামির দুই চোখ থেকে।

'যে ক্ষতি হয়েছে, তার কোনও সান্ত্বনা নেই,' দুর্বল শোনাল রানার কণ্ঠ। 'আমার বাবা-মা-বোন-ভাই কেউ নেই, তার পরেও আমি বুঝতে পারি তোমাদের বুকের ভেতর কী চলছে।'

খাটের পাশে বসে হঠাৎ রানার বুকে মাথা রাখল মানামি। ডুকরে কাঁদতে শুরু করেছে। আস্তে করে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা।

'আমি কখনও কাঁদি না, কখনও না,' ফুঁপিয়ে উঠল মানামি।

'সবাই কাঁদে, মানামি, কখনও কখনও,' নরম স্বরে বলল রানা, 'সবাইকেই কাঁদতে হয়...'

'ঠিক বলেছ,' একটু পর মাথা দোলাল মানামি। রানার বুক থেকে মুখ তুলল না। 'মা চলে গেলেন, তখন আমার দশবছর। তখন থেকে বাবা আর টয়োডার দেখাশোনা করছি: খাবার তৈরি করেছি, ঘর গুছিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এখন...'

'তোমার বাবা?' প্রসঙ্গান্তরে যাবার চেষ্টা করল রানা, 'তাঁর কী অবস্থা?'

'একেবারে ভেঙে পড়েছেন। আমি ছাড়া আর কেউ থাকল না তাঁর। জানি না কী করা উচিত, শেষকৃত্য কীভাবে হবে? আমরা তো টয়োডার দেহটাও পেলাম না...'

বুক ভিজে যাচ্ছে রানার মেয়েটির চোখের পানিতে। চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'হ্যারল্ড ডেভিডের সঙ্গে কথা বলো। শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করবে সে-ই।'

আরও কিছুক্ষণ নীরবে কেঁদে সোজা হয়ে বসে চোখ মুছল মানামি। 'ঠিক আছে, তাই করব। বাবা একটু সামলে উঠলেই ফিরে যাব ক্যালিফোর্নিয়ায়। এখানে আর কোনও কাজ নেই আমার।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। নিচু স্বরে বলল, 'মানামি, বিষয়টা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। একটা কথা কেউ জানে না। ওই ট্রেঞ্চে আরও একটা মেগালোডন দেখেছি। একটাকে টেনে তুলেছে নিতু। অন্যটা খুবলে খেয়েছে তারে জড়িয়ে যাওয়া পুরুষটাকে। লাশের পিছু নিয়ে উঠে এসেছে ওপরে।'

'কিন্তু জাহাজের সবাই তো ওদিকেই চেয়ে ছিল,' প্রায় ফিসফিস করে বলল মানামি।

'ওরা দেখেনি। কিন্তু আছে।'

'ডাক্তার ম্যাককমন বলছিল, ওগুলো উঠে আসতে পারবে না ওই ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা পানি ভেদ করে। ডক্টর আহমেদও একই কথা বলেছেন লেকচার হলে।'

উঠে বসতে গিয়েও ব্যথার কারণে আবার শুয়ে পড়ল রানা। 'ভুল, মানামি। এসব মেগালোডন শ্বেত-হাঙরের মতই। রক্ত ম্যামালদের মত অতটা গরম না হলেও যথেষ্ট গরম। কিন্তু দেহ রীতিমত উষ্ণ। সায়েন্টিস্টরা একে বলেন জায়গ্যানটোথার্মি। মর্দাটার বিশাল শরীরের উত্তাপের সাহায্য নিয়ে উঠতে দেখেছি আমি ওটাকে।' একটু দম নিয়ে আবার বলল ও, 'দেহের ভিতর অনেক তাপ থাকে মেগালোডনের। পেশি নড়লে উষ্ণ হয়ে ওঠে রক্ত। পরিবেশের চেয়ে সাত থেকে বারো ডিগ্রি গরম ওদের শরীর। সেজন্যেই অনায়াসে মানিয়ে নেয় ওই উষ্ণ খাদে।'

'আসলে কী বলছ?' রানার চোখে চোখ রাখল ভীত মানামি।

'যা বলছি তার সারমর্ম হচ্ছে: নিতু যখন তুলতে শুরু করল টয়োডার সাব, উইঞ্চের তারে আটকে গেল পুরুষ মেগালোডন। তখন, পরিষ্কার দেখেছি, বড় এক ফিমেল মেগালোডন হামলা করেছে ওটাকে। যতক্ষণ দেখতে পেয়েছি, দেখেছি ওটা উঠছিল মৃত সঙ্গীর লাশের সঙ্গে ওটাকে খেতে খেতে। তাকে ঘিরে বইছিল আহত মেগালোডনের দেহের উষ্ণ রক্ত। আমি নিজে

দেখেছি, উঠে গেল ওটা গরম পানির স্তর থেকে উপরের শীতল পানির স্তরে।'

'মেগালোডনের রক্ত কত গরম?'

'নাসিম ভাইয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, ওই খাদে ওদের রক্তের উষ্ণতা কমপক্ষে নব্বুই ডিগ্রি,' বলল রানা। 'সঙ্গীর রক্তের স্রোতের ভিতর ছিল ওটা। দৈর্ঘ্যে সে ষাট ফুট বা আরও বড়। ওই আকারের হাঙর নীচের খাদ থেকে উঠে আসতে সময় লাগবে বড়জোর বিশ মিনিট।'

অপলক চোখে রানার দিকে চেয়ে রইল মানামি।

ওর চোখে ভয়ের ছাপ দেখছে রানা।

'তুমি বিশ্রাম নাও,' কয়েক মুহূর্ত পর উঠে দাঁড়াল মানামি, রুমালে মুছে নিল চোখ। 'পরে কথা হবে।' একবার আস্তে করে রানার হাতে চাপ দিয়ে রওনা হয়ে গেল দরজার দিকে।

বারো

চটকা ভাঙতেই নিজের বাহু দেখতে পেল রানা। ত্বকে আঙুল রাখতেই কড়-কড় করে উঠল শুকনো রক্ত। মনে পড়ল, অ্যাবিস গ্লাইডার-টুর ক্যাপসুলে ছিল, ভাসছিল প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্ত সব ঢেউয়ের ভিতর। অর্ধ-ভাসমান প্লেক্সিগ্লাসের কফিনে ঢুকছিল ম্লান রোদ।

স্বপ্ন দেখছিলাম, বিড়বিড় করল রানা।

উঠে বসে পর্দা সরিয়ে আকাশে চাইল।

দূর দিগন্তে কিছুই নেই।

কতক্ষণ অচেতন ছিলাম, ভাবল আনমনে।

একঘণ্টা?

একদিন?

আরও বেশি?

পানিতে পড়ে ঝলসে উঠছে রোদ।

ও ভাসছে, দুলছে বারে বারে।

নীচের দিকে চাইল রানা।

যে-কোনও সময়ে উঠে আসবে প্রাগৈতিহাসিক ওই হাঙর!

হ্যাঁ, ওটা নীচেই আছে!

হঠাৎ ধূসর জল ভেদ করে উঠে এল মস্ত মেগালোডন, আসছে রকেটের বেগে!

হাঁ করেছে বিশাল মুখ!

মাড়িতে গিজগিজ করছে ছোরার মত অসংখ্য দাঁত!

এবার সত্যিই ঘুম ভাঙল রানার। টের পেল, ঘামছে দরদর করে। ফোঁস-ফোঁস পড়ছে শ্বাস।

হাসপাতালের ঘরে ও একা, আর কেউ নেই।

দেয়াল ঘড়ি সময় জানাচ্ছে: ১২:০৭ এ.এম।

শুয়ে আছে প্রায় ভেজা চাদরের উপর। খোলা জানালা দিয়ে আসছে চাঁদের নরম রুপালি আলো।

বড় করে দম নিল রানা, খুব ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলল। ভীষণ চমকে গিয়েছিল দুঃস্বপ্ন দেখে। হঠাৎ টের পেল, আগের চেয়ে ঢের সুস্থ লাগছে।

জ্বর ছেড়ে গেছে, বা প্রভাব কমে গেছে ড্রাগসের।

ভীষণ খিদেয় জ্বলছে পেট।

বিছানা থেকে নেমে পড়ল রানা, চলে গেল দরজার কাছে, পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল করিডোরে।

চারপাশে কেউ নেই।

লম্বা করিডোরের শেষ মাথায় চলছে টিভি।

ওদিকে এগুতে শুরু করল রানা। পৌঁছে গেল নার্সিং স্টেশনে। কোনও নার্স নেই। ডেস্কের উপর দুই পা তুলে চুপ করে বসে আছে আমেরিকান নেভির এক এমপি। শার্টের বুক খোলা, গপাগপ গিলছে মস্ত এক সাবমেরিন স্যাণ্ডউইচ। সংবাদ দেখছে টিভিতে।

রানাকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল তরুণ।

'মিস্টার রানা... আপনি জেগে গেছেন?'

'নার্স কই?' ব্যাঙের স্বর বেরুল রানার কণ্ঠ থেকে।

'একমিনিট আগে ওদিকে গেল,' করিডোরের ডানদিক দেখিয়ে দিল তরুণ। 'আমি ওকে বলেছি, কারও দরকার পড়লে ডেকে দেব।' রানার কপালের ব্যাণ্ডেজের দিকে চাইল। 'স্যর, আপনার বোধহয় বেড থেকে নামা উচিত হয়নি।'

'খাবার পাব কোথায়?' সরাসরি বলল রানা।

'ভোর ছয়টার পর খুলবে ক্যাফেটেরিয়া, স্যর।'

এবার যথেষ্ট রেগে গেল রানা।

ব্যাটারা না খাইয়ে ওকে মারবে না কি?

'আপনি এখান থেকে নিতে পারেন, স্যর,' পেটমোটা স্যাণ্ডউইচের ঝুলি বাড়িয়ে দিল এমপি।

ওটার দিকে চাইল রানা। 'না, থাক, তোমারই লাগবে...'

'না, স্যর, চারটে নিতে পারবেন। আমার এত লাগবে না।'

'ঠিক আছে, থ্যাঙ্ক ইউ।' তরুণের হাত থেকে ঝুলি নিল রানা, ভিতর থেকে একটা স্যাণ্ডউইচ বের করে কামড় দিল। মনে হলো, কয়েক দিনের ভেতর পেটে কিছুই পড়েনি। তার চেয়েও বড় কথা: পৃথিবীতে আগে কখনও এমন সুস্বাদু স্যাণ্ডউইচ তৈরি হয়নি। 'খেতে দারুণ,' প্রথমটা শেষ করে দ্বিতীয়টা নিল রানা।

'এখানে সালামি আর চিজ সাবমেরিন স্যাণ্ডউইচ পাওয়া খুব কঠিন, স্যর,' উৎসাহ নিয়ে বলল তরুণ। 'মেলে শুধু দ্বীপের মাঝের এক দোকানে। আমরা প্রতি সপ্তাহে একবার যাই এই মালের লোভে। খেলে মনে হয় নিজের শহরেই আছি। বুঝি না লোকটা এদিকে দোকান খোলে না কেন! আসলে আমার মনে হয়, স্যর...'

বলে চলেছে এমপি। কিন্তু ওর দিকে খেয়াল নেই রানার, টিভির দিকে চেয়ে আছে। ওখানে দেখা গেল, জেলেরা নিজেদের বোট থেকে ডকে তুলছে অসংখ্য হাঙর।

'এক্সকিউয মি, তুমি কি একটু বাড়াতে পারবে টিভির আওয়াজটা?' জানতে চাইল রানা।

চুপ হয়ে গেল এমপি, দেরি না করে বাড়িয়ে দিল ভলিউম।

'...য্যামোরা বে থেকে ধরা হচ্ছে শত শত হাঙর। স্থানীয় হাঙর শিকারি জেলেরা জানাচ্ছে, ওরা সাইপ্যান থেকে শুরু করে আশপাশের সাগরে ইদানীং অসংখ্য শিকার পাচ্ছে— এই শতাব্দীতে এমন আর হয়নি। সবার আশা: আগামীকাল আরও বেশি ধরতে পারবে। প্রসঙ্গান্তরে বলতে হচ্ছে, বারোটা পাইলট ওয়েইল এবং দুই ডজন ডলফিন উঠে এসেছে সাইপ্যানের উত্তরাংশের সৈকতে। কপাল মন্দ ওদের, মারা যাওয়ার আগেই বেশিরভাগকে সাগরে ফিরিয়ে দেয়া যায়নি। এখনও কাজ করছে স্বেচ্ছাসেবীরা। ...এবার অন্য খবরে যাচ্ছি...'

টিভির ভলিউম কমিয়ে দিল রানা। চট্ করে এমপির দিকে চাইল। বলল না কিছুই।

আসলে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চের উত্তর অংশে সাইপ্যান!

গভীর চিন্তার ভিতর ডুবে গেছে রানা।

'শরীর খারাপ লাগছে, না কিছু ভাবছেন, স্যর?' জানতে চাইল তরুণ।

তার দিকে চাইল রানা, তারপর শান্ত স্বরে বলল, 'কিছুই না।'

করিডোর ধরে রওনা হয়ে গেল ও। কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়াল স্যাণ্ডউইচের ঝুলি হাতে। ফিরে গিয়ে ওটা ধরিয়ে দিল তরুণের হাতে। বিড়বিড় করে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ।'

ঘুরেই এক দৌড়ে নিজের দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা।

পিছন থেকে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল এমপি। পিছন থেকে জানতে চাইল, 'বমি আসছে, স্যর?'

চার প্যাসেঞ্জারবাহী পুরনো কিন্তু চমৎকার হেলিকপ্টার ওটা। এইমাত্র নেমেছে মেটো রানওয়েতে। রিটায়ার্ড নেভি ক্যাপ্টেন বাড লিটলটন চট্ করে দেখে নিল যাত্রীকে। পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঝোড়ো আকাশ চিরে এইমাত্র মাটি স্পর্শ করেছে ওরা।

'ঠিক আছ তো, দোস্ত?' জানতে চাইল লিটলটন।

'তাই তো মনে হয়,' মৃদু হাসল মাসুদ রানা। 'তুমি?'

'ব্যাঙের আবার সর্দি!' হাসল লিটলটন।

তার সঙ্গে রানার পরিচয় অস্বাভাবিক এক পরিবেশে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্যাক্রামেন্টো শহরে হারিকেনের গতিতে রানা এজেন্সির রিসেপশনিস্টকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে রানার অফিসে এসে ঢুকেছিল সে।

রানা তখন অফিসেই ছিল জরুরি ফাইলে নাক ডুবিয়ে।

'আপনার কত টাকা চাই?' দরজা পেরিয়েই বলেছিল রিটায়ার্ড নেভি ফাইটারের ক্যাপ্টেন, চোখদুটো ছিল রক্ত-জবার মত লাল। 'যা চান দেব। আমার কেসটা আপনাদের নিতেই হবে।'

পিছন থেকে আপত্তির সুরে বলছিল রিসেপশনিস্ট, 'স্যর, আপনি...'

'যা টাকা লাগে আমি দেব,' আবারও বলেছিল লিটলটন।

এ ধরনের কথা শুনে অবাক হয়েছিল রানা। হাতের ইশারা

করে বলেছিল, 'শিখা, ঠিক আছে, আমি দেখছি।'

মেয়েটি বিরক্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে চলে যায়।

সামনের চেয়ারের দিকে ইশারা করেছিল রানা। 'বসুন।'

'আমি বসতে আসিনি।'

'তা হলে দাঁড়িয়েই বলুন, কী চান?'

'আমার একমাত্র বোন...' প্রথমবারের মত ভেঙে গিয়েছিল লিটলটনের কণ্ঠ। 'ওরা... ওকে...'

সিট ছেড়ে লিটলটনের পাশে চলে গেল রানা, চেয়ার টেনে দিয়ে নরম গলায় বলল, 'বসুন আগে, তারপর বলুন কী হয়েছে।'

এরপর কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে চেয়ারে বসল বাড লিটলটন।

দ্বিতীয় ইরাক যুদ্ধে সে ছিল জঙ্গী বিমানের এক স্কোয়াড্রনের প্রধান। দায়িত্ব ছিল জাহাজ থেকে বিমান নিয়ে গিয়ে ইরাকের বুকে বোমা ফেলা। কিন্তু বাড বুঝেছিল, ওরা বোমা ফেলছে নিরীহ মানুষের উপর। দলের সবাইকে নির্দেশ দিয়েছিল, হামলা শুরু করবার আগেই মরুভূমিতে ফেলতে হবে সব বোমা।

এরপর যুদ্ধ শেষে জুনিয়র এক অফিসারের মনে হলো, সহজ পদোন্নতি চাইলে ফাঁসিয়ে দেয়া উচিত ক্যাপ্টেন লিটলটনকে। লোকটা নালিশ করবার দু'ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার হলো বাড। নিয়ে যাওয়া হলো সাইকোঅ্যানালিসিসের জন্য বিশেষ হাসপাতালে।

তিন মাস ওর উপর চলল অকথ্য অত্যাচার।

কেড়ে নেয়া হলো আগের পাওয়া সব মেডেল ও পদবী।

চাকরি হারিয়ে এই শহরের কাছে ছোট্ট শহর এলিয়ানোয় নিজ খামারবাড়িতে ফিরল। ফিরেই শুনল, আগের রাতে রেপ করা হয়েছে ওর কিশোরী বোনটাকে, তারপর এলোপাতাড়ি ছুরি মারা হয়েছে। মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে এখন হাসপাতালে।

বাবা-মা আগেই চলে গেছেন, ছিল শুধু ওই ছোট্ট বোনটা, তার এই অবস্থা দেখে স্রেফ মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল বাড

লিটলটনের। তিন দিন পর মারা গেল ওর আদরের ছোট বোন।

ক'দিন পাগলের মত বুক চাপড়ে কেঁদে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সোজা গিয়ে ঢুকেছিল সে মদের দোকানে সান্ত্বনার খোঁজে।

কদিন পর তার এক বন্ধু জানাল, স্যাক্রামেণ্টো শহরে রানা এজেন্সি নামে একটা গোয়েন্দা সংস্থা অফিস খুলেছে। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছে ওরা। বড় বড় জটিল কেস তো নেয়ই, রেপ বা কিডন্যাপের কেসও নেয়। সব চেয়ে বড় কথা, অর্থপিশাচ নয় ওরা, কাজ নিলে তার শেষ দেখে ছাড়ে। অন্য গোয়েন্দাদের মত ক্লায়েণ্টকে ফতুর করে ছাড়ে না।

সেদিন বাডের কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল রানা।

কেসটা নিয়েছিল ও টাকার জন্য নয়, অন্তরের তাগিদে।

আগাম ফি দিতে চেয়েছিল বাড, কিন্তু রানা বলেছিল: কাজ শেষ হলে দেখা যাবে।

বাড লিটলটন চলে যাওয়ার পর শাখা-প্রধান অরূপ রহমানকে সঙ্গে নিয়ে আদাজল খেয়ে লেগেছিল ও কেসটার পিছনে। পাঁচ দিনের মাথায় পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল রেপিস্টদের।

বাড লিটলটনের পাড়ার কয়েকজন মস্তানের কাজ ছিল ওটা। ছদ্মবেশ নেয়া সত্ত্বেও চিনে ফেলেছিল মেয়েটি ওদের, তাই ধর্ষণ শেষে খুন করছিল ওরা তাকে— ছুরির কয়েকটা পোচ দেয়ার পর আশপাশে লোকজনের সাড়া পেয়ে পালিয়েছিল। এ কুকীর্তির মূল কারণ: তাদের ধারণা, যুদ্ধ না করে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বাড লিটলটন। কাজেই তার বোনের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার জন্মেছে তাদের। অপরাধ নিঃসন্দেহে প্রমাণ হওয়ায় বিচারে সর্বোচ্চ শাস্তি হয়ে যায় রেপিস্টদের।

কিছুদিন পর রানা এজেন্সিতে প্রাপ্য টাকা দিতে এসেছিল বাড লিটলটন। শাখা-প্রধান জানিয়ে দিয়েছিল, উনি শহরে নেই,

আপনার কাছ থেকে কিছু নেয়ার থাকলে, সেটা আমাদের বসই নেবেন ফিরে এসে।

একমাস পর ফিরে এল রানা, কিন্তু টাকা নিতে অস্বীকার করল। বাড চাপাচাপি করায় বলল, 'নিজের ছোট বোনের জন্যে কাজটা করেছি আমি, টাকা নেব না। তোমার কথা শুনে ভয়ানক রাগ হয়েছিল, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, বোনের প্রাণটা তো আর ফিরে পাব না, কিন্তু ন্যায় বিচার আদায় করে ছাড়ব।'

দুমাস পর ওই শহরে আবারও ফিরে বাড লিটলটনের ছোট্ট খামার বাড়িতে হাজির হয়েছিল রানা। ততদিনে রানা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে।

আমেরিকান সরকার এবং প্রতিবেশীদের অত্যাচারে খেপতে খেপতে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিল মানুষটা। উল্টোপাল্টা শুনত, ভাবত ওর বাবা-মা-বোন ওকে ডাকছে স্বর্গ থেকে।

রানা তাকে বলেছিল, পাশের শহরে ওর পরিচিত এক ডাক্তার আছেন, তিনি মানসিক সমস্যায় জাদু দেখাতে পারেন।

ঠিকানা দিয়েছিল রানা।

রানা বিদায় নেওয়ার পুরো এক মাস পর বাডের মনে হয়েছিলঃ প্রিয় বোন আর নেই, কেউ নেই আমার; কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি, চেষ্টা করা উচিত সুস্থ থাকার।

রানার দেয়া কার্ড অনুযায়ী ডাক্তার মুস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে দেখা করল সে। মুগ্ধ হলো সহানুভূতিশীল বাঙালি চিকিৎসকের মানবিক আচরণে।

এরপর ঝাড়া তিনমাস তাঁর কাছে চিকিৎসা নিল বাড প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে।

পুরো সুস্থ হয়ে উঠল, ছেড়ে দিল মদ্যপান।

ওর জন্য আরও চমক ছিল।

কিছুদিন পর আবারও ওর বাড়িতে এল রানা। তার অনেক

আগেই সত্যিকারের বন্ধু হিসেবে রানাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করে নিয়েছে বাড লিটলটন।

কথায় কথায় বলেছিল রানা, 'তোমার কিছু টাকা থাকলে তা দিয়ে ছোট একটা হেলিকপ্টার কিনতে পারো। ওটা নিয়ে গুয়ামে গেলে ভাল রোজগার হবে।'

মাথা নেড়ে বলেছিল বাড, 'আমার হাতে অত টাকা নেই যে কপ্টার কিনতে পারব।'

'তুমি আমার কাছ থেকে ধার নাও না কেন, পরে শোধ করে দিয়ো,' বলেছিল রানা।

ভাল এক হেলিকপ্টারের খোঁজও দিয়েছিল ও।

তিনদিন পর মনস্থির করে রানা এজেন্সিতে গেল বাড, কিন্তু যখন শুনল আমেরিকা ছেড়ে চলে গেছে রানা, হাল ছেড়ে দিল।

কিন্তু রানা এজেন্সি শাখা-প্রধান অরূপ রহমান বলল, 'মাসুদ ভাই আপনার জন্য একটা চেক রেখে গেছেন, মিস্টার লিটলটন।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ।' একটা চেক বাড়িয়ে দিল অরূপ। 'উনি বলেছেন, এই ধার শোধ করে ফেলতে পারবেন আপনি দুই বছরের মধ্যেই।'

হতবাক হয়ে গিয়েছিল বাড চেকের উপর লেখা বিরাট অঙ্কটা দেখে। ভয় পেয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিচ্ছিল ওটা, অরূপ বলল, 'চেকটা নিয়ে যান, স্যর। না নিলে মাসুদ ভাই খুব দুঃখ পাবেন।'

সেদিনই চেক ভাঙিয়ে পরদিন কপ্টারটা কিনল বাড, তারপর জাহাজে করে তুলে নিয়ে গেল গুয়ামে।

'তোমাকে এত বিধ্বস্ত লাগছে কেন, দোস্ত?' জানতে চাইল বাড লিটলটন।

'সাগরের অনেক গভীরে ডাইভ দিয়েই বোধহয়,' বলল রানা।

'নাকি রাত তিনটের সময় ঝড়ের ভিতর কপ্টার নিয়ে আকাশে উঠে...'

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'ওয়েইলটার লাশ সত্যি ওখানেই আছে, ভুল হচ্ছে না তো?'

'কোনও ভুল নেই। ওখানে যদি না পাও, নিজের কান কেটে দেব, কচমচিয়ে খেয়ো চিবিয়ে।'

'দূর, জঘন্য লাগবে খেতে! কিন্তু তোমার বন্ধু কোথায়? ওর না আসার কথা আমাকে নিয়ে যেতে?'

'কপ্টার থেকে নেমে পড়ো, বাছা। বামদিকে সরু রাস্তা, সোজা গেছে সৈকতে। ওখানে পাবে আট-দশটা বোট। সবচেয়ে খারাপটা ফ্রাঙ্ক হুলাহানের। বলে দিয়েছে, অপেক্ষা করবে। ফিরে এসে আমাকে পাবে এখানেই।'

'তিনঘণ্টা পর ফিরব।'

'যদি বাঁচো,' বলল বাড। 'মনে রেখো, অর্ধেক টাকা দেবে, বাকিটা দেবে ফিরে আসার পর। নইলে ফিরতে হবে সাঁতরে, বলে দিলাম।'

'প্রিয় বন্ধু সম্পর্কে অপ্রিয় তথ্য দেয়ার জন্য ধন্যবাদ,' বলে ব্যাগটা কাঁধে তুলে কপ্টার থেকে নেমে পড়ল রানা, রওনা হয়ে গেল সৈকত লক্ষ্য করে।

মেঘে ঢাকা পড়েছে নক্ষত্রগুলো।

একটু দূরে কালো প্রশান্ত মহাসাগর। হাওয়া আসছে।

ভেজা সৈকত পেরিয়ে জেটির কাছে চলে গেল রানা, এক এক করে দেখতে শুরু করেছে বোটগুলোকে।

শেষেরটা দেখে মনে হলো না আর কোনদিন সাগরে ভাসবে।

কিন্তু আসলে ভাসছে।

আঠারো ফুটি ভাঙাচোরা কাঠের নৌকা। একসময় লাল ছিল।

ডেকে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী কালো এক লোক। পরনে

ঘামে ভেজা টি-শার্ট ও জিন্সের প্যান্ট। ব্যস্ত হয়ে গুছিয়ে রাখছে ক্র্যাব ট্র্যাপ।

'এক্সকিউয মি?' পাশে থেমে বলল রানা।

লোকটা চুপচাপ নিজের কাজ করছে। কানে ঠসা হতে পারে।

'এই যে, এক্সকিউয মি... আপনি কি হুলাহান?'

'কে জানতে চায়?' কাজ থেকে চোখ তুলল না সে।

'আমার নাম মাসুদ রানা। লিটলটনের বন্ধু।'

'আমি ওর কাছে টাকা পাই। আপনি সে টাকা এনেছেন তো?'

'না, আনিনি। কিন্তু টাকা দিতে পারি আমাকে মরা তিমির কাছে নিয়ে গেলে।'

'মরা হাম্পব্যাক ভাসছে দুই মাইল দূরে। তিন শ' ডলার।'

'ঠিক আছে, এখন দেব অর্ধেক, বাকিটা দেব ফিরে এসে।' মানিব্যাগ থেকে এক শ' ডলারের নোট বের করল রানা, আরেকটা পঞ্চাশ ডলারের।

থাবা দিয়ে নোটগুলো নিয়ে নিল হুলো বিড়ালের মত হুলাহান।

'ঠিক আছে, উঠে পড়ুন বোটে।'

'আরেকটা কথা, মোটর চালু করবে না,' বলল রানা।

'ব্যাটা বলে কী! শালা, তুমি দুই মাইল বৈঠা বাইবে?'

'না, তুমি।'

'নাহ্, ফেরত নাও তোমার টাকা। ভাগো!'

'সবমিলে চার শ' দেব। দুই শ' এখন, বাকি দুই শ' ফিরে।'

প্রথমবারের মত রানার দিকে চাইল ফ্রাঙ্ক হুলাহান।

'বাকি পঞ্চাশ ডলার ফেলুন।'

আরেকটা নোট বাড়িয়ে দিল রানা।

'আপনি মোটর চালাতে দেবেন না কেন?' জানতে চাইল

হুলাহান।

'কোনও মাছকে বিরক্ত করতে চাই না।'

'শালা পুরো পাগল দেখছি,' বিড়বিড় করল জেলে।

রানা বোটে উঠতেই রওনা হয়ে গেল সে।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সরাসরি নাসিম আহমেদের বন্ধুর বাড়িতে গেছে রানা।

তখনও জেগে ছিলেন নাসিম।

আলাপ করেছে ওরা।

তাঁরও বিশ্বাস, অতল থেকে উঠে এসেছে ফিমেল কারকারোডন মেগালোডন।

সাইপ্যানের উপকূলে ধরা পড়ছে প্রচুর হাঙর, কোনও কারণে বোধহয় ভীষণ ভীত হয়ে উঠেছে ওগুলো। ভয়ঙ্কর এক শিকারির ভয়ে তীরে গিয়ে ভিড়ছে সাগরের যত তিমি ও ডলফিন।

কিন্তু এগুলোকে প্রমাণ হিসাবে ধরা যায় না।

বাস্তব প্রমাণ কই?

তখনই ফোনে কপ্টার পাইলট বাড লিটলটনের সঙ্গে আলাপ করেছে রানা। তার কাছ থেকে জানা গেছে, সাইপ্যানের তীর থেকে দুই মাইল দূরে মরা এক তিমি ভাসতে দেখেছে তার পরিচিত এক জেলে। হয়তো মেগালোডনের হামলায় খুন হয়েছে ওই হাম্পব্যাক।

নাসিমের ওখান থেকে বেরিয়ে লিটলটনের সঙ্গে দেখা করেছে ও। সাগরে গিয়ে দেখতে চায় কী কারণে মরল ওই তিমি।

এখন বৈঠা মেরে এগিয়ে চলেছে মৃত তিমির দিকে। হুলাহানকে বৈঠা বাইতে হবে বললেও, নিজেও হাত লাগিয়েছে রানা। গরমে দরদর করে ঘামছে।

আঁধার সাগরে আধঘণ্টা পর কালো এক স্তূপের কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

‘এই যে আপনার মাল,’ বলল হুলাহান। ‘এটাকে সারাদিন ধরে খেয়েছে হাঙর। কাল আর কিছুই থাকবে না।’

উপুড় হয়ে ভাসছে মরা তিমি। পচতে শুরু করায় দুর্গন্ধে তিষ্ঠানো যাচ্ছে না। ফুলে ওঠা লাশে বৈঠা দিয়ে গুঁতো দিল রানা। শান্ত সাগরে হাবুডুবু খেল তিমি। কিন্তু এখনও অনেক ভারী, চিত করা গেল না।

‘কী করতে চান?’ জানতে চাইল হুলাহান।

‘বুঝতে চাইছি কে এটাকে খুন করল। চিত করতে পারবে?’

‘পঞ্চাশ ডলার দিলে।’

‘পানিতে নামার জন্য পঞ্চাশ ডলার?’

‘না। তা না। চারপাশে অনেক হাঙর। ওই যে, দেখুন।’

এবার লোকটার আঙুল অনুসরণ করে হাঙরের ফিন দেখতে পেল রানা। ‘ওটা টাইগার শার্ক না?’

‘হ্যাঁ, ঠিক। বেশি কাছে এলে সিক্সগান দিয়ে গুলি করে মেরে ফেলব।’ কোমরের বেল্ট থেকে টেনে বের করল সে প্রাচীন এক রিভলভার।

‘হুলাহান, একদম আওয়াজ করা চলবে না,’ সাবধান করল রানা। কালো পানির উপর ফ্ল্যাশলাইটের বাতি ফেলল। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে নৌকার গায়ে এসে লাগছে মৃদু ঢেউগুলো। আর ঠিক তখনই হঠাৎ রানা টের পেল, ওরা এখন খুব সহজ শিকার।

সাদা আলোয় দেখা গেল পানির নীচে মস্ত বড় কী যেন ঘুরছে। আলো পড়তেই মুহূর্তে হারিয়ে গেল কালো আঁধারে।

‘খাইছে! ওটা কী?’ বেদম চমকে গেছে হুলাহান।

বিশালদেহী লোকটার চোখে ভয় দেখল রানা।

‘ওটা কী? কী ওটা?’ থড়বড় করে বলল লোকটা।

‘নীচের কিছু,’ বলল রানা। শিরশির করছে ঘাড়ের চুলগুলো।

‘পানির ভেতর রীতিমত কাঁপন তৈরি করছে!’ বলল হুলাহান,

‘অনেক বড়। এত বড় কোনও মাছ...’

ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে কাঠের নৌকা। ছোট এক ঘূর্ণির ভিতর পড়েছে ওরা। আর সে ঘূর্ণি তৈরি করেছে পানির নীচের সেই মস্ত কিছু। ঘূর্ণিপাক ক্রমে বাড়ছে আরও।

আস্তে করে বসে পড়ে কিনারার রেলিং ধরে ফেলল রানা ও হুলাহান। সিক্সগান রেখে দিয়েছিল কালো লোকটা, আবারও বের করল। ‘স্বয়ং শয়তান আছে পানির নীচে!’

পঞ্চাশ ফুট দূরে ফুলে উঠছে সাগর।

ওদিকে চেয়ে রানার মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল।

পানির নীচ থেকে উঠে আসছে সাদাটে কী যেন!

ভীষণ ভয়ে ফুঁপিয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক হুলাহান, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে রিভলভার দিয়ে পর পর ছয়টা গুলি করল সে পানির ভেতর সাদা অবয়বটাকে লক্ষ্য করে। কাকে ভয় দেখাতে চাইছে সে-ই জানে!

এমনি সময়ে জোরালো ঝপাস্ আওয়াজ তুলে নীচ থেকে উঠে এল মরা একটা আটাশ ফুটি অর্কা বা কিলার ওয়েইল, ভেসে উঠল ওটার বিরাট সাদা পেট।

জীবিত নেই, বুঝতে পেরে বারো ফুটি এক ক্ষুধার্ত টাইগার শার্ক ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার ওপর।

থেমেছে ঘুরন্ত নৌকা।

হাম্পব্যাককে ছেড়ে কিলার ওয়েইলের দিকে আলো ফেলল রানা।

‘খাইছে! খাইছে!’ হাউমাউ করে উঠল হুলাহান।

তিমির পেটে মস্ত এক ক্ষত।

ওখান থেকে এক কামড়ে কেটে নেয়া হয়েছে অনেকখানি মাংস। দেখা যাচ্ছে দশ ফুট ব্যাসের বৃত্তাকার, গভীর গর্ত। গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে।

‘ঈশ্বরের মা-ই জানে কার কাজ এটা!’ বলে রানা মুখ খুলবার

আগেই আউটবোর্ড ইঞ্জিনের উপর হামলে পড়ল হুলাহান, চালু করে ফেলেছে মোটর।

'না! হুলাহান...'

অনেক দেরি করে ফেলেছে রানা।

গর্জে উঠেছে ইঞ্জিন।

চরকির মত বোট ঘুরিয়ে নিয়ে তীরের দিকে ভাগতে শুরু করেছে হুলাহান। ফ্যাসফেঁসে স্বরে বলল, 'একটা কথাও বলবেন না, মিস্টার রানা! ওটা সাগরের দানো! কোন মাছের বাপের সাধ্যি আছে নাকি যে অর্কা মারবে! আপনি শালা বদ্ধ পাগল! আসলে শয়তানের পেছনে লেগেছেন! নিজে তো মরবেনই, আমাকেও মারবেন, মিয়া! আপনার টাকা আপনারই থাকুক! ওরে... ওরে, পালা রে, বাপধন হুলাহান!'

তেরো

অরা নেভাল হসপিটালে ঢুকে চট্ করে হাতঘড়ি দেখে নিল মানামি সিনোসুকা।

সকাল ৮:৪০।

হাতে একদম সময় নেই। রানা সুস্থ বোধ করলে বিশ মিনিট পর ওকে নিয়ে কমাণ্ডার ফিলিপ গোল্ডম্যানের অফিসে যেতে হবে। ফাঁকা করিডোর ধরে হাঁটতে শুরু করে মানামি বুঝল না কোথায় গেল নেভির এমপি।

এখন আর দরজার সামনে নেই সে।

ঘরে ঢুকে স্বর্ণকেশী এক সুন্দরীকে দেখল মানামি, চেনা চেনা লাগল। মেয়েটা ডাকাতের মত করে ওয়ারড্রোব ঘাঁটছে।

রানার বিছানা খালি।

'আমি কোনও সাহায্যে আসতে পারি?' জানতে চাইল মানামি।

নিজের কাজে অতি ব্যস্ত ছিল অ্যানি ল্যামবার্ট, আরেকটু হলে ফেলে দিত দু'হাত ভরা কাপড়। 'হ্যাঁ, পারেন,' সামলে নিয়ে বলল। 'আমার বেয়াক্কেলে স্বামীটা এখন কোথায়?'

'আপনার স্বা... আপনি অ্যানি আহমেদ?'

'মিসেস আহমেদ,' বিদ্বেষ নিয়ে চোখ সরু করল অ্যানি। 'কে তুমি?'

'মানামি সিনোসুকা।'

আপাদমস্তক দেখল মানামিকে অ্যানি। 'আচ্ছা? তা হলে...'

'আপনার স্বামী তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে উঠেছেন।'

'তার সঙ্গে তোমার...'

'আমাকে তাঁর জুনিয়র বন্ধু বলতে পারেন। গতকাল মিস্টার রানার পাশেই ছিলেন উনি।'

'তা হলে এখন সে এক বন্ধুর বাড়িতে?'

'হ্যাঁ। আমি এসেছি মিস্টার রানাকে নেভাল বেসে নিয়ে যেতে।'

'নাসিমকে ডাকেনি ওরা?' হঠাৎ গলা নরম হয়েছে অ্যানির।

'উনি বোধহয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছেন।'

'নেভির সঙ্গে তার কী?'

'কমাণ্ডার ফিলিপ গোল্ডম্যানের সঙ্গে মিটিং হবে মেগালো...' দ্বিধা নিয়ে থেমে গেল মানামি। বেশি বলে ফেলল কি না ভাবছে।

মিষ্টি করে হাসল অ্যানি ল্যামবার্ট, কিন্তু চোখ থেকে ঝরছে কালকূট। 'তোমাকে ছেড়েই বেসে চলে গেল নাসিম?' মানামির

সামনে থামল সে, টিটকারির সুরে বলল, 'নাসিমের সঙ্গে দেখা হলে ওকে বোলো, যদি বেশি ব্যস্ত না থাকে, ওর স্ত্রী ওর সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

প্রায় মার্চ করে হাই হিলের গটমট আওয়াজ তুলে করিডোরে বেরিয়ে গেল অ্যানি ল্যামবার্ট।

বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল মানামি, চোখ পড়ল রানার বিছানায়। দুশ্চিন্তা নিয়ে ভাবল, কোথায় গেল অসুস্থ মানুষটা?

নেভাল বেসে পৌঁছুল মানামি নয়টা পাঁচ মিনিটে।

মেইন গেট থেকেই বলে দেয়া হলো, মিটিঙের ভেনিউ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গ্রাউণ্ডের একপাশে ওয়্যারহাউস ডি-তে।

ওখানে পৌঁছে মানামি দেখল, শুরু হয়ে গেছে মিটিং।

ডি বা ডেথ ওয়্যারহাউসে রয়েছে রেফ্রিজারেটেড স্টোরেজ হোল্ড। আগে রাখা হতো আমেরিকাগামী মৃত সৈনিকদের লাশ। আপাতত তিন সারি সার্জিকাল বাতির নীচে পড়ে আছে অর্ধেক খাওয়া পুরুষ মেগালোডন।

কুলারে ঢুকবার আগে এক সৈনিক সাদা কোট দিয়েছে মানামিকে।

মেগালোডনের লাশের পাশে ফেলা হয়েছে কনফারেন্স টেবিল।

ডাক্তার ফিল ম্যাককমন, চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড, ডক্টর নাসিম আহমেদ ও কমাণ্ডার ফিলিপ গোল্ডম্যান একপাশে বসেছেন। টেবিলের আরেক দিকের তিনজনকে চিনতে পারল না মানামি। একজন বোধহয় ফরাসি, অন্য দু'জন জাপানি, গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে হাঙরের মস্ত চোয়াল।

'মিস্টার রানা কোথায়?' প্রায় ঘেউ করে উঠল ম্যাককমন।

'জানি না, হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছেন,' বলল মানামি।

'হয়তো পালিয়েই গেছে,' মন্তব্য করল ম্যাককমন।

'সে আপনার মত নয়,' জাপানি দুই ভদ্রলোকের পাশের চেয়ারে বসল মানামি।

'পরিচয় করিয়ে দিই, মানামি, ইনি কমাণ্ডার ফিলিপ গোল্ডম্যান,' বলল হ্যারল্ড ডেভিড।

'মিস সিনোসুকা, আমরা সত্যি দুঃখিত যে আপনার ভাই আর নেই,' বললেন কমাণ্ডার গোল্ডম্যান। 'ইনি মোঁসিউ দো টুহোনো, কুস্টো সোসাইটি থেকে এসেছেন। আর জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেণ্টার থেকে ডক্টর মরি ফুজিমোরি ও ডক্টর পাচাচুকে নাকেশোকে।' ফরাসি ভদ্রলোকের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল মানামি। 'আর ইনি মিস্টার ডন রে। স্থানীয় সরকারের তরফ থেকে গোটা ঘটনা কাভার করবেন তিনি।'

মোটা ভুরুওয়ালা সাংবাদিকের সঙ্গে অনিচ্ছা নিয়ে হ্যাণ্ডশেক করল মানামি। অবশ্য স্বাভাবিক স্বরেই বলল, 'আমি আপনাকে আগেও দেখেছি, মিস্টার রে। কোথায় দেখা হয়েছে?'

হাসল ডন রে। 'আমার ঠিক মনে পড়ে না, মিস সিনোসুকা। হাওয়াইয়ে বেশ কিছুদিন কাটাতে হয়েছে আমাকে। হয়তো...'

'না, হাওয়াই নয়,' লোকটার দিকে চেয়ে আছে মানামি।

'ঠিক আছে, জেণ্টলমেন এবং মিস সিনোসুকা, এবার মিটিং শুরু করা যাক,' দরাজ কণ্ঠে বললেন কমাণ্ডার গোল্ডম্যান। 'আমেরিকান সরকারের তরফ থেকে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ দুর্ঘটনা তদন্ত করে দেখতে হবে। আমার নীতি সবসময় খুব সরল: প্রশ্ন যা করার আমি করব, আপনারা জবাব দেবেন। এবার, প্রথমেই...' মস্ত হাঙরের লাশের দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। 'এবার কেউ বলুন ওটা আসলে কী।'

খুকখুক করে কাশলেন নাসিম আহমেদ, কিন্তু মুখ খুললেন না।

জাপানি দুই বৈজ্ঞানিকের ভিতর একজন বললেন, 'জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেন্টারের তরফ থেকে আমরা ওই দানবের দাঁত পরীক্ষা করেছি। তুলনা করে দেখা হয়েছে কারকারোডন মেগালোডনের সঙ্গে। ওরা ছিল প্রাগৈতিহাসিক শ্বেতহাঙর। ধারণা করা হয় কোটি কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু এখন বলতেই হচ্ছে, আজও সাগরে রয়ে গেছে ওরা। আমরা হতবাক হয়ে গেছি যে ওরা এখনও রয়ে গেছে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে।'

'আমরা জেনেছি ওরা আছে,' বলল মোঁসিউ দো টুহোনো। 'সবসময়ই রহস্য হয়ে ছিল কারকারোডন মেগালোডন। কিন্তু আঠারো শ' তেয়াত্তর সালে চ্যালেঞ্জার ওয়ান দশ হাজার বছরের পুরনো ফসিলাইয্‌ড্‌ দাঁত আবিষ্কার করে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ থেকে। এ থেকে আমরা জানি, ওরা কেউ কেউ আজও বেঁচে থাকতে পারে।'

'নেভি এখন জানতে চায়, এটার সঙ্গে নীচ থেকে আরও কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী উঠে এসেছে কি না,' বললেন কমাণ্ডার গোল্ডম্যান। 'ডক্টর ম্যাককমন?'

ডাক্তার ফিল ম্যাককমনের দিকে ঘুরে গেল প্রতিটি চোখ।

'কমাণ্ডার, আপনি জানেন, গভীর সাগরে এই হাঙর হামলা করেছে একটা সাবমারসিবলের পাইলটের উপর। এবং এটা করতে গিয়ে কেব্‌লে আটকে উইঞ্চের টানে উঠে এসেছে ওপরে। সঙ্গী যখন অসহায়, তখন তার উপর হামলা করেছে একই প্রজাতির আরও একটি হাঙর। ট্রপিকাল স্রোতে আটকা রয়েছে ওরা সাগরের অনেক নীচে। ছয় মাইল বরফ ঠাণ্ডা পানি ভেদ করে ওপরে উঠে আসতে পারবে না। ঈশ্বর জানেন, কত কাল ধরে ওরা ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে বন্দি। আপনারা এখন যে স্পেসিমেন দেখছেন, তা দুর্ঘটনাবশত উঠে এসেছে আমাদের জাহাজে।'

'তার মানে বলতে চাইছেন, এ ধরনের আরও মেগালোডন সাগরে আছে, কিন্তু তারা আটকা রয়েছে ট্রেঞ্চের ভিতর?' বললেন গোল্ডম্যান।

'ঠিকই ধরেছেন, কমাণ্ডার।'

'তা বোধহয় ঠিক নয়,' আপত্তির সুরে বললেন ডক্টর নাসিম আহমেদ।

সবাই চাইল ডক্টর নাসিমের দিকে।

এইমাত্র ওয়্যারহাউসে ঢুকেছে রানা। ম্যাককমনের শেষ দুই-চার কথা শুনতে পেয়েছে।

'আপনি একেবারেই ভুল ধারণা দিচ্ছেন, ডক্টর ম্যাককমন,' বলল রানা। ওর একহাতে সাদা কোট, অন্যহাতে খবরের কাগজ। ওর পিছনে আসছেন তামেশু সিনোসুকা।

'মিস্টার রানা, আপনি ভাবছেন যা খুশি বলবেন, আর...' শুরু করেছিল ডাক্তার ফিল ম্যাককমন।

'আপনি চুপ করে বসুন,' তাকে বাধা দিলেন তামেশু। 'আগে শুনে নিন মিস্টার রানা কী বলতে চান।'

উঠে দাঁড়িয়েছে মানামি, চেয়ার ছেড়ে চলে গেল বাবার সামনে, জড়িয়ে ধরল তাঁকে। কয়েক মুহূর্ত পর বাবাকে নিয়ে চলে এল টেবিলের পাশে। চেয়ারে বসল বাবা-মেয়ে। মানামির হাত ধরে রাখলেন তামেশু। মনে হলো ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছেন।

টেবিলের মাথায় চেয়ার টেনে বসল রানা।

'গতকাল রাতে স্থানীয় এক জেলেকে সঙ্গে নিয়ে সাগরে যাই আমি,' শুরু করল রানা। 'ওখানে এক হাম্পব্যাক তিমি মারা পড়েছিল। আমি চেয়েছিলাম ওটার লাশটা নিজ চোখে দেখতে। তাতে হয়তো বোঝা যাবে মেগালোডন হামলা করেছে কি না। আমরা যখন ওই তিমির পাশে পৌঁছলাম, তখনই সাগরের তলা থেকে উঠে এল একটা আটাশ ফুটি কিলার ওয়েইল, নিজেই

কিল্ড্। খুন করা হয়েছে ওটাকে। পেটের গোল ক্ষতটা ছিল বিশাল, ব্যাস কমপক্ষে দশ ফুট।'

'তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না,' বলে উঠল ম্যাককমন।

'আরও আছে,' বলল রানা। 'খবরের কাগজে চোখ রাখলেই দেখবেন, ওয়েক আইল্যাণ্ডের বাসিন্দারা অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখছে। সৈকতের উত্তরাংশে এসে জমছে একের পর এক তিমির লাশ। কমাণ্ডার, দ্বিতীয় মেগালোডন যে শুধু উঠে এসেছে তা নয়, নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ওটা অগভীর সাগরে চলে এসেছে।'

'পাগল হয়ে গেছেন আপনি!' প্রায় ধমকে উঠল ম্যাককমন। ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে।

'ডক্টর ম্যাককমন, দয়া করে বসুন,' প্রায় নির্দেশের সুরেই বললেন কমাণ্ডার গোল্ডম্যান।

'আপনি কিছু জানতে চাইলে ডাক্তারকে নয়, জিজ্ঞেস করতে পারেন ডক্টর আহমেদকে,' বলল রানা। 'উনি অন্যদের চেয়ে ঢের বেশি জানেন ওদের সম্পর্কে।'

ডক্টর নাসিমের দিকে চাইলেন কমাণ্ডার।

'বেশ, ডক্টর, বলুন ওটা কেন উঠে আসবে? ডক্টর ম্যাককমন মনে করছেন দানবটা রয়ে গেছে শীতল পানির নীচে উষ্ণ স্রোতে।'

'ওদের ওখানেই থাকার কথা,' বললেন নাসিম। 'কিন্তু রানার কাছে শুনেছি, ট্রেঞ্চের ভিতর এই মেগালোডনের উপর হামলা করেছিল আরেক মেগালোডন। হাইড্রোথার্মাল লেয়ার ছিল বিরানব্বুই ডিগ্রি উষ্ণ। শ্বেতহাঙরের আত্মীয় ওরা, চারপাশের সাগরের চেয়ে কমপক্ষে বারো ডিগ্রি বেশি উত্তপ্ত ওদের রক্ত। প্রথম মেগালোডনের লাশ টেনে তুলতে লাগল নিতু, কাজেই বাধ্য হয়ে উঠতে হলো অন্যটাকেও। লাশ খেতে খেতে উঠছিল। তখন মৃতদেহের উষ্ণ রক্ত ঘিরে রেখেছিল ওই ফিমেলটাকে।'

'ফিমেল?' বিস্মিত চোখে চাইল মোঁসিউ দো টুহোনো। 'আপনি জানলেন কি করে ওটা মাদি?'

'মাসুদ রানা ওটাকে দেখেছে,' বললেন নাসিম। 'ট্রেঞ্চের ভিতর সাবের উপরের পানিতে ভাসছিল। পুরুষ মেগালোডনের চেয়ে অন্তত বিশ ফুট বড়।'

যা শুনছেন ভাল লাগছে না কমাণ্ডার গোল্ডম্যানের। গম্ভীর মুখে বললেন, 'ডক্টর, ওটার বিষয়ে আরও কিছু জানাতে পারেন?'

'রানা আমার চেয়ে ভাল বলতে পারবে,' বললেন নাসিম। 'যেহেতু নিজের চোখে দেখেছে।' রানার দিকে চাইলেন তিনি।

'গায়ের রং সাদাটে,' বলল রানা। 'শ্বেতী রোগ হলে যেমন দেখায়— অ্যালবিনো। গা থেকে ম্লান আলো বেরুচ্ছিল। গভীর সাগরে আঁধার পরিবেশে ওদেরকে ওই রং দিয়েছে প্রকৃতি।'

নাসিমের দিকে চাইল রানা, 'আপনি বলুন, নাসিম ভাই। এসব আমার তেমন আসে না।'

'ওদের চোখ অতি সংবেদনশীল, জোরালো আলো পড়লে অন্ধও হয়ে যেতে পারে,' বললেন নাসিম। 'দিনের আলোয় ওপরে উঠবে না। আর সে কারণেই নিতু থেকে কেউ দেখেনি ওটাকে। আলো থেকে সরে থেকেছে। কিন্তু যেহেতু তীরের কাছে চলে এসেছে, ওটা আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে।'

'কেন ভাবছেন এমন?' প্রথমবারের মত মুখ খুললেন ডক্টর পাচাচুকে নাকেশোকে।

'ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে খুবই কম ছিল অক্সিজেন, কিন্তু অগভীর সাগরে এই জিনিসটার অভাব নেই। যতই অক্সিজেন পাবে, আরও দক্ষ হয়ে উঠবে মেগালোডনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তরতাজা অক্সিজেন পেলেই শক্তি বাড়বে। কাজেই ঘুরবে বেশি, লাগবে বেদম খিদে। আর আপনারা তো জানেনই, উপরের সাগরে খাবারের কোনও অভাব নেই।'

মুখ কালো হয়ে গেছে কমাণ্ডার গোল্ডম্যানের। 'উপকূলের মানুষের উপর হামলা করতে পারে।'

'তা বোধহয় করবে না, কমাণ্ডার,' বললেন নাসিম। 'তীরের খুব কাছে আসবে না। প্রকাণ্ড আকার ওটার। আপাতত ছোট সব হাঙর বা মাঝারি তিমি শিকার করছে। নিয়মিত সাগরে পাল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে তিমিরা, কিন্তু ওই মেগালোডনের কারণে বদলে যাবে ওদের আচরণ।'

'কেন?'

'মনে রাখতে হবে কারকারোডন মেগালোডন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে হিংস্র ও সবচেয়ে দক্ষ শিকারি। আগে কখনও এমন ভয়ঙ্কর খুনি ছিল না এ গ্রহে। উষ্ণ রক্তের তিমির মাংস খেতে দারুণ লাগবে ওর। কাজেই পাগল হয়ে উঠবে খুনের নেশায়। আজকের হাঙর বা তিমিরা ওই দানব দেখেনি। তাদের বেশিরভাগের চেয়ে অনেক হিংস্র মেগালোডন, এবং বড়ও। তিমিদের সেটেশন পাল্টে যাবে। এখন ওরা আসে বেরিং সি-র দক্ষিণ থেকে, এবার শুরু হবে ইকোলোজিকাল বিপর্যয়। মেগালোডনের আবির্ভাবে প্রথমেই তিমির পালগুলো হাওয়াই উপকূল থেকে পালাতে শুরু করবে, হাজির হবে গিয়ে জাপান উপকূলে। বিনষ্ট হবে চারপাশের মেরিন ফুড চেইন। বাড়তি কয়েক হাজার তিমির কারণে টান পড়বে সব ধরনের ম্যামালের খাবারে। সাগরে প্রতিযোগিতা শুরু হবে যথেষ্ট প্লাঙ্কটন, ক্রিল ও শ্রিম্পের জন্যে। ফলে অন্য মাছের প্রজাতি খাবার পাবে না। খাবার না পাওয়ার কারণে তিমি বা অন্য মাছের প্রজনন ব্যাহত হবে। বছরের পর বছর ক্ষতিগ্রস্ত হবে ফিশিং ইণ্ডাস্ট্রি।'

ডক্টর মরি ফুজিমোরি এবং ডক্টর পাচাচুকে নাকেশোকে ফিসফিস করে আলাপ শুরু করেছেন জাপানি ভাষায়।

ডাক্তার ফিল ম্যাককমন, সাংবাদিক ডন রে এবং মোঁসিউ দো

টুহোনো ঝড়ের বেগে প্রশ্নবাণ ছুঁড়ছেন নাসিমকে লক্ষ্য করে।

'জেন্টলমেন, জেন্টলমেন!' উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন গোল্ডম্যান। কনফারেন্সে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। 'আমি আগেই বলেছি: প্রশ্ন যা করার আমি করব। ডক্টর আহমেদ, আগে জানতে হবে আমি পরিস্থিতি বুঝতে পেরেছি কি না। প্রাথমিকভাবে বুঝলাম: আপনার দৃঢ় বিশ্বাস ভয়ঙ্কর এক ষাট ফুটি শ্বেতহাঙরের কারণে বিপর্যয় ঘটতে চলেছে সাগরে। ফলে সরাসরি কয়েকটা দেশের ফিশিং ইণ্ডাস্ট্রি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ...আমি কি ঠিক বলছি, ডক্টর আহমেদ?'

'মোটামুটি তা-ই।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল ডাক্তার ফিল ম্যাককমন। 'তামেশু-স্যান, আমি চললাম। যথেষ্ট বাকওয়াজ শুনেছি। সেটেশন পাল্টে যাবে? কাউকে অপমান করতে চাই না, কিন্তু কমাণ্ডার, আপনি আলাপ করছেন এমন এক লোকের সঙ্গে, যে কি না তিনবছর আগে গভীর সাগরে নেমে মেরে ফেলেছে তার সঙ্গীদেরকে কল্পনার দানব দেখে। আপনাদেরই দুই অফিসার খুন হয়েছিল। হ্যারল্ড, এসো, এখানে সময় নষ্ট করছি। জাহাজে ফিরব এবার।'

'এক্সকিউয মি,' বলে চেয়ার ছাড়ল হ্যারল্ড ডেভিড, ডাক্তার ম্যাককমনের পিছনে রওনা হলো দরজা লক্ষ্য করে।

ম্যাককমনের কথাগুলো শুনে হতবাক হয়ে গেছেন নাসিম।

'নাসিম ভাই, ফালতু কথায় কান দেবেন না,' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

কাত হয়ে বসে নোটবুকে খসখস করে কলম চালাচ্ছে ডন রে।

মেয়ের কানে কী যেন বললেন তামেশু সিনোসুকা।

উঠে দাঁড়িয়ে বাবার গালে চুমু দিল মানামি, তারপর জাহাজের দুই ক্রুর পিছু নিল।

'কমাণ্ডার,' গলা পরিষ্কার করে বললেন নাসিম, 'আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি...'

'ডক্টর আহমেদ, নিশ্চয়তা চাইছি না,' বললেন গোল্ডম্যান, 'আমাদেরকে জানতে হবে কী করা উচিত। এই পরিস্থিতিতে কী করতে পারে ইউনাইটেড স্টেটস নেভি?'

'আপনাদের কিছু করতে হবে কেন?' বললেন ফরাসি মোঁসিউ দো টুহোনো। 'আপনারা আবার কবে থেকে মাছের আচরণ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছেন?'

'আর ওই হাঙর যদি ছোট বোট বা স্কুবা ডাইভারদের উপর হামলা করে? তখন কী হবে, মিস্টার টুহোনো?' তেড়া সুরে জানতে চাইলেন গোল্ডম্যান।

'ডক্টর আহমেদ,' বললেন পাচাচুকে নাকেশোকে, 'যদি ওই দানব পাল্টে দেয় জাপানের উপকূলের তিমির মাইগ্রেশন প্যাটার্ন, গোটা দেশের ফিশিং ইণ্ডাস্ট্রি মস্ত ক্ষতির মুখে পড়বে। সমস্ত দায় দায়িত্ব এসে চাপবে জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেন্টার এবং সিনোসুকা ইন্সটিটিউটের উপর। এমনিতেই ইউনিস প্রোগ্রাম বাতিল করে দেয়া হয়েছে, এ মুহূর্তে আরও বড় আর্থিক ক্ষতি আমাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। কাজেই জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেন্টারের তরফ থেকে বলছি: যেভাবে হোক খুঁজে বের করে ধ্বংস করে দিতে হবে ওই দানবকে।'

'ডক্টর আহমেদ,' বললেন কমাণ্ডার গোল্ডম্যান। 'আমি মিস্টার পাচাচুকে নাকেশোকের সঙ্গে একমত। আমার মনে হয় না প্রকৃতি চেয়েছে গভীর ওই খাদ থেকে উঠে আসুক ওরা। বৈজ্ঞানিক গবেষণার নামে এ-কাজ আপনারা করেছেন। এখন যতই নিশ্চয়তা দেন না কেন, আমরা কোনও ঝুঁকি নিতে পারি না। ব্যাপক ক্ষতি করার আগেই ওটাকে শেষ করতে হবে। এরই ভেতর মারা গেছে একজন।' কয়েক মুহূর্ত থামলেন তিনি,

তারপর বললেন, 'লাশের ভিড় শুরু হওয়ার আগেই ওটাকে খতম করা জরুরি। তাই ভাবছি, ওই খুনিকে শেষ করতে হাওয়াইতে আমার অধীনস্থ কোনও সিনিয়র অফিসারকে দায়িত্ব দেব নটিলাস নিয়ে ওটাকে খুঁজে বের করে মারতে।'

'আপনারা যদি এসব করেন, কুস্টো সোসাইটি থেকে প্রতিটা অ্যানিমেল রাইট গ্রুপকে জানিয়ে দেব আমরা,' হুমকির সুরে বললেন মোঁসিউ দো টুহোনো। 'আগামীকাল থেকে আপনাদের ওয়াহু নেভাল বেসে পিকেটিং শুরু করছি আমরা।'

'নাসিম-স্যান,' বললেন তামেশু, 'আপনার কী মনে হয়, কোন্ দিকে যাবে মেগালোডন?'

'আঁচ করা কঠিন,' বললেন নাসিম। 'তবে খাবারের কাছ থেকে সহজে সরতে চাইবে না। সমস্যা হচ্ছে, এই হেমিস্ফিয়ারে বছরের এ সময়ে চারটে ওয়েইল মাইগ্রেশন প্যাটার্ন থাকে। জাপানের পশ্চিমে একটা। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও ফার ইস্টের পুবে ও পশ্চিমে দুটো। আরেকটা ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল ধরে। আপাতত মনে হচ্ছে ওটা চলেছে হাওয়াই-এর পুবে। মনে হচ্ছে, আরও পুবে যাবে ও, তারপর পৌঁছে যাবে ক্যালিফোর্নিয়ার সাগরে। ...না, একমিনিট!'

'বলুন, ডক্টর?' ঝুঁকে এলেন কমাণ্ডার গোল্ডম্যান।

'গতকাল হাসপাতালে কথাটা বলেছিল রানা, বোধহয় একটা উপায় আছে,' বললেন নাসিম। চট্ করে চাইলেন তামেশু সিনোসুকার চোখে। 'বলতে পারেন কবে তৈরি হবে সিনোসুকা লেগুন?'

'আরও দু' সপ্তাহের কাজ বাকি ছিল, কিন্তু এমন সময় ইউনিস সিস্টেম নষ্ট হতেই ফাণ্ড দেয়া বন্ধ করেছে জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেন্টার। নাসিম-স্যান, আপনারা কি ভাবছেন মেগালোডনকে আটকে ফেলবেন লেগুনে?'

'কেন নয়?' রানার দিকে চাইলেন নাসিম।

'ওই লেগুন ডিজাইন করা হয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশে তিমি স্টাডি করার জন্য, মেগালোডন ওখানে থাকলে ক্ষতি কী?' বলল রানা।

মনে হলো প্রাণ ফিরে পেলেন তামেশু, চাইলেন জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেন্টারের ডিরেক্টরদের দিকে।

'জেন্টলমেন, একবার ভাবুন আমরা সবাই স্টাডি করতে পারব ওই শিকারি মাছ!'

'সিনোসুকা-স্যান,' বললেন পাচাচুকে নাকেশোকে, 'এ কি সম্ভব হবে?'

'সম্ভব, নাকেশোকে-স্যান,' মাথা দোলালেন তামেশু। 'তবে আগে খুঁজে পেতে হবে ওটাকে। তার আগে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে লেগুনের। নতুন করে তৈরি রাখতে হবে নিতুকে। আমরা যদি ওই দানবকে খুঁজে নিতে পারি, ট্র্যাংকুইলাইযার দিয়ে অজ্ঞান করতে পারব। তারপর টেনে নেব লেগুন পর্যন্ত।'

'তামেশু-স্যান,' বাধা দিলেন নাসিম। 'আমরা যদি ওকে বাঁচাতে চাই, আগে লাগবে ভাসমান বয়া দিয়ে তৈরি হার্নেস। নইলে টেনে নিয়ে যাওয়া যাবে না মেগালোডন। মনে রাখতে হবে তিমির মত ভাসে না হাঙর। একবার ঘুম পাড়িয়ে দিলেই টুপ করে ডুবে মরবে।'

'এক্সকিউয মি,' মাঝখান থেকে বলল ডন রে, 'বলতে পারেন কেন হাঙর ভাসে না?'

প্রথমবারের মত লোকটার দিকে চাইলেন নাসিম। 'হাঙর আসলে সাগরের পানির চেয়ে ভারী। সাঁতার বন্ধ করলে তলিয়ে যাবে।' গোল্ডম্যানের দিকে চাইলেন নাসিম। 'এই ভদ্রলোক এখানে কেন, কমাণ্ডার?'

'ঘণ্টাখানেক আগে কীভাবে যেন জেনে গেছে স্থানীয়

অফিশিয়ালরা, উপকূলে এসে হাজির হয়েছে জ্যান্ত আরেকটা মেগালোডন। এক অফিশিয়ালের অনুরোধে স্থানীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক রাখতে আলোচনায় বসতে দেয়া হয়েছে মিস্টার রে-কে।'

জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেণ্টারের ডক্টর মরি ফুজিমোরি ও ডক্টর পাচাচুকে নাকেশোকে ফিসফিস করে নিজেদের ভিতর আলাপ করছেন।

কয়েক মুহূর্ত পর বললেন ডক্টর পাচাচুকে নাকেশোকে, 'তামেশু-স্যান, আপনি ওই দানবের কারণে এরই ভেতর ছেলেকে হারিয়েছেন। কিছু মনে করবেন না, আপনি কি ওই রাক্ষুসীটাকে সত্যিই ধরতে চান? তাই যদি হয়, আমরা আপনার লেগুনের জন্যে ফাণ্ড দেব। অবশ্য বলে রাখি, যদি সফল হন, জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেণ্টারের অধিকার থাকবে মেগালোডনের উপর। আমরা লেগুনের টুরিযমের ফিন্যানশিয়াল শেয়ার চাইব।'

চুপ করে আছেন তামেশু সিনোসুকা, দুই চোখে টলটল করছে অশ্রু। আস্তে করে মাথা দোলালেন। 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় এটাই চাইত টয়োডা। অন্তর দিয়ে চাইত ও বিজ্ঞানের প্রসার হোক। কখনও চাইত না প্রাচীন এক প্রজাতির প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাক।' রানা ও নাসিমের দিকে চাইলেন তিনি। মনে হলো অনুরোধ করবেন। সত্যিই তাই করলেন তিনি, 'নাসিম-স্যান, রানা-স্যান, আপনারা ধরুন ওই মেগালোডনকে, প্লিজ।'

ইতিমধ্যে রানার পরিচয় জেনেছেন তামেশু ডক্টর নাসিমের কাছ থেকে। অবশ্য রানার অনুমতি নিয়েই কিছুটা রেখেঢেকে ওর পরিচয় জানিয়েছেন তিনি। সব শুনে রানার যোগ্যতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আর তাঁর।

আলোচনায় যোগ দিলেন কমাণ্ডার গোল্ডম্যান, 'মিস্টার

তামেশু, মিস্টার রানা, ডক্টর্স, নেভির তরফ থেকে এটুকু বলতে পারি, আমরা আপনাদের কাজে সহায়তা দেব না। নটিলাসকে পাঠানো হবে আমেরিকানদের জীবন রক্ষা করতে। অর্থাৎ, আমরা চাইব দেখা মাত্র ওই দানবকে হত্যা করতে। আপনারা যদি আমাদের আগেই ওটাকে আটক করতে পারেন, ভাল। ব্যক্তিগতভাবে আমি চাইব, আপনারা যেন ওই হাঙরকে ধরতে পারেন। কিন্তু অফিশিয়ালি, নেভি চাইবে খুনি ওই মেগালোডনকে ধ্বংস করতে।' উঠে দাঁড়ালেন কমাণ্ডার ফিলিপ গোল্ডম্যান। বুঝিয়ে দিয়েছেন, আপাতত মিটিং শেষ।

'একটা প্রশ্ন,' রানা ও নাসিমের দিকে চাইলেন কমাণ্ডার। 'আপনারা কেন ভাবছেন ওই হাঙর ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে যাবে?'

'কারণ, আমরা জানি, এ-মুহূর্তে বেরিং সি'র দক্ষিণ থেকে মেক্সিকোর বাজা পেনিনসুলার দিকে চলেছে বিশ হাজার তিমি,' বললেন ডক্টর নাসিম। 'মেগালোডন স্পষ্ট শুনতে পাবে তাদের হৃৎপিণ্ডের অবিরাম স্পন্দন।'

চোদ্দ

নেভাল বেস থেকে বেরিয়ে ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল ডন রে। যোগাযোগ করতে চাইছে এক স্থানীয় হোটেলের অতিথির সঙ্গে। নারী কণ্ঠ শুনেই বলল, 'অ্যানি, আমি ডন রে। ...হ্যাঁ, মিটিঙে ছিলাম। ম্যাক্সকে বোলো কাজের কাজ করেছে। ...হ্যাঁ, তুমি যা জানতে চেয়েছ সবই জেনেছি।'

'মেগালোডন ধরবে!' ফুঁসছে ডাক্তার ম্যাককমন। 'তামেশু-স্যান, আপনি এসব কী বলছেন? ওরই জোড়াটা খুন করেছে টয়োডাকে! ওটা একটা রাক্ষুসী! ওটাকে ধরতে যাওয়া মানেই মস্ত ভুল করা! এক্ষুনি ধ্বংস করা উচিত! যত দেরি হবে ততই প্রাণ নষ্ট হবে!'

ম্যাককমনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তামেশু। চেয়ে আছেন প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জ্বলজ্বলে সূর্যের প্রতিবিম্বের দিকে। নোনা হাওয়ায় বুক ভরে নিলেন তিনি, চোখ বুজে ফেলেছেন ধ্যানী সাধকের মত।

চরকির মত নাসিম আহমেদের দিকে ফিরল ডাক্তার। 'এসব তোমার দোষ, আহমেদ! তোমাদের ভুলেই মারা পড়েছে টয়োডা! এবার আমাদের সবাইকে খুন করতে চাইছ!'

'ম্যাককমন!' ঘুরে দাঁড়ালেন তামেশু। তাঁর দুই জ্বলন্ত চোখ বিদ্ধ করল ডাক্তারের দু'চোখকে। 'এই প্রজেক্ট আমার, জাহাজটাও আমার, সিদ্ধান্ত যা নেয়ার আমিই নিয়েছি। আপনি হয় আমাদের সঙ্গে থাকবেন, নইলে আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি হাওয়াই দ্বীপে। আমি কি অবস্থাটা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি?'

গরম চোখে নাসিমের দিকে চাইল ম্যাককমন, তারপর চাইল তামেশু সিনোসুকার চোখে। 'আমরা ষোলো বছর ধরে বন্ধু, তামেশু-স্যান। আমার ধারণা এই লোকের কথা শুনে মস্ত ভুল করছেন আপনি। কিন্তু তারপরেও জাহাজে থাকতে চাই আমি, সাধ্যমত সাহায্য করব সবাইকে। এবং এসব করব শুধু আপনার ও মানামির জন্য।'

'সেক্ষেত্রে কাজ করতে হবে আহমেদ-স্যান ও রানা-স্যানের পাশে। মেগালোডন ধরবার টিমের নেতৃত্বে থাকছেন মাসুদ রানা। উনিই ক্যাপ্টেন, পাশে ডক্টর নাসিম আহমেদ। আপনি কি নিশ্চিত

ওঁদের সঙ্গে কাজ করতে পারবেন, ম্যাককমন?'

মেঝেতে চোখ রাখল ডাক্তার। 'কাজ আমি করব।' রানা ও নাসিমের দিকে চাইল। 'জাহাজের ক্রুদের প্রাণ বাঁচাতে আপত্তি নেই আমার।'

'গুড,' রানার দিকে ফিরলেন তামেশু। 'কখন মিটিং ডাকছেন আপনি?'

'পনেরো মিনিট পর,' বলল রানা। 'ডাইনিং রুমে।'

ওয়ার রুমে রূপান্তরিত হয়েছে ডাইনিং রুম। রানার পরামর্শে একদিকের দেয়ালে বিশাল মানচিত্র ঝুলাবার ব্যবস্থা করেছেন নাসিম আহমেদ। এতে পরিষ্কার বোঝা যাবে কোথায় চলেছে ওয়েইলগুলো। মানচিত্রের কিছু জায়গায় গেঁথে দেয়া হয়েছে লাল পিন। ওসব জায়গায় পাওয়া গেছে তিমির লাশ। ওই প্যাটার্ন খেয়াল করলে মনে হতে পারে মেগালোডনটা সোজা চলেছে উত্তর-পুবে হাওয়াইয়ান দ্বীপগুলোর দিকে। মানচিত্রের পাশেই ঝুলছে বড়সড় এক ডায়াগ্রাম। ওটা শ্বেত-হাঙরের শরীরের অ্যানাটমির চিত্র।

পাশাপাশি চেয়ারে বসেছে মানামি আর ওর বাবা তামেশু সিনোসুকা। দেয়ালে টাঙানো মানচিত্রের পাশে দাঁড়িয়েছে হ্যারল্ড ডেভিড ও বাড লিটলটন। সবার পর হাজির হয়েছে ডাক্তার ফিল ম্যাককমন।

'সবার সঙ্গে পরিচয় শেষ, বাড?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, প্রায় সবার সঙ্গে,' ডাক্তার ম্যাককমনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল লিটলটন।

করমর্দন শেষে ডাক্তার বলল, 'আপনি তা হলে হাঙর ধরার কাজে যোগ দিচ্ছেন?'

'সেটাই আমার বন্ধুর ইচ্ছে। আর মাসুদ রানার ইচ্ছাই আমার

ইচ্ছা।'

মুখটা প্যাচার মত হয়ে গেল ডাক্তারের।

সবার উদ্দেশে বলল রানা, 'প্রথম থেকেই বাডের কপ্টারে থাকব আমি, চেষ্টা করব ওপর থেকে মেগালোডনটাকে খুঁজে বের করতে। হনোলুলুতে আগামী কয়েক দিনের ভেতর প্রস্তুত থাকবে ট্র্যাঙ্কুইলাইযার হার্পুন ও হার্নেস। আমাদের প্রথম কাজ হবে হোমিং ডিভাইসের আওতায় ওটাকে নিয়ে আসা।'

'এত মস্ত মহাসাগরে নির্দিষ্ট একটা মাছকে কী করে খুঁজে পাবেন বলে ভাবছেন?' টিটকারির ভঙ্গিতে হাসল ম্যাককমন।

'এসব নিয়ে ভেবেছেন ডক্টর আহমেদ,' বলল রানা।

মানচিত্রের একজায়গায় টোকা দিলেন নাসিম। 'আপনারা ম্যাপ দেখলে বুঝবেন, বেরিং সাগর থেকে দক্ষিণে চলেছে অসংখ্য তিমির ছোট ছোট গ্রুপ। গুয়ামের পুব ও পশ্চিমে হাজার হাজার তিমির হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ পরিষ্কার শুনবে মেগালোডন। যেসব জায়গায় তিমিগুলোকে খুন করেছে, প্যাটার্ন দেখে বোঝা যায় গুয়ামের পুবে চলেছে ওটা। ভাবছে, হাওয়াই উপকূলীয় সাগরে তিমির পালের পাশেই থাকবে।'

তামেশুর দিকে চাইলেন নাসিম আহমেদ। 'ওটাকে লোকেট করা খুব সহজ হবে না। আমরা জানি, সেনসিটিভ চোখের কারণে দিনের আলো থেকে সরে থাকবে। তার মানে, রাতে শিকার করতে হবে তাকে। সাগরের উপর অংশে এসে তিমির পালে হামলা করবে। বাডের হেলিকপ্টারে আছে থার্মাল ইমেজার ও মনিটর, এসবের মাধ্যমে রানা বা বাড আঁধারেও পরিষ্কার দেখবে মেগালোডন ও তিমির পালগুলোকে। রানার সঙ্গে থাকবে শটগান ও নাইট-ভিশন বিনকিউলার। মেগালোডনের চামড়া থেকে বেরুবে ম্লান সাদা আলো, পরিষ্কার চোখে পড়বে ওপর থেকে।'

নাসিম থামলে রানা বলল, 'তা ছাড়া, একবার মেগালোডন

শিকার করতে শুরু করলে, খুনের চিহ্ন ধরে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতে পারব আমরা।'

একটা হোমিং ডার্ট উঁচু করে ধরলেন নাসিম। সঙ্গে রয়েছে ছোট ফ্ল্যাশলাইট আকারের ইলেকট্রনিক ডিভাইস। 'অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাইফেলের ব্যারেলে বসিয়ে দেয়া যায় এই ট্র্যান্সমিটার। যদি মেগালোডনের হৃৎপিণ্ডের খুব কাছে এই হোমিং ডার্ট গেঁথে দেয়া যায়, আমরা যে শুধু তাকে অনুসরণ করতে পারব তা নয়, ওটার পালসও মনিটর করতে পারব।'

'তাতে কী হবে?' জানতে চাইল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড।

'একবার মেগালোডনকে ট্র্যাঙ্কুইলাইয করলে নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই ওটার হৃৎস্পন্দন মনিটর করতে হবে। তা ছাড়া, ওটাকে বাঁচাতেও জিনিসটা কাজে লাগবে। হার্পুনের ফলায় থাকবে পেনটোবারবিটাল ও কেটামিন। পেনটোবারবিটালের কারণে ভয়ঙ্কর কমবে মেগালোডনের মগজের অক্সিজেন, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর কেটামিন হচ্ছে ননবারবিচুরেট জেনারেল অ্যানেসথেটিক। কিন্তু একবার দুই ড্রাগ কাজ শুরু করলে অনেক কমে আসবে মেগালোডনের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। পুরো নিশ্চিত হওয়া যাবে না ট্র্যাঙ্কুইলাইযার কাজ শুরু করলে ওটা কেমন আচরণ করবে।'

'কী ধরনের সাইড এফেক্ট হতে পারে?' জানতে চাইল ডাক্তার ম্যাককমন।

'পেনটোবারবিটালের ফলে প্রথমে খেপে যাবে মেগালোডন।'

'এ থেকে কী বুঝব?'

'ঘুমিয়ে পড়বার আগে ভীষণ রেগে গিয়ে ছোটাছুটি করবে।'

চিন্তিত হয়ে বলল ম্যাককমন, 'তামেশু-স্যান, আপনি শুনলেন আহমেদের কথা? এখনই এই...'

'কথা শেষ করতে দিন,' নাসিমের দিকে চাইলেন তামেশু। 'একবার যখন ট্র্যাঙ্কুইলাইযার ঘুম পাড়িয়ে দিল ওটাকে, কী ভাবে লেগুনে নেবেন, নাসিম-স্যান?'

'কাজটা খুবই কঠিন,' বললেন ডক্টর। 'নিতুর স্টার্নে থাকবে হার্পুন গান। দড়ির মত করে স্টিলের কেবল ব্যবহার করব উইঞ্চে। হার্পুন বেশিক্ষণের জন্য থাকবে না মেগালোডনের মাংসে, কাজেই দেরি না করেই ওটার নীচ দিয়ে ঘিরে ফেলতে হবে হার্নেস দিয়ে। হার্নেস জিনিসটা আসলে দুই শ' ফুট দৈর্ঘ্যের শক্ত, পুরু, মস্ত জাল। প্রতি বিশফুট দূরে দূরে থাকবে বয়া। ওই জাল ভাসিয়ে রাখবে মেগালোডনকে, এদিকে আমরা জাহাজ দিয়ে টেনে নেব ওটাকে লেগুনে। হার্নেস ঠিকভাবে আটকে নেয়া পর্যন্ত হার্পুন রাখা হবে মেগালোডনের মাংসে, তারপর সরিয়ে নেয়া হবে। এটা খুবই জরুরি। আমরা যদি মেগালোডনের মুখের ভিতর দিয়ে পানি পার করতে না পারি, ওটার গিলগুলো কাজ করবে না, ফলে অক্সিজেনের অভাবে মরবে প্রাণীটা।'

'কীভাবে জাল পাতা হবে, শুনি?' জানতে চাইল হ্যারল্ড।

'নিতুর স্টার্নে আটকে দেয়া হবে জালের একপ্রান্ত, অ্যাবিস গ্লাইডার ব্যবহার করে জালের অন্য প্রান্ত ওটার তলা দিয়ে ঘুরিয়ে আনবে রানা।'

চট্ করে রানার দিকে চাইল মানামি। 'রানা! তুমি আবারও সাগরে নামতে চাও? ওই রাক্ষুসী...

'মানামি, কাউকে না কাউকে...'

'না! আমার কথা শোনো!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মানামির কণ্ঠ 'তুমি মস্ত ভুল করতে যাচ্ছ! এভাবে জীবনের ঝুঁকি নেয়া যায় না! এরই ভেতর ভাইকে হারিয়েছি, আমি চাই না তুমিও... হঠাৎ থমকে গেল মানামি, বুঝে গেছে এরপর কী বলে বসত। কয়েক সেকেণ্ড পর বাবার দিকে চাইল ও। 'সরি, বাবা, আমি এসবের

সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছি না।'

বেশ আগ্রহ নিয়ে ডাইনিং রুম থেকে তাঁর মেয়েকে বেরিয়ে যেতে দেখলেন তামেশু। এবার রানাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'আসলে টয়োডার করুণ মৃত্যু আমাদেরকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। কাঁদারও সময় হয়নি আমাদের।' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু, নাসিম, অ্যাবিস গ্লাইডারে মিস্টার রানার কোনও বিপদ হবে না তো?'

নাসিম জবাব দেয়ার আগেই বলল রানা, 'আমরা মনিটর করব মেগালোডনের হৃৎস্পন্দন, সরাসরি যোগাযোগ রাখব নিতুর সঙ্গে। মেগালোডন জেগে উঠতে শুরু করলে হৃৎস্পন্দন পাল্টে যেতে থাকবে, ওটা হবে সতর্কসঙ্কেত। অ্যাবিস গ্লাইডার যথেষ্ট দ্রুতগামী সাবমারসিবল, বড় কোনও বিপদ দেখলে ওটা নিয়ে সরে যেতে পারব।'

'রানা হিরো হওয়ার জন্য কাজ করছে না, তামেশু,' বললেন নাসিম। 'ও সাগরে অ্যাবিস গ্লাইডার নিয়ে নামার আগেই জ্ঞান হারাবে মেগালোডন।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন তামেশু, চললেন মেয়েকে খুঁজে নিতে।

'আমার একটা প্রশ্ন আছে,' শ্বেতহাঙরের ডায়াগ্রামের সামনে থামল বাড লিটলটন। 'ডক্টর, আপনি বলেছেন হাঙরের হৃৎপিণ্ডের খুব কাছে বেঁধাতে হবে ডার্ট। কিন্তু জায়গাটা কোথায়?'

শ্বেত-হাঙরের মুখের কাছে হাত তুললেন নাসিম। 'মুখ থেকে শুরু করে গলা দিয়ে নামলে ইসোফেগাস, ওটা যেখানে পাকস্থলীর সঙ্গে মিশেছে, ঠিক সেখানেই হৃৎপিণ্ড। এটা শ্বেত-হাঙরের অ্যানাটমি— কেউ জানে না এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মেগালোডনও ঠিক এমনই হবে কি না। যদি ঠিক এখানে ডার্ট বিঁধিয়ে দেয়া যায়...' শ্বেত-হাঙরের তলপেট, ফুসফুসের

গিলগুলো এবং পেকটোরাল ফিনের মাঝে দেখালেন তিনি, 'আমার বিশ্বাস, এখানে পাব হার্ট। অচেতন করতে পারব।'

আস্তে করে মাথা দোলাল বাড। 'কিন্তু যদি ডার্ট মিস করি আমরা?'

হেলিকপ্টারের উইণ্ডশিল্ডে প্রতিফলিত হচ্ছে আকাশের মস্ত বড় চাঁদ, কেবিনের ভিতরটা সেই আলোয় আলোকিত।

গত চারঘণ্টা ধরে সাগরের ওপর তিরিশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে চক্কর কাটছে বাড লিটলটনের কপ্টার। প্রশান্ত মহাসাগরের দুই শ' ফুট উপরে ভাসছে ফড়িং। তিমির দুই ডজন পড চোখে পড়েছে, কিন্তু ওগুলোর আশপাশে মেগালোডনের কোনও চিহ্ন নেই।

গত কয়েক ঘণ্টায় উত্তেজনা মিলিয়ে গেছে বাড লিটলটনের। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে, সত্যিই বিরক্তিকর কাজ এটা। কবে মেগালোডন চোখে পড়বে তার কোনোই ঠিক নেই।

'খামোকা চক্কর দিতে দিতে খেপে যেতে পারি, শেষে হয়তো ক্র্যাশল্যাণ্ড করব সাগরে!' ইঞ্জিনের আওয়াজের উপর দিয়ে বলল বাড।

'ফিউয়েল কেমন আছে?' জানতে চাইল রানা।

'আর পনেরো মিনিট, তারপর ফিরতে হবে।'

'ঠিক আছে, আরেকটু যাওয়া যাক। ইলেভেন ও'ক্লক লক্ষ্য করে সামনে বাড়ো। ওদিকে হাম্পব্যাকদের একটা পড দেখেছি। দশমিনিট পর ফিরতি পথ ধরব।'

'তুমিই যখন বস্, কিছুই করার নেই; নইলে এক্ষুনি অ্যাবাউট টার্ন করে ফিরে যেতাম জাহাজে,' কোর্স পাল্টে ওদিকের পড লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল বাড।

আইটিটি নাইট মেরিনার জেন থ্রি বিনকিউলার সাগরের দিকে

ফেরাল রানা। বাইফোকাল নাইট গ্লাস ভেদ করছে ঘুটঘুটে আঁধার। সাগরের সামান্য আলোও উজ্জ্বল করে তুলছে। কোস্ট গার্ডের কাছ থেকে ধার নিয়েছে বাড লিটলটন অ্যাগেমা থার্মোভিশন ওয়ান থাউয্যাণ্ড ইনফ্রারেড থার্মাল ইমেজ।

কপ্টারের খুদে জাইরোস্ট্যাবিলাইযিং প্ল্যাটফর্মে বসে তিমির পালের ইমেজ ধরছে ওটা। কেবিনের ভিতর টেলিভিশন মনিটর, সঙ্গে ডিভিডি রেকর্ডার। পানিতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ধরতে তৈরি করা হয়েছে থার্মাল ইমেজারকে। সাগরে উষ্ণ দেহের যে-কোনও কিছু সহজেই মনিটরে লাল রঙে ধরা পড়বে। আরও লাল আরও একটু গাঢ় হবে মেগালোডনের দেখা পেলে।

চিন্তিত হয়ে পড়েছে রানা।

মেগালোডনকে দ্রুত খুঁজে বের করা জরুরি হয়ে উঠেছে।

প্রতি ঘণ্টায় কমপক্ষে বিশমাইল সরে যেতে পারে ওটা।

শেষে এভাবে চারদিকে খুঁজতে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠবে।

হয়তো সফিসটিকেটেড় ট্র্যাকিং ইকুইপমেন্ট দিয়েও খুঁজে পাওয়া গেল না! তখন?

ক্রমেই আরও ক্লান্ত হয়ে উঠছে রানা।

চাঁদের আলোয় সাগরের দিকে চেয়ে আছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর সে কারণেই চোখের কোণে আবছা সাদা আলো দেখেও কয়েক মুহূর্ত পর সচেতন হলো।

চাঁদের আলো পড়েছে সাগরে। মনে হলো ম্লান সাদা আলো এল ওখান থেকেই।

'কিছু দেখলে, রানা?' জানতে চাইল বাড।

'ঠিক বুঝলাম না। তিমির পালটা কই?'

'একটু সামনে। তিন শ' গজ।'

নাইট গ্লাস ব্যবহার করে তিমিগুলোকে খুঁজে বের করল রানা। 'দুটো মর্দা, একটা গাভী আর তার বাচ্চা... না, বাচ্চা

একটাই, কিন্তু গাভী দুটো। সবমিলে পাঁচটা। ওগুলোর উপর দিয়ে যাও, বাড।'

পডের সরাসরি উপরে চলে গেল হেলিকপ্টার।

আওয়াজের কারণে কি না বোঝা গেল না, হঠাৎ দিক পাল্টে উত্তরে চলল তিমির পাল।

'কী বুঝলে, দোস্ত?' জানতে চাইল বাড।

কুচকুচে কালো পানির দিকে মনোযোগ দিয়েছে রানা। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, 'ওই যে!'

দক্ষিণে ভেসে উঠেছে ম্লান সাদা ফ্যাকাসে এক আলো। জিনিসটা যেন মস্ত কোনও টর্পেডো।

মনিটরে চোখ রাখল বাড। 'সর্বনাশ! বিশ্বাস করা কঠিন! সত্যিই পাওয়া গেছে ওটাকে! ...এবার কী?'

বাডের দিকে চাইল রানা। 'মনে হচ্ছে তিমির বাচ্চাটার পিছু নিয়েছে।'

প্রশান্ত মহাসাগরের এক শ' ফুট নীচে জান কবজের ভয়ঙ্কর এক বিড়াল-ইঁদুর খেলা শুরু হয়েছে।

টের পেয়ে গেছে হাম্পব্যাকদের সোনার, মাইলখানেক পিছনে আসছে এক নিষ্ঠুর শিকারী।

কাজেই সংঘাত এড়াতে দিক পরিবর্তন করেছে তিমির পাল।

অ্যালবিনো দানবটা তেড়ে আসতেই বাচ্চাটাকে তাড়া দিল দুই স্ত্রী তিমি। সামনে ও পিছনে দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব দুই মর্দা হাম্পব্যাকের ওপর।

গতি কমিয়ে দিল মেগালোডন, দূর থেকে বৃত্ত কাটছে।

উষ্ণ রক্তের জানোয়ারগুলো তার চেয়ে বড়, এমনভাবে চলেছে, সরাসরি হামলা করতে পারবে না সে।

অগভীর পানিতে উঠে যাচ্ছে হাম্পব্যাকগুলো, খুব সতর্ক। নানা ভঙ্গিতে বোঝাতে চাইছে, দূর হোক অনাহূত প্রাণীটা।

একবার শাবক তিমিকে চক্কর কাটল মেগালোডন, বুঝে নিল সঠিক সময়ে কোথায় থাকবে ওটা।

এবার গতি তুলে পালের সামনের মর্দার নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেল মেগালোডন।

শত্রুকে ধাওয়া করল চল্লিশ টন ওজনের হাম্পব্যাক মর্দা। ওর দাঁত নেই, বদলে মাড়িতে রয়েছে শক্ত হাড়, কাছাকাছি গেলে হয়ে উঠতে পারে ভয়ানক বিপজ্জনক। মস্ত মাথা দিয়ে তলপেটে জুৎসই একটা গুঁতো দিলে মারাও পড়তে পারে মেগালোডন।

হঠাৎ করেই আরও জোরে শত্রুর দিকে তেড়ে গেল মর্দা হাম্পব্যাক।

কিন্তু ওর চেয়ে অনেক দ্রুতগামী মেগালোডন। আবারও চক্কর কাটতে শুরু করেছে গোটা পালকে ঘিরে।

'নীচে কিছু দেখলে, রানা?' জানতে চাইল বাড লিটলটন।

নাইট গ্লাস ব্যবহার করে কালো সাগরের দিকে চেয়ে আছে রানা। 'মনে হয় তিমিদের সর্দার তাড়িয়ে দিল মেগালোডনকে।'

'কী বললে?' হেসে ফেলল বাড। 'মর্দা তিমি তাড়িয়ে দিচ্ছে মেগালোডনকে? আর আমি ভেবেছি ওটা অকুতোভয় খুনি!'

কাস্টম ডিযাইন করা রাইফেলের ব্যারেলে ট্র্যাকিং ডার্ট ভরতে ব্যস্ত রানা, কাজের ফাঁকে বলল, 'ভুল ধারণা মাথা থেকে দূর করো। যে-কোনও সময়ে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে।'

মেগালোডনকে এড়াতে আবার দিক পাল্টাল তিমির পাল। এখন চলেছে দক্ষিণ-পুবে।

মস্ত এক বৃত্ত তৈরি করছে মেগালোডন, আবার চলে যাচ্ছে দুই গাভীর খুব কাছে।

হাঙরটাকে মাঝপথে ঠেকাবে, ভাবল তিমিদের সর্দার। ঘুরে ওদিকে রওনা হয়ে গেল।

কিন্তু দেরি না করে পিছিয়ে গেল মেগালোডন। ভয় পেয়েছে এমন ভঙ্গি করে নিজের দিকে টেনে নিল সর্দারকে।

ভেঙে গেল তিমির পালের প্রতিরক্ষা ব্যূহ।

দলে ফিরবার জন্য বাঁক নিল মর্দা হাম্পব্যাক, আর ঠিক তখনই তার লেজের পাশে পৌঁছে গেল মেগালোডন। বেয়াল্লিশ হাজার পাউণ্ড ওজন হলে কী হবে, বিজলির মত গতি তার। উপরের চোয়াল সামনে বাড়ল, নীচে দেখা দিল নয় ফুট বৃত্তাকার খোলা মুখ। অসহায় হাম্পব্যাকের লেজের উপরের মাংসে ঘ্যাচ করে বসিয়ে দিল নয় ইঞ্চি লম্বা দাঁতগুলো।

কিছু বুঝবার আগেই উপড়ে এল বিশাল একচাকা মাংস। এতই ভয়ঙ্কর কামড়, খসে পড়ল হাম্পব্যাকের লেজ। থরথর করে কাঁপছে হাম্পব্যাক, চারপাশ ভরে গেল হাহাকারে। ব্যথা ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারছে না নিরীহ দানব।

'আরে, ওখানে কী ঘটছে?'

'পরিষ্কার দেখছি না,' বলল রানা। চোখে নাইট গ্লাস। 'তবে মনে হয় হাম্পব্যাকের লেজ ছিঁড়ে ফেলেছে মেগালোডন।'

'তা কি সম্ভব?'

'তিমির পালের কথা ভুলে যাও, ওটার সর্দারের সঙ্গে থাকো।'

সামনে বাড়তে গিয়ে হিমশিম খেল লেজহীন মর্দা হাম্পব্যাক। ক্ষত থেকে গলগল করে বেরুচ্ছে রক্ত। দু'পাশের ফ্লিপার ব্যবহার করে এগুতে চাইছে। কিন্তু প্রথম হামলার চেয়ে ঢের ভয়ঙ্কর হলো পরের হামলা, সামনে থেকে এল মেগালোডন— ন' ইঞ্চি দাঁতগুলো ব্যবহার করে মৃত্যুপথযাত্রী হাম্পব্যাকের গলার বড় এক অংশ ছিঁড়ে নিল ওটা।

সাগরের ঢেউয়ে ভাসছে অসহায় হাম্পব্যাক। চিৎকার করে কাঁদছে করুণ সুরে। ভীষণ ভয় পেয়েছে তার দলের সবাই,

পালিয়ে যাচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব।

ওদের পিছনে গেল না মেগালোডন। ঘায়েল হয়েছে মস্ত হাম্পব্যাক, আরাম করে গরমা-গরম রক্ত ও নরম মাংস খেতে শুরু করেছে ওটা। কোনদিকে খেয়াল নেই। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর টের পেল, উপর থেকে আসছে কীসের যেন জোর কম্পন।

'কী বুঝলে, রানা?' জানতে চাইল বাড লিটলটন।

আপনমনে মাথা নাড়ল রানা। 'বোঝা কঠিন, সাগরে পড়ছে গ্যালন-গ্যালন রক্ত। তোমার থার্মাল ইমেজার কী দেখাচ্ছে?'

'কিছুই না। সাগরে ছড়িয়ে পড়েছে রক্ত। এতই উষ্ণ, অন্য ইমেজ ধরবে না। কিছু দেখতে হলে আরও কাছে যেতে হবে।'

'খুব কাছে যেয়ো না। হামলা করতে পারে মেগালোডন।'

'ভেবো না। ঠিকভাবে ডার্ট বেঁধাতে হবে না?' সাগরের পঞ্চাশ ফুট উপরে চলে এল বাড। 'দেখো তো, এবার আগের চেয়ে ভাল দেখা যায়?'

নাইট গ্লাসের ভিতর দিয়ে চাইল রানা।

ওটা আর্মির জন্য তৈরি নয়, ব্যবহার করবে বেসামরিক লোক, কাজেই নিখুঁত করবার চেষ্টা করা হয়নি।

মেগালোডনের সাদা ত্বক দেখল রানা। চারপাশে ছড়িয়ে যাওয়া রক্তের ভিতর ওটা তৈরি করেছে ম্লান আলো।

হাতে রাইফেল নিল রানা। এবার হাঙরের মাংসে বিঁধিয়ে দেবে ডার্ট। পরে অনুসরণ করবে ফ্রিগেট নিতু।

কিন্তু দেখতে না দেখতে তলিয়ে গেল মেগালোডন।

'যাহ্!'

'কী হলো, রানা?'

'ডুব দিল। আমরা ওর শিকারের খুব কাছে, বোধহয় ভয় পেয়েছে। অথবা কপ্টারের আওয়াজে বা বাতাসে চমকে গেছে।'

নীচের সাগরে চোখ বোলাল রানা। কালো ছায়ার মত ভাসছে মৃত হাম্পব্যাক, ছড়িয়ে পড়েছে নাড়িভুঁড়ি।

মেগালোডন নেই আশপাশে।

'বাড, কেমন অস্বস্তি লাগছে,' বলল রানা। 'ওপরে ওঠো।'

'ওপরে? কেন?'

'বাড, দেরি কোরো না!'

কথাটা মাত্র বলেছে রানা, ঠিক তখনই সাগর ভেদ করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইলের মত সাগর থেকে ছিটকে উঠল মেগালোডন। এত দ্রুত উঠছে, সঠিক সময়ে হেলিকপ্টার সরাতে পারবে না বাড লিটলটন।

সিট থেকে হড়কে গেছে রানা। জি ফোর্সের কারণে মেঝেতে পিছলে গেল ডান পা।

ব্যস্ত হয়ে কপ্টার উপরে তুলছে বাড।

খোলা দরজা দিয়ে পড়েই যাচ্ছিল রানা, কিন্তু বুক-পেট আটকে রেখেছে সিট-বেল্ট। একটু নীচে খোলা গ্যারাজের সমান মস্ত এক মুখ দেখল ও, ওটা উঠে আসছে ওদের গিলে নিতে।

বিকট, রক্তাক্ত দাঁতগুলো মাত্র পাঁচ ফুট নীচে!

রানা যেন স্লো মোশনে সিনেমা দেখছে: মেগালোডনের উপরের চোয়াল সামনে বেড়ে গেল, গোলাকার মুখের ভিতর স্পষ্ট দেখা গেল খয়েরি মাড়ি ও রক্তমাখা সাদা দাঁত।

এতই কাছে, ডানপায়ে লাথি মারতে পারবে রানা।

কপ্টারের বাইরে ঝুলছে ও, বুক শুকিয়ে গেছে ভয়ে।

ঝট্‌ করে বুকের কাছে গুটিয়ে নিল দুই পা। বলের মত গোল হয়ে ঢুকে পড়ল ককপিটে।

ওর দুই পা যেখানে ছিল, সেখানে পৌঁছে গেল মেগালোডনের মুখ, এখনও উঠছে শ্বেত-মৃত্যু!

ষাট ফুট উচ্চতায় পৌঁছল কপ্টার, আর তখনই মেগালোডনের

চওড়া স্নাউট গুঁতো দিল কপ্টারের নীচে। ভীষণ কাত হয়ে গেল কপ্টার, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে গেল আরেক দিকে। বনবন করে ঘুরতে শুরু করেছে কেবিন।

'একবার সাড়া দে, সোনা!' চেঁচিয়ে উঠল বাড লিটলটন। দুই হাতে শক্ত করে ধরেছে কন্ট্রোল স্টিক।

ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাংগেলে সাগরে পড়ছে কপ্টার, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর বাতাসে কামড় বসাতে পারল প্রকাণ্ড রোটরগুলো। সাগরে আছড়ে পড়বার পাঁচ সেকেণ্ড আগে কপ্টারের নাক উপরে তাক করতে পারল বাড, সাঁই করে আবারও উঠে গেল উপরে। মস্ত শ্বাস ফেলল, আরও উপরে উঠবার ফাঁকে বলল, 'রানা, মনে হয় আরেকটু হলে প্যাণ্টেই কাজটা হয়ে যেত!'

রানা নিচু স্বরে বলল, 'যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে অনেক বড়।'

'হ্যাঁ, কমপক্ষে ষাট ফুট,' বলল বাড। 'আমরা ছিলাম ওটার দৈর্ঘ্যের উচ্চতায়, সেসময় গুঁতো দিল। ...ডার্টের শট নিতে পেরেছ?'

'না।' হাতের রাইফেলের দিকে চাইল রানা। 'খেয়ালই ছিল না... একেবারে চমকে দিয়েছে। আরেক চক্কর দেয়ার ফিউয়েল আছে?'

'নেগেটিভ। নিতুকে রন্দিভু করতে বলছি রেডিয়োতে। তা হলে অনুসরণ করতে অসুবিধে হবে না।'

কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর নীরবতা ভাঙল বাড, 'একটা কথা, তোমার কি মনে হয়, তিনবছর আগে ওটাকেই ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে দেখেছিলেন ডক্টর নাসিম আহমেদ?'

'হতে পারে,' আস্তে করে বলল রানা।

পনেরো

পিঠ-উঁচু চামড়ার চেয়ারে অস্বস্তি নিয়ে সামনে ঝুঁকে বসল অ্যানি ল্যামবার্ট। কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়তে চাইছে না। বিমানে করে গুয়াম থেকে ফিরেছে বেশিক্ষণ হয়নি। এয়ারপোর্টে ওর জন্য অপেক্ষা করছিল ম্যাক্স ডোনোভানের লিমাযিন।

ওটাতে চড়ে সরাসরি টেলিভিশন স্টেশনে পৌঁচেছে। এখন বসে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠছে। রক্ত-চাপের কারণে টিসটিস করছে ঘাড়।

ফোনে কথা শেষ করছে না বব টেইলর। আরও কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়াল অ্যানি, ঝুঁকে গেল লোকটার ডেস্কের উপর, ঝট্ করে কেড়ে নিল তার মোবাইল ফোন। ওটা মুখের কাছে রেখে বলল, 'উনি পরে আবারও ফোন করবেন।' অফ করে দিল সেট।

'এটা কী হলো, অ্যানি? ...কী করলে?' রেগে গেল বব টেইলর। 'আমি জরুরি আলাপ করছিলাম, আর তুমি...'

'জরুরি না কচু, কথা বলছিলেন আপনার অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে। সত্যি যদি টাকা চান, তো আমার কথা শুনুন।'

পরের তিরিশ মিনিট মেগালোডন বিষয়ে বলে গেল অ্যানি, আর চুপচাপ শুনল স্টেশন ম্যানেজার।

স্বর্ণকেশীর কথা শেষে বলল, 'এ তো মস্ত ঘটনা, অ্যানি! ঠিক জানো, ডন রে সব তথ্য দিতে পেরেছে?' চামড়ার চেয়ারে আরও আরাম করে বসল টেইলর। 'কিন্তু বুঝবে কীভাবে তোমার স্বামী

ভুল করছে না? ওই দানব অন্য দিকেও যেতে পারে।'

'বব, ওই লোককে শীঘ্রিই আলাক দেব, কিন্তু এটা পরিষ্কার জানি, মস্ত সব হাঙরের বিষয়ে অন্যদের চেয়ে অনেক ভাল জানে ও। গত তিন বছর ধরে স্টাডি করছে ও এই বিষয়ে। এটা হবে এ শতাব্দীর অন্যতম সেরা কাহিনি।' আভাস পাওয়া মাত্র সমস্ত টিভি ঝাঁপিয়ে পড়বে গুয়ামে। আমাকে ওখানে যেতে দিন, বব, আমি আপনাকে তুলে দেব এই স্টেশনের সেরা পদে। এমন এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট করব, আপনাকে আর আমাকে নিয়ে হৈ-হৈ পড়ে যাবে।'

পটে গেছে স্টেশন ম্যানেজার বব টেইলর। 'ঠিক আছে, অ্যানি, নেটওঅর্কের সঙ্গে কথা বলছি। জরুরি ফাণ্ড পেয়ে যাবে। এবার বলো, আর কী কী লাগবে তোমার?'

দেড়ঘণ্টা পর লিমাযিনের পিছন-জানালায় টোকার আওয়াজ পেয়ে খবরের-কাগজ থেকে চোখ তুলল ম্যাক্স ডোনোভান।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি।

লক খুলে দিল ম্যাক্স।

টান দিয়ে দরজা খুলল অ্যানি, প্রায় ঝাঁপিয়ে উঠে গেল ম্যাক্সের কোলে। পাগলের মত চুমু দিতে শুরু করেছে প্রেমিকের ঠোঁটে। আট-দশটা চুমু দেয়ার পর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ম্যাক্স, জিতে গেছি! খুব পছন্দ করেছে ওরা আমার পরিকল্পনা! নেটওঅর্ক থেকে বলে দিয়েছে, যা লাগবে সব জোগাড় করে দেবে তারা!' আবারও ম্যাক্সকে চুমু দিতে শুরু করেছে অ্যানি, জিভ ভরে দিল প্রেমিকের মুখের ভিতর। কয়েক সেকেণ্ড পর ফিসফিস করে বলল, 'ম্যাক্স, এবার সত্যিকারের সুনাম আসছে, আমি হয়ে উঠব আন্তর্জাতিক তারকা। আর আমার পাশে থাকবে তুমি। এগযেকিউটিভ প্রোডিউসার ম্যাক্স ডোনোভান! তবে তার

আগে তোমার সাহায্য খুব দরকার আমার।'

অ্যানির চালাকিটা উপভোগ করছে ম্যাক্স, মৃদু হাসল। 'ঠিক আছে, ডার্লিং, বলো কী করতে হবে আমাকে?'

'প্রথমে, তোমার ইয়ট লাভ অ্যাট সি লাগবে। স্কেলিটন ক্রু-ও চাই। এরই ভিতর ক্যামেরামেন এবং এক সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। পরেরজন আগেও পানির নীচে কাজ করেছে। কাল সকালে সবাই লাভ অ্যাট সি-তে গিয়ে উঠব। প্লেক্সিগ্লাসের এক কোম্পানির সঙ্গে কথা বলেছে বব টেইলর, তারা দু'দিনের মধ্যে দারুণ এক জিনিস দেবে আমাকে।'

'প্লেক্সিগ্লাস?'

'সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ হবে আসলে টোপ জোগাড় করাটা। সেজন্য তোমার সাহায্য চাই, সোনা...' অ্যানির জিভ ঢুকে গেল ম্যাক্সের দুই ঠোঁটের মাঝ দিয়ে।

সকালে পার্ল হার্বারে পাঁচ শ' তেষট্টি ফুট দৈর্ঘ্যের স্প্রুয়্যান্স ক্লাস ডেস্ট্রয়ার ইউএসএস জর্জ বার্নির পাশে এসে নোঙর ফেলেছে ফ্রিগেট নিতু।

কমাণ্ডার ফিলিপ গোল্ডম্যান ব্যক্তিগতভাবে বার্থের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তামেশু সিনোসুকাকে।

নিতুর স্টার্নে তোলা হয়েছে মস্ত হার্পুন গান। সব দেখেশুনে নিচ্ছে ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন।

ডেকে দাঁড়িয়ে ডক্টর নাসিম আহমেদ, বাড লিটলটন ও রানা, দেখছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিডের কাজ। অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানের ব্যাটারি সিস্টেম দ্বিতীয়বারের মত পরখ করছে লোকটা।

অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান ছোট এবং সরু সাবমারসিবল। ওটাতে করে ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে নামতে পারবে না কেউ। এ জিনিস

তৈরি করা হয়েছে তুমুল গতি তুলবার জন্য। টর্পেডোর মত আকার। ওজন মাত্র চার শ' ষাট পাউণ্ড। একজন চালক ছাড়া আর কারও বসার জায়গা নেই। বেশিরভাগ ওজন নিয়ে নিয়েছে লেক্সান নোজ কোন্ আর ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল।

'ছোট জেট ফাইটারের মত দেখতে,' মন্তব্য করল লিটলটন।

'চালাতেও তেমনই,' বলল রানা।

'টয়োডা কি এরই একটার ভেতর ছিল, যখন...'

'না,' মাথা নাড়ল রানা।

'অ্যাবিস গ্লাইডার-টু আরও বড়, খোল অনেক পুরু, ভারীও বেশি,' বললেন নাসিম আহমেদ। 'আসলে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান প্রোটোটাইপ, নামতে পারে বড়জোর চার হাজার মিটার। খোল তৈরি করা হয়েছে নিখাদ অ্যালিউমিনিয়াম অক্সাইড দিয়ে। শক্তপোক্ত, কিন্তু ভাসতে পারে। দ্রুতগামী, দরকার হলে জায়গায় দাঁড়িয়ে চরকির মত ঘুরে যেতে পারে। পানি থেকে ছিটকে উপরে উঠতেও পারে।'

'তাই, ডক্টর?' বলল বাড, 'গতরাতে রানা আর আমি যে দানবকে লাফ দিতে দেখলাম, সেরকম পারে?'

গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন নাসিম। 'ওই হাঙরকে হারাতে হলে সত্যিকারের রকেট লাগবে।'

ওদের আলাপ শুনেছে হ্যারল্ড, এবার বলল, 'আমরা রকেটের মত জিনিসই দিচ্ছি।' চিফ ইঞ্জিনিয়ারের পাশে গিয়ে থামল রানা। 'মিস্টার রানা, ওই লিভার দেখছেন? ওটা যদি ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে অর্ধেক ঘুরিয়ে নিজের দিকে টান দেন, সাবমারসিবলের পিছনে হাইড্রোজেন ভরা ট্যাঙ্কে আগুন ধরবে। আগে কখনও অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানকে পানির উপরে ওঠার জন্য ব্যবহার করা হয়নি এই জিনিস। কিন্তু কাদায় কোথাও ফেঁসে গেলে চমৎকার কাজ করবে।'

'বার্ন কতক্ষণ হবে?' জানতে চাইল রানা।

'বড়জোর পনেরো বা বিশ সেকেণ্ড,' বলল হ্যারল্ড। 'ধরে নেয়া হয়েছে আগেই ফুরিয়ে গেছে সমস্ত পাওয়ার। ছাড়া পেলেই সিধে হয়ে উঠতে শুরু করবে সাব।' একটা রেঞ্চ তুলে নিল সে। একবার দেখল নাসিমকে, তারপর বলল, 'ডক্টর এসব জানেন, আরও কোনও প্রশ্ন থাকলে ওঁর কাছে জেনে নিতে পারেন, মিস্টার রানা।'

'রানা, দেখে যাও!' পোর্ট সাইড রেলিঙে বাড লিটলটন। দেখছে ব্যস্ত দুই টাগবোটকে। ওগুলো বার্থে এনে রাখবে সাবমেরিন নটিলাসকে। আক্রমণাত্মক চেহারার কালো জলযান, ডেকে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে একডজন ক্রু। দুনিয়ার প্রথম নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড সাবমেরিন, ধীরে ধীরে চলে আসছে নিতুর পাশে। কনিং টাওয়ারে দুই অফিসার।

ওদিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন ডক্টর নাসিম আহমেদ। বিড়বিড় করে বললেন, 'ফ্রেড স্কিলার!'

'বোধহয় আপনার প্রাক্তন সিও, নাসিম ভাই?' বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলালেন নাসিম।

'নেভির এক বন্ধুর কাছে শুনেছি, ডক্টর আহমেদ মেগালোডনকে ধরতে চাইছেন শুনেই ভলাণ্টিয়ার হয়েছে ফ্রেড স্কিলার,' বলল লিটলটন। 'কমাণ্ডার গোল্ডম্যানকে সে-ই বলেছে, নিতুর বিরুদ্ধে ওই টিনের ক্যান ব্যবহার করলে কেমন হয়।'

কড়া রোদে চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে ইউনাইটেড স্টেটস নেভির ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার। যেন জ্বলছে ধূসর চোখদুটো। নিতুকে পাশ কাটাল নটিলাস।

'লোকটার বোঝা উচিত, সাগরতল থেকে উঠে এসেছে মেগালোডন,' মন্তব্য করল বাড।

'উঠুক আর না উঠুক, স্কিলার আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না

কখনও,' বললেন নাসিম। 'তার ধারণা আমি ওর দুই অফিসারকে খুন করেছি।'

'তা হলে লোকটাকে নির্বোধ বলতে হবে,' বলল বাড। 'গতরাতে রানা আর আমি যা দেখেছি, তারপর বুক কাঁপবে না এমন লোক দুনিয়ায় নেই। আর এ কথা বলেওছি ডাক্তার ফিল ম্যাককমনকে।'

'কী বলেছে সে?' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নাসিম।

মাথা নাড়ল বাড। 'লোকটা আস্ত গাধা। ফ্রেড স্কিলার আর সে একই আবর্জনার তেলাপোকা।'

রানার দিকে চাইল বাড। 'আমাদের জাল আসছে কখন?'

'বিকেলে।'

'গতকাল যদি ওটাকে ধরে ফেলতে পারতাম,' আফসোস করল লিটলটন। 'আমাদের সুযোগ কমে আসছে।'

'আসলেই তাই,' সায় দিলেন নাসিম। 'আগামী কয়েক দিনে তিমির পালে আতঙ্ক তৈরি করবে মেগালোডন। পালাতে শুরু করবে সব তিমি। আর তাদের পিছু নেবে মেগালোডন, কেউ জানে না কোথায় যাবে। উপকূলে তিমির লাশ পেয়ে আমরা বুঝতে পারছি কাছেই আছে মেগালোডন, কিন্তু সত্যি যদি গভীর সাগরে চলে যায়, আর ওটাকে খুঁজে পাব না।'

'কিন্তু আপনি বা রানা বলেছেন, ওটা যাবে ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে,' বলল বাড।

'তাই করবে,' বললেন নাসিম। 'কিন্তু সেজন্য লাগতে পারে কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক বছর। কেউ জানে না ওই শিকারি মেগা কী করবে।'

দিগন্তে চেয়ে আছে রানা। একটু পর বলল, 'বাড, ওই মেঘগুলো দেখেছ? কী মনে হয়?'

পশ্চিমাকাশে চাইল লিটলটন। ওদিকে জড়ো হতে শুরু

করেছে ঝড়ের কালো মেঘ। আস্তে করে মাথা দোলাল সে। 'আকাশে কপ্টার তোলা যাবে না। আজ শিকার বন্ধ।'

'আকাশে মেঘ জমছে, কিন্তু ঠিকই শিকার খুঁজবে মেগালোডন,' মন্তব্য করলেন নাসিম।

পিয়ারে দাঁড়িয়ে আছে ডাক্তার ফিল ম্যাককমন। নটিলাসের ডেকে দুই ক্রু আটকে দিতে শুরু করেছে মোটা দড়ি।

কয়েক মুহূর্ত পর সামনের ডেকে এসে দাঁড়াল ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার। ডাক্তার ম্যাককমনের দিকে চেয়ে হাসল। কালো কনিং টাওয়ারে সাদা রঙে লেখা ৫৬২-র উপর চাপড় দিল।

'কেমন বুঝছেন আমার নতুন কমাণ্ড, ফিল?'

আস্তে করে মাথা দোলাল ম্যাককমন। 'অবাক হচ্ছি ওই পুরনো কেতলি এখনও ভাসে দেখে। হঠাৎ পঞ্চান্ন বছর পুরনো ডিকমিশন্‌ড্ সাবমেরিন সাগরে নামালেন যে কমাণ্ডার গোল্ডম্যান? তা-ও আবার বড় হাঙর শিকার করতে, ব্যাপার কী?'

খোলা গ্যাংওয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করেছে স্কিলার। 'বুদ্ধিটা আমার, ফিল। ঝামেলার ভিতর পড়ে গেছেন কমাণ্ডার। তাঁকে চেপে ধরেছে প্রেস। চাইলেও মাছ মারতে লস এঞ্জেলেস ক্লাস সাব নামাতে পারবেন না। এরই ভিতর নেভির পিছনে লেগে গেছে কুস্টো সোসাইটি, গ্রিনপিস, সবধরনের অ্যানিমেল রাইট অ্যাকটিভিস্ট এবং তাদের মা-বোন-নানীরাও। কিন্তু একেবারেই অন্য জিনিস নটিলাস। পাবলিক ভালবাসে পুরনো এই সাবমেরিনকে। প্রাচীন লড়াকু নায়ক সে, শেষ আরেকবার রুখে দাঁড়াচ্ছে শত্রুর বিরুদ্ধে। কথাটা পাড়তেই লুফে নিলেন গোল্ডম্যান। তারপর...'

'জানি না ঠিক হচ্ছে কি না,' বলল ম্যাককমন, 'আপনার বোধহয় ধারণা নেই কী করতে পারে ওই হাঙর, ক্যাপ্টেন।'

'রিপোর্টগুলো পড়েছি, ডক্টর। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, পুরো পাঁচ বছর ধাওয়া করেছি আমি রাশান আলফাগুলোকে? সে তুলনায় কিছুই নয় এই মিশন। সঠিক সময়ে পানিতে ছেড়ে দেব টর্পেডো। সামান্য বড় হয়ে ওঠা হাঙরটা নিজেই হবে মাছের খাবার।'

আরও কিছু বলবে ম্যাককমন, এমনসময় সাবমেরিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল দীর্ঘকায় এক অফিসার, মুখে চওড়া হাসি।

'কনি!'

'ফিল?' র‍্যাম্প-বেয়ে নেমে এল চিফ ইঞ্জিনিয়ার কনি ম্যাককমন, জড়িয়ে ধরল বড় ভাইকে।

'কনি,' হাসছে ডক্টর ফিল, 'এই জং-ধরা টিনের বালতির ভিতর তুমি?'

ক্যাপ্টেনের দিকে চাইল দুই ভাই।

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেড স্কিলার।

'এ বছর রিটায়ার করার কথা আমার,' বলল কনি ম্যাককমন। 'আসলে বাকি আছে মাত্র তিরিশ ঘণ্টা অ্যাকটিভ ডিউটি। ভাবলাম সুযোগ যখন পাচ্ছি, নটিলাসে সার্ভ করি আমার প্রথম সিও-র অধীনে। অবশ্য, তার আগে ঘুরে আসব কোনও বার থেকে। ফিল, চলো...'

'সরি, চিফ, কপাল মন্দ,' বলল ক্যাপ্টেন স্কিলার। 'আপাতত তীরে নামার সব ছুটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে। প্রথম কাজ মেগালোড... কী যেন নাম দিয়েছে ওটার নাসিম লোকটা? আজকে তাকে দেখলাম আপনাদের জাহাজে। গা জ্বলে যায় ওকে দেখলে।'

'বাদ দিন, স্কিলার,' কাঁধ ঝাঁকাল ফিল ম্যাককমন। 'সে ঠিকই বলেছিল। সত্যিই উঠে আসতে পারে...'

'তা পারে, কিন্তু ওই শালাকে দু' চোখে দেখতে পারি না

আমি। ভুলে গেছেন, ওর কারণে মারা গেছে আমার দুই-দুইজন অফিসার? প্রেস্টন আর শ্যন। দু'জনেরই সংসার, ছেলে-মেয়ে-বউ ছিল। প্রতিবছর দু'বার করে তাদেরকে চিঠি লিখি। শ্যন যখন মারা যায়, ওর ছেলেটা ছিল তিন বছরের...ক্যান ইউ ইমাজিন?'

প্রাক্তন কমাণ্ডিং অফিসারের দিকে চেয়ে নিচু স্বরে বলল ডক্টর ফিল ম্যাককমন, 'ওই দোষটা আমাদের। সার্টিফাই করার আগেই আপনাকে বলা উচিত ছিল আমার, অনেক বেশি ক্লান্ত নাসিম। ওকে জোর করে নামিয়েছিলাম আমরা।'

'পুরো তরতাজা ছিল...'

'একেবারেই বিধ্বস্ত ছিল। আপনি পছন্দ করেন বা না করেন দুনিয়ার সেরা ডিপ-সি ডাইভার ছিল সে-ই। যদি ডাইভে না যেত, নেভি নিজেদের কাউকে নামাত, তার ফলাফল আরও খারাপ হতে পারত। আগের দুই ডাইভের পর নাসিমকে যথেষ্ট বিশ্রাম দেয়া হলে সাবধানে উঠে আসতে পারত, সেক্ষেত্রে...'

'আপনার মাথা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে, ডক্টর,' লাল হয়ে গেছে ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলারের ঘাড়।

'থাক, থাক, যা হওয়ার হয়েছে,' বড় ভাই আর ক্যাপ্টেনের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল কনি ম্যাককমন। 'ফিল, এসো ঝটপট কিছু খেয়ে আসি। যে-কোনও সময়ে বৃষ্টি শুরু হবে। ক্যাপ্টেন, সাড়ে চারটের আগেই ফিরব।'

দুই ভাই শহরের দিকে যেতেই নীরবে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার। কয়েক সেকেণ্ড পর নটিলাসের বাইরের স্টিলের পাতে রিমঝিম আওয়াজে শুরু হলো বৃষ্টি।

ষোলো

ওয়াহু সানসেট বিচে একের পর এক ঝাঁপিয়ে পড়ছে দানবীয় ত্রিশ ফুটি সব ঢেউ। সৈকতের প্রান্তে এসে জড়ো হচ্ছে মৃত তিমির চর্বি ও আবর্জনা। তাতে মোটেই বিরক্ত নয় টুরিস্টরা। ওরা খেলা দেখতে এসেছে স্থানীয় সার্ফারদের। দুনিয়ার সেরা বিপজ্জনক ঢেউ নামছে এই সৈকতের বুকে। সার্ফ বোর্ড তলিয়ে গেলে তীক্ষ্ণধার সব প্রবাল-প্রাচীরে আছড়ে পড়ে মরতে হবে সার্ফারকে।

ওয়াহু সৈকতের উত্তরে বারো বছর বয়স থেকে সার্ফ বোর্ড ব্যবহার করছে চার্লি পার্ক। এখন চলছে ওর আঠারো, ছোট ভাই জনকে শেখাতে শুরু করেছে কীভাবে পাহাড়ের মত ঢেউ সামলে এগুতে হয়। এসব ঢেউ আসছে সেই সুদূর আলাস্কা আর সাইবেরিয়া থেকে।

আজ জোয়ারের সঙ্গে আরও বড় হতে শুরু করেছে ঢেউ। আসছে মরা তিমির রক্তাক্ত চর্বি ও মাংস। নোংরা করে দিচ্ছে পানি ও সৈকত। আবর্জনার পিছু নিয়ে হাজির হয়েছে হাঙর। কাছে-দূরে, ডানে-বাঁয়ে দেখা যাচ্ছে ডরসাল ফিন।

তারপরও বাহাদুর সার্ফাররা এখনও খেলা দেখাচ্ছে, কারণ দর্শকদের বেশিরভাগই মেয়ে।

আর তাই মস্ত সব ঝুঁকি নিচ্ছে চার্লি ও তার ছোট ভাই।

কাছেই কালো ওয়েট সুট ঠিক করে নিচ্ছে পিচ্চি জন। আরও

দুই পরিচিত সার্ফারকে দেখল চার্লি।

এদের নাম ডেল ও বিগ্‌স্।

প্রথম সুযোগে ঢেউয়ের বুকে ভেসে উঠেছে তারা।

কাছাকাছি জায়গা থেকে রওনা হলো চার্লিও, হাত তুলল কৃষ্ণকেশী শেলি হ্যারিসের উদ্দেশে। আরেকটু হলে বোর্ড থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। দ্রুত সামলে নিয়ে যোগ দিল অন্য দু'জনের দলে।

মাইকেল বিগস্ বাইশ বছর বয়সী, প্রতিটা পেশিতে কমপক্ষে একটা করে উল্কি আঁকিয়েছে সে। এইমাত্র বিশ ফুট উঁচু ঢেউয়ে চড়েছে। সামনে দেখতে পেল জনকে। সাঁতার কেটে সাগরে ফিরছে বোকা ছেলেটা। কয়েক মুহূর্ত পর টের পেল সে, বিগসের সার্ফ বোর্ড সরাসরি আসছে ওর মাথা লক্ষ্য করে!

ঝট্ করে বোর্ড থেকে নেমে পড়ল বারো বছর বয়সী জন পার্ক, দু'হাতে ঢেকে ফেলল মাথার উপর অংশ। থুতনি নিয়ে গেল বুকের কাছে। দু'সেকেণ্ড পর পেটে এসে গুঁতো দিল ঢেউ, তলিয়ে দিল ওকে। নীচের জোরালো টান খেয়ে তীরের দিকে তিরিশ ফুট এগিয়ে গেল। লবণ পানি গিলে ফেলেছে, হাঁসফাঁস করে ভেসে উঠল।

ঢেউয়ের উপর রাজার মত উড়তে উড়তে চলেছে বিগস্, তারই ফাঁকে একবার টিটকারির হাসি হাসল।

'তুই একটা গাধার পোঁদ, বিগস্!' মন খুলে গালি দিল জন।

সার্ফার অনেক দূরে চলে গেছে, শুনল না।

জনের দড়ি বেশি দূরে যেতে দেয়নি বোর্ডকে। ওটার উপর চেপে বসল ও। চারপাশে চাইল ভাইয়ের খোঁজে।

চার্লি আছে ব্রেক পয়েন্টের একটু আগে। বসে আছে নিজের বোর্ডের উপর। 'জনি, ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল।

'ওর সমস্যাটা কী, বলতে পারো?' বিরক্ত হয়ে বলল জনি।

‘গাধার পোঁদ হয়ে জন্মেছে, মরবেও সেভাবেই,’ বলল চার্লি।

‘তাড়াতাড়ি মরলে খুশি হতাম।’

‘ওর কাছ থেকে দূরে থেকো,’ সাবধান করল বড় ভাই। ‘সুযোগ পেলেই ঝামেলা করবে।’

‘চলো, বড় কয়েকটা ঢেউ বেয়ে নেমে যাই।’

‘ঠিক আছে। কিন্তু খেয়াল রাখবে, মনে কোনও দ্বিধা যেন না থাকে। মাথা নিচু করবে, দু’হাত বৈঠার মত চালাবে। নিজেই টের পাবে তোমাকে তুলে নিয়েছে ঢেউ। আর তখন নীচের খাদের দিকে তাক করবে বোর্ড, বাঁক নেয়ার পর ঢেউয়ের সঙ্গে নেমে যেতে থাকবে। যদি পা কাঁপে, বা পড়েই যাও, গুটিশুটি হয়ে যাবে, সাগরতলের কাছ থেকে দূরে থাকবে। নইলে প্রবাল...’

‘ক্ষত-বিক্ষত করে দেবে। জানি, আম্মু।’

‘লক্ষ্মী মেয়ে,’ বলল বড় ভাই, ‘ঠিক আছে, মেলা কথা হয়েছে। এবার করে দেখাও কী শিখেছ।’

বোর্ডের উপর পেট দিয়ে শুয়ে পড়ল জন পার্ক, বৈঠার মত চালাচ্ছে দুই হাত। ব্রেক পয়েন্টের দিকে ঝড়ের গতিতে চলেছে।

সাগরের বিশাল এক দোলাচলের উপর উঠে এসেছে দুই ভাই এবং বিগস।

ডানদিকে ভাঙতে শুরু করেছে আটাশ ফুটি ঢেউ। কোনও ভুল না করেই লাফ দিয়ে বোর্ডে উঠে দাঁড়াল জন, কিন্তু নামার অ্যাংগেল বেশি খাড়া করে ফেলেছে। ভারসাম্য রাখতে পারল না, মাথা তাক করে ঝুপ করে পড়ল পানির ভিতর। ওর মনে হলো দানবীয় ওয়াশিং মেশিনের ভিতর ঘুরপাক খাওয়ানো হচ্ছে ওকে।

‘দেখো ছাগলের কাজ!’ হো-হো করে হেসে ফেলল বিলি উডস। ‘আরে, আমার দাদীও ওর চেয়ে ভাল সার্ফ করে!’ শেলি ও তার বান্ধবী ক্যারির মাঝে কাবাবের হাড্ডির মত গুঁজে গেছে সে।

'তুমিই না হয় দেখিয়ে দাও কাজটা কীভাবে করতে হয়?' যুবককে বিদায় করতে বলল শেলি হ্যারিস।

একবার ওর দিকে চাইল বিলি উডস্, তারপর দেখল ক্যারিকে। 'ঠিক আছে, দেখিয়ে দিচ্ছি,' বলল। 'কিন্তু শেলি, এটা তোমার জন্য নয়, এবারের রাইড শুধু ক্যারির জন্য!' পাশ থেকে বোর্ড তুলে নিল সে, উত্তেজিত কমবয়সী ছেলের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল সাগরে।

কয়েক মুহূর্ত পর সাগরের গভীর অংশ লক্ষ্য করে চলল পাঁচ সার্ফার— চার্লি, জন, বিগস, ডেল এবং বিলি।

দেখতে দেখতে আধমাইল দূরে সরে গেল তারা।

পানি ওখানে কমপক্ষে নব্বই ফুট গভীর।

বাহাত্তর ঘণ্টায় আঠারোটি তিমির পড়ে হামলা করেছে ক্ষুধার্ত মেগালোডন। খুন করেছে চোদ্দটা তিমি। মারাত্মক আহত করেছে আরও চারটাকে। হাম্পব্যাক ও ধূসর তিমির ভীত চিৎকার ও আর্তনাদে ভরে উঠেছে সাগরের কয়েক মাইল। প্রায় একই সময়ে যাত্রাপথ পাল্টে নিয়েছে প্রতিটি পাল। এড়িয়ে যাচ্ছে পশ্চিম দিক, সরে যেতে শুরু করেছে হাওয়াই উপকূল থেকে দূরে।

তৃতীয় দিনে দ্বীপ থেকে সাগরে দেখা গেল না কোনও তিমি।

কারকারোডন মেগালোডন বুঝেছে, তার শিকারগুলো পালাতে শুরু করেছে। কিন্তু তক্ষুনি পিছু নিল না সে। দ্বীপের চারপাশের পানিতে নতুন কীসের যেন আভাস। বারবার শীতল পানির গভীরে চলে গেল মেগাটা, আবার উঠে এল সূর্যের তাপে উষ্ণ পানিতে। চলবার পথে বারবার মাথা নাড়ল, শিউরে উঠল ত্রিকোণ স্নাউটের নেযাল ক্যাপসুল। মাথার দু'পাশের নাকে নতুন সুবাস।

বড় তীব্র গন্ধ।

মানুষের।

বিকেলের শুরুতে শিকারি মেগা খুব কাছে পৌঁছে গেল ওয়াহু সৈকতের।

'আশ্চর্য, ঢেউগুলো গেল কই?' চিৎকার করে বলল বিগ্‌স্।

প্রায় বিশ মিনিট হলো বোর্ডের উপর বসে আছে পাঁচ সার্ফার।

পশ্চিমের দিকে ঢলে গেছে সূর্য, শীতল হয়ে আসছে হাওয়া।

দর্শকদের মনোযোগ হারিয়ে বসেছে বিগস।

সৈকত ছেড়ে বাড়ির পথ ধরছে দর্শকরা।

'অ্যাই, এইমাত্র একটা ঢেউ পেরিয়ে গেল,' বলল ডেল।

'আমিও টের পেয়েছি,' বলল চার্লি।

একইসঙ্গে বোর্ডে শুয়ে পড়ল পাঁচ সার্ফার, দুই হাতে পানি কেটে ফিরছে সৈকতের দিকে। নিজের বোর্ড নিয়ে জনের পিছনে চলে এসেছে বিগস, হ্যাঁচকা টান দিল দড়ি ধরে।

থেমে গেল জনের গতি, উল্টো সামনে বাড়ল বিগসের বোর্ড।

চার সার্ফার উঠে গেল তিরিশ ফুটি দোলাচলের উপর, কয়েক মুহূর্ত পর ঢেউ হয়ে ভেঙে পড়বে সৈকতে।

পিছনে রয়ে গেছে জন পার্ক। 'আমি ঘৃণা করি তোকে, কুত্তা কোথাকার!' রাগে ভুরু কুঁচকে ফেলল, উঠে বসল বোর্ডে। পরের ঢেউ এলে তখন আবারও সুযোগ পাবে।

ষাট গজ সামনে পাহাড়ের মত উঁচু সাদা এক ডরসাল ফিন ভেসে উঠেই আবারও তলিয়ে গেছে ঢেউয়ের নীচে, দেখল জন।

'আরেব্বাপরে!' ফিসফিস করে নিজেকে বলল। চমকে গেছে ভীষণভাবে। ঝটপট বোর্ডের উপর তুলে ফেলল দুই পা।

চার সার্ফার জানল না, ঢেউয়ের ভিতর উঠে এসেছে মস্ত এক দানব।

ঢেউয়ের নীচের অংশে চার্লি, ডেল ও বিলি, বুঝল না পিছনে

আসলে কী ঘটছে।

এইমাত্র সাঁৎ করে বোর্ড ঘুরিয়ে নিয়েছে বিগস, এবার নায়কের মত ছুটবে। কিন্তু ঠিক তখনই বিশাল সাদা এক দেয়াল উঠে এল তার সামনে।

ওটা কোথা থেকে এল বুঝল না বিগস, সরে যাওয়ার সময়ও পেল না।

ঢেউয়ে নাক দাবিয়ে দিয়েছে সার্ফবোর্ড, ওটা লাগল মেগালোডনের পাঁচ ফুট দীর্ঘ কানকোর গায়ে।

বুক দিয়ে সাদা দেয়ালে হোঁচট খেল বিগস। ক্রমেই আরও উঁচু হচ্ছে ওই দেয়াল।

ভেঙে পড়া ঢেউয়ের ভিতর ছিটকে পড়ল বিগস। ব্যথায় প্রায় অচেতন হয়ে গেল। টুপ করে ডুবে গেছে নীচের প্রবাল প্রাচীরের ভিতর।

দুর্বল ও অসহায় বোধ করছে সে। কয়েক ঢোক পানি গিলে ভেসে উঠল। গোড়ালির সঙ্গে এখনও বোর্ডের দড়ি, দু'হাতে ধরে ফেলল ওটা। ভেঙে গেছে তার নাক, দুই ফুটো দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ভীষণ জ্বলছে বুক। তারই ভিতর বিড়বিড় করে গালি দিতে শুরু করেছে। চারপাশটা দেখতে চাইল।

কোথায় গেল ওই সাদা সেইলবোটের হারামজাদা চালক!

'শুয়োরটাকে খুন করা উচিত!' বিড়বিড় করল বিগস।

টনটনে ব্যথা নিয়ে বোর্ডের উপর উঠতে চাইল, কিন্তু সম্ভব হলো না। ভেঙে গেছে পাঁজরের অন্তত দুটো হাড়। বুকের ভিতর আরও কীসের ব্যথা।

প্রায় শেষ হয়ে এসেছে দিন, ক্রমেই নামছে আঁধার, ম্লান আলোয় বিগস দেখল, ছিঁড়েখুঁড়ে গেছে তার তামাটে ত্বক, বেরিয়ে এসেছে লালচে পেশিগুলো। ক্ষত থেকে বেরুচ্ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

'আশ্চর্য,' বিড়বিড় করল বিগস।

একটু দূরে দেখল বড় আরেকটা ঢেউ।

ওটা যেন উঠে আসছে আঁধার দিগন্ত থেকে।

কনুই ও দুই হাঁটুর উপর ভর করে বোর্ডে উঠে এল বিগস।

তিন সেকেণ্ড পর ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে ব্রেক পয়েন্টে পৌঁছে গেল ঢেউ। কিন্তু বিগস জানে না, খুব কাছে বিশাল মুখটা মেলেছে মেগালোডন।

ভয়ঙ্কর ঝটকা খেল বিগস, বোর্ডসহ ছিটকে গেল পঁচিশ ফুট উপরে।

দানবীয় ঢেউয়ের ভিতর হাঁ করেছে মেগালোডন, খোলা মুখ দিয়ে খপ্ করে ক্যাচ ধরল বিগস ও তার বোর্ডকে।

প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড চাপ তৈরি করে ওই দাঁতগুলো। নানাদিকে ছিটকে গেল বিগসের রক্ত।

সন্তুষ্ট হয়ে ঝটকা দিয়ে মাথা নাড়ল মেগালোডন, চোয়ালে এখনও রয়ে গেছে বিগসের রক্তাক্ত লালচে মাংস ও ভাঙা ফাইবারগ্লাস। শেষের জিনিসটা হাজার টুকরো হলো পরের কামড়ে। তাজা মাংস মুখে পুরে ডুব দিল দানবটা।

সৈকতে তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করেছে মেয়েরা। যারা অগভীর পানিতে স্নান করছিল, সবাই দেখেছে কীভাবে খেয়ে ফেলা হলো আস্ত এক লোককে।

প্রায়ান্ধকার সৈকতে কেউ কেউ বুঝতে চাইছে পরিস্থিতি। ঢেউয়ের উপর ভর করে সৈকতের কাছে পৌঁছে গেছে চার্লি, ডেল ও বিলি।

ওদের উদ্দেশে চিৎকার করছে সবাই। হাত নাড়ছে তাড়াতাড়ি সৈকতে উঠে আসার জন্য।

'ওরা এমন চেঁচায় কেন?' অবাক হয়ে বলল বিলি। 'আরও খেলা দেখতে চায় বোধহয়?'

'না, ওরা চিৎকার করছে যেন তীরে উঠি,' বলল ডেল। 'বোধহয় কাছেই হাঙর।'

'জন কই!' চারপাশে চাইল জনের বড় ভাই চার্লি।

শিকারের ছড়িয়ে পড়া তাজা রক্তের টাটকা সুবাসে পাগল হয়ে উঠেছে মেগালোডন, বারবার দাঁতে দাঁত পিষতে শুরু করেছে। খুঁজছে অস্বাভাবিক কম্পন। তার পুরু ত্বকের পাশের নালা অত্যন্ত সংবেদনশীল, ওই সেনসরি সেলগুলো সাগরের জল থেকে সংগ্রহ করছে হরেক জরুরি তথ্য।

ঠাণ্ডা এবং ভয়ে থরথর করে কাঁপছে বারো বছর বয়সী জন পার্ক। নিজ চোখে দেখেছে কীভাবে বিগসকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছে মস্ত দানবটা। আর এখন ওটা ঘুরছে মাত্র তিরিশ গজ দূরে। জনের সার্ফবোর্ডে এসে আটকে গেছে রক্তাক্ত কয়েক টুকরো মাংস। ওদিকে চেয়ে বারবার বমি আসছে। আরও দশ গজ সামনে ব্রেক পয়েন্ট, ওখান থেকে ঢেউ গিয়ে পড়ছে সৈকতে।

কিন্তু সাহস নেই যে সাঁতরে ওদিকে যাবে। ডিসকভারি চ্যানেলে দেখেছে, সামান্যতম কম্পন তৈরি করলেই হামলা চালায় হাঙর।

চারপাশে চাইল। আশপাশে কোথাও কোনও নৌকা নেই যে ওকে উদ্ধার করবে। আকাশে কপ্টার নেই।

চুপচাপ গোড়ালি থেকে বোর্ডের দড়ি খুলে ফেলল জন।

মনে হলো, ও নড়তেই সব বুঝে গেছে সাদা হাঙর। ঝট্ করে ঘুরিয়েছে সাদা ডরসাল ফিন। মসৃণভাবে আসছে তদন্ত করতে!

বরফের মূর্তি হয়ে গেল জন, আঙুলও নাড়াচ্ছে না। দেখল, পানির নীচে থরথর করে কাঁপছে ওর বোর্ড।

গভীর পানি চিরে আসছে মেগালোডন, উপরে উঠছে ছয় ফুট

ডরসাল ফিন। প্রকাণ্ড মেগালোডন নড়লেও তৈরি হচ্ছে জোরালো টান। এ কারণেই জনের সার্ফবোর্ড সরে যেতে শুরু করেছে। পিছিয়ে দশ ফুট দূরে গিয়ে স্থির হলো। সাগর ভেদ করে ভেসে উঠল বাঁকা চাঁদের মত লেজ। উপর অংশ জনের মাথার চেয়ে উঁচু। মাত্র দুই ইঞ্চি দূরে।

হঠাৎ জন টের পেল, কী যেন তুলে ধরছে ওকে।

বুক ধকধক করছে, প্রতি মুহূর্তে ভাবছে, এবার ঝট্ করে ঘুরেই হাঁ করবে দানবটা, তারপর ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে ওকে!

কিন্তু দূরে সরে যেতে শুরু করেছে মেগালোডন।

নতুন করে আবারও আসছে ঢেউ। প্রথমটা তুলে নিল জনের সার্ফবোর্ড, ঠেলে দিল সাত ফুট দূরে।

ব্রেক পয়েন্ট এখনও পুরো পনেরো ফুট দূরে।

তিরিশ ফুট পিছনে দানব হাঙর।

হয় এখনই পালাতে হবে, নইলে আর কখনও নয়, বুঝে গেল জন। বোর্ডে পেট ঠেকাল, এগুতে শুরু করেছে সাবধানে। আরও দশফুট যেতে হবে। এখনও শুরু হয়নি ঢেউয়ের গড়িয়ে যাওয়া। চট্ করে একবার পিছনে চাইল জন, বুকের ভিতর বিস্ফোরিত হতে চাইল হৃৎপিণ্ড।

ঘুরে গেছে মেগালোডন, বুঝে গেছে কাছেই নতুন কম্পন।

জনের পনেরো ফুট পিছনে সারফেস ভেদ করে জেগে উঠেছে সাদা স্নাউট।

এবার দ্বিধা না করেই বোর্ডে মুখ চেপে ধরল জন, দুই পায়ে জাপ্টে ধরল ফাইবারের তক্তা, দু'হাত দু'পাশে বৈঠার মত চালাতে শুরু করল।

সার্ফবোর্ডে এসে লাগল জোরালো ঢেউ। জনের মনে হলো, মাত্র এক ফুট পিছনে দানবের মস্ত দাঁতগুলো।

ছিটকে সামনে বাড়তে চাইল ও, আর তখনই মস্ত হাঁ মেলল

মেগালোডন।

কিন্তু সার্ফবোর্ড নিয়ে ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে গেছে জন, ঝাঁপিয়ে নেমে যেতে লাগল আঁধার সাগরে। তিরিশ ফুট উঁচু ঢেউয়ের শেষ কিনারা থেকে শুরু হয়েছে পতন।

জনের কপাল ভাল, টিকে থাকল সার্ফবোর্ডে। পিঠে লাগল শীতল, নোনা হাওয়া। একপলক দ্বিধা করল, তারপর ডানহাতে স্পর্শ করল পিছনের পানির দেয়াল।

নিজেকে মনে হলো সেরা সার্ফার।

আর দুই সেকেণ্ড পর শিকার ধরবে মেগালোডন, এমন সময় নতুন এক কম্পন চিনল সে। ওটা আসছে জনের ডানহাত থেকে। শিকারী মাছকে সতর্ক করছে ইন্দ্রিয়। হামলা বাদ দিয়ে জোরালো স্রোতের ভিতর ভেসে উঠতে শুরু করেছে মেগালোডন।

চট্ করে একবার পিছনে চাইল জন, দেখল স্কুল বাসের চেয়েও চওড়া এক মুখ খট্ করে বন্ধ হলো। শুধু পানি চিবিয়েছে নয় ইঞ্চি দাঁতগুলো। ঢেউয়ে ঝপাস্ করে নেমে এল মেগালোডনের ঊর্ধ্বাংশ।

ভীষণ ভয় পেয়ে ডানদিকে বাঁক নিল জন, তীরের মত ছুটল। বুঝে গেছে, ওই দানব আবারও ওকে খুঁজে পাওয়ার আগে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড সময় পাবে। জান হাতে নিয়ে সার্ফবোর্ড থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জন। অগভীর পানিতে যাওয়ার আগে কমপক্ষে এক শ' গজ পেরুতে হবে।

ক্রমেই উপরে উঠছে সাগরের মেঝে। গভীরতা এখানে তিরিশ ফুট, কিন্তু বিপদের তোয়াক্কা করছে না মেগালোডন। পলাতক শিকারকে চাই তার। ওটা যাচ্ছে অগভীর পানির দিকে। তিন সেকেণ্ড পর শক্তিশালী চোয়াল হাঁ করেই কামড় বসাল সে। ডিমের খোসার মত মুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল ফাইবারগ্লাসের বোর্ড।

ঠিক সেই সময়ে খপ্ করে ওকে ধরে ফেলল কী যেন। ভীষণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল জন। কয়েক মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারাল।

দুজন লাইফগার্ড!

পরের পঞ্চাশ গজ যেন উড়ে চলে এল জন।

সৈকতে একটু দূরে দূরে জ্বলে উঠেছে টিকি মশালের আগুন। তীরের কাছে কমপক্ষে কয়েক শ' টুরিস্ট। সবাই উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে চেঁচাচ্ছে, 'জন! জন! জন!'

ছোট ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে দিতে শুরু করেছে চার্লি পার্ক।

জন ক্লান্ত, ভয়ে কাঁপছে থরথর করে, ওর মন চাইল বমি করে দিতে। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল স্কুলের সেরা সুন্দরী মেয়েটাকে সামনে দেখে। একই ক্লাসে পড়ে ওরা।

'এখন কেমন বোধ করছ, জন?' জানতে চাইল মেরি। 'ভীষণ ভয় পেয়েছি তোমার জন্য।'

গলা পরিষ্কার করল জন, বড় করে দম নিয়ে চওড়া হাসি দিল। বুঝে গেছে আজ ওর দিন। বলল, 'এসব কোনও ব্যাপারই না, মেরি। আজ সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে, শহরে?'

সতেরো

ওয়াহু সানসেট বিচে জন পার্ক উঠে পড়বার কয়েক সেকেণ্ড পর সাগরের উপর এসে ভাসতে শুরু করেছে কোস্ট গার্ডের এয়ার রেসকিউ হেলিকপ্টার। ওটার পাইলট এবং উদ্ধারকর্মীরা দেখতে পেয়েছে সাগরের গভীরে চলে যাচ্ছে দুর্বল টিউব লাইটের মত

ম্লান আলো ছড়ানো বিশাল এক মাছ।

পাইলট দেরি না করেই রেডিয়ো করল পার্ল হার্বারে। এবং তার কয়েক মিনিটের ভিতর বন্দর ত্যাগ করল ফ্রিগেট নিতু ও ইউএসএস সাবমেরিন নটিলাস। মামালা উপসাগরকে উত্তরে রেখে গভীর সাগরের দিকে চলেছে তারা।

যখন কিয়েনা পয়েণ্টে পৌঁছুল ফ্রিগেট নিতু, তখন শুরু হয়ে গেছে জোরালো ঝড়। ঘুটঘুটে আঁধার হয়ে গেছে চারপাশ।

পাইলট হাউসে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রানা, মানামি ও নাসিম আহমেদ।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল, বাইরের ডেক থেকে ভিতরে এসে ঢুকল হলদে রেইনকোট পরা বাড লিটলটন। প্রায় গোসল হয়ে এসেছে বৃষ্টিতে। ধুপ্ করে বন্ধ করল পিছনের হ্যাচ। মেঝেতে গড়াতে শুরু করেছে পানি।

'কপ্টার সিকিওর করেছি, রানা। জাল আর হার্পুনও। কিন্তু ঝড় বোধহয় সারারাত চলবে।'

'আজই প্রথম ও শেষ ভাল সুযোগ,' বললেন নাসিম। 'রিপোর্ট পাওয়া গেছে, উপকূল থেকে সরে গেছে সমস্ত তিমি। এরই ভেতর যদি ওটাকে ট্যাগ না করা যায়, হয়তো খোলা সাগরে বেরিয়ে পড়বে।'

'সিআইসিতে চলুন যাই,' বলল মানামি।

আপত্তি তুলল না কেউ।

অপারেশন্স স্টেশনে ঢুকে রানা দেখল এক ক্রুর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তামেশু সিনোসুকা। পাশেই সোনার কন্সোল। গম্ভীর মুখে রানাকে দেখে নিলেন তিনি। 'ঝড়ের কারণে হাল ছেড়ে দিয়েছে কোস্ট গার্ড।' ক্রু-র দিকে ফিরলেন। 'সোনারে কিছু পাওয়া গেল, পল?'

মুখ না তুলেই মাথা নাড়ল ইতালিয়ান ক্রু। 'শুধু নটিলাস।'

বিশ ফুটি ঢেউ গড়াতে শুরু করেছে, চট্ করে কন্সোল ধরে নিজেকে সামলে নিল সে।

আরেক দিকে হোঁচট খেল ফ্রিগেট নিতু।

হেলম-এ দাঁড়িয়েছে ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেন। সাগরের দুলুনির সঙ্গে তাল সামলে নিচ্ছে তাঁর অভিজ্ঞ দুই পা।

রানার তেমন কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

অন্যরা টলমল করছে।

'আশা করি ভারী কিছু খাননি কেউ,' বলল ব্র্যাডসেন। 'কারণ এই ঝড় ডাইনীর মত খারাপ হয়ে উঠবে।'

ওয়েইমে উপসাগরের এক শ' ফুট নীচ দিয়ে চলেছে নিউক্লিয়ার পাওয়ার্ড সাবমেরিন নটিলাস। গতি একদম স্বাভাবিক। যেন জানেই না পানির উপর কী ভয়ঙ্কর কাণ্ড চলছে। প্রথমে এই সাবমেরিন কমিশনড্ হয় উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে। এটার একমাত্র নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর তৈরি করে ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত বাষ্প, ওই জিনিসের জোরেই চলে দুই টারবাইন ও দুই শাফট।

সাগরতলে একের পর এক অভিযানে রেকর্ড করেছে নটিলাস। ওটার মত নাম কামাতে পারেনি, পারবেও না অন্য কোনও সাবমেরিন। উনিশ শ' আটান্ন সালে নটিলাস গেছে ঐতিহাসিক নর্থ পোল অভিযানে। উনিশ শ' আশি সালে এটাকে ডিকমিশন করা হয়। ঠিক হয়েছিল কানেকটিকাটের গ্রোটোনে ফিরবে, ওখানেই জন্ম ওটার, কিন্তু তৎকালীন পার্ল হার্বারের কমাণ্ডার ম্যাকপাই জোন্স নেভির জন্য চেয়ে নেন নটিলাসকে—পার্ল হার্বারে ওই পুরনো সাবমেরিন হয়ে উঠবে টুরিস্টদের জন্য একটা বাড়তি আকর্ষণ।

তারপর পেরিয়েছে বহু বছর। আর এই সেদিন ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চে মেগালোডনের হামলা হলো।

বর্তমান কমাণ্ডার ফিলিপ গোল্ডম্যান জানেন, প্রাগৈতিহাসিক হাঙর ঠেকাতে লস এঞ্জেলেস ক্লাস সাবমেরিন পাঠালে ছ্যা-ছ্যা করবে সবাই।

ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলারের কথায় স্থির করলেন তিনি, এ সমস্যা সমাধানে ভাল ভূমিকা নিতে পারে সাবমেরিন নটিলাস।

কেমন হয় ওটাকে ডিউটিতে ডেকে নিলে?

সাড়ে তিন দশক পর নেভির কাজে ফিরবে নটিলাস. অনেকে শিহরিত হয়ে উঠবে এ খবর শুনে।

বুদ্ধিটা ভাল লাগল পার্ল হার্বার কমাণ্ডারের।

'ড্যানিয়েল, সোনারে কিছু পেলে?' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার।

কন্সোলে চেয়ে আছে সোনারম্যান, কান খাড়া হেডফোনে। আওয়াজ হলে সবুজ স্ক্রিনে তা দেখা দেবে বাতির রেখার মত।

'সাগরের ওপরে অনেক আওয়াজ। নীচে কিছুই নেই, স্যর।'

'কিছু পেলে জানাবে। ...চিফ ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েপন্স স্ট্যাটাস?'

ডাক্তার ফিল ম্যাককমনের চেয়ে ছয় বছরের ছোট তার ভাই কনি ম্যাককমন, কিন্তু সাবমেরিনের ক্রুদের ভিতর সবচেয়ে বয়স্ক। চট্ করে দেখে নিল কন্সোল। 'আপনার নির্দেশে ফায়ার করা হবে দুটো মার্ক-৪৮ অ্যাড-ক্যাপ টর্পেডো, স্যর। সংক্ষিপ্ত রেঞ্জের জন্য সেট করা হয়েছে। কিছু মনে না করলে বলব, স্যর, একটু বেশি কম রেঞ্জেই বিস্ফোরিত হবে।'

'এ ছাড়া উপায় নেই, চিফ। লক করার মত কিছুই নেই। সোনার ওই দানবকে ধরলে খুব কাছে যেতে হবে আমাদেরকে, তারপর ফায়ার করতে হবে।'

'ক্যাপ্টেন!' কন্সোল থেকে পিছিয়ে এল রেডিয়োম্যান। 'জাপানি এক ওয়েইলার থেকে ডিসট্রেস কল আসছে। মনে হচ্ছে, ওই জাহাজে হামলা হয়েছে!'

মাথা দোলাল স্কিলার। ‘দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে ইন্টারসেপ্ট কোর্স বের করো, ন্যাভিগেটর। যদি ওই হাঙর হামলা করে থাকে, পার্ল হার্বারে ফেরার আগে ওটাকে শেষ করতে চাই।’

প্রকাণ্ড সব ঢেউয়ের মাঝে হাবুডুবু খাচ্ছে অসহায় জাপানি ওয়েইলার নাগাসাকি। ক্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রবল বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া। জাহাজের হোল্ডে ঠেসে ভরা হয়েছে বেআইনী মাল— ধূসর তিমির আটটা লাশ।

আরও দুটো ঝুলছে পোর্ট সাইডের কার্গো নেটে।

মাস্তুলের উপর পাখির বাসার মত ছোট্ট মাচায় দাঁড়িয়ে আছে দুই নাবিক, চোখ রয়েছে আঁধার সাগরে।

যেন ঝড়ের সময় জাল থেকে খসে না পড়ে মূল্যবান ব্লাবার, সেজন্য নজর রাখতে হচ্ছে দুই মেটকে। দু'জনই খুব ক্লান্ত। হাতের সার্চলাইট ঝড়-বৃষ্টি ভেদ করতে পারছে না মোটেই।

সত্যিকারের আলো বলতে একটু পর পর বিদ্যুতের উজ্জ্বল ঝিলিক।

এইমাত্র আকাশে ঝলসে উঠল নীল আলো।

ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে রওনা হয়ে গেল জাহাজ।

এবার স্টারবোর্ডে কাত হয়ে যাচ্ছে।

অতিরিক্ত ওজনে ককাতে শুরু করেছে কার্গো নেট।

কোনওমতে টিকে থাকল নাবিকরা, কয়েক সেকেণ্ড পর বিপজ্জনক ভাবে বামে কাত হয়ে গেল নাগাসাকি।

নীচ থেকে উঠে আসতে চাইল সাগর, যেন গিলে নেবে গোটা জাহাজ।

মস্ত ঢেউয়ের ভিতর জালসহ তলিয়ে গেল দুই তিমির লাশ।

আবারও স্টারবোর্ডে কাত হলো জাহাজ, দেখা দিল জাল।

তখনই বিদ্যুতের ঝিলিকে চমকে গেল দুই মেট— দুই মরা

তিমির সঙ্গে উঠে এসেছে মস্ত এক ত্রিকোণ সাদা মাথা!

আবারও আঁধার হয়ে গেল চারপাশ।

কাত হয়ে গেল ওয়েইলার নাগাসাকি। ঝড়ের ভিতর কিছুই দেখল না দুই মেট। নীরবে কেটে গেল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর কাঁটা-চামচের মত চেরা নীল ঝিলিক দেখা দিল গোটা আকাশে। আবারও দেখা গেল সাদা ওই মাথা। বিশাল চোয়াল হাঁ করেছে ওটা, মুখ ভরা ভয়ঙ্কর দাঁতের সারি!

ভীষণ ভয়ে চিৎকার শুরু করল দুই মেট, কিন্তু সে আওয়াজ তলিয়ে গেল ঝড়ের নীচে।

সিনিয়র মেট চলেছে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করতে।

ঠিক তখনই ঝলসে উঠল নীলচে বিদ্যুৎ।

সেই আলোয় সে দেখতে পেল, বিকট এক চোয়াল চিবাচ্ছে তিমির লাশ। নানাদিকে ছিঁড়ে পড়ছে লালচে মাংস। দোদুল্যমান জাহাজের সঙ্গে নড়ছে দানবটা, খুশি মনে চিবিয়ে খাচ্ছে তিমির ব্লাবার।

আবারও স্টারবোর্ডে কাত হলো জাহাজ।

কাঠের ডেকের আরেক প্রান্তে পৌঁছুবার আগেই পা ফস্কে গেল সিনিয়র মেটের। প্রচণ্ড হাওয়ায় চোখ বুজে ফেলেছে সে, শক্ত করে ধরেছে দড়ির মই। একেকবারে বড়জোর এক ফুট করে এগোতে পারছে।

পোর্টের দিকে ভীষণ কাত হতে শুরু করেছে জাহাজ!

মনে হলো আছড়ে পড়বে সাগরে!

সিনিয়র মেট চোখ মেলল, দুলুনির ভিতর বেদম বমি এল তার। চোখের সামনে দেখল, ঝট্ করে উঠে আসছে সাগর। নীল ঝিলিকে উধাও হয়েছে ত্রিকোণ মাথা।

কিন্তু নাগাসাকিকে পাশ থেকে ঠেলে ডুবিয়ে দিচ্ছে কী যেন!

'ক্যাপ্টেন, ওয়েইলার আর দুই শ' গজ সামনে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার। পেরিস্কোপ ডেপথ-এ নিয়ে যান।'

'আই, স্যর, পেরিস্কোপ ডেপথ।'

উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে সাবমেরিন। পেরিস্কোপের রাবার হাউসিঙে মুখ রেখে আঁধারে চাইল ফ্রেড স্কিলার। নাইট স্কোপের কারণে কালোকে দেখাচ্ছে ধূসর। কিন্তু ঝড়ের দাপট ও উন্মাতাল ঢেউয়ের কারণে কিছুই দেখা গেল না।

আবারও ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ।

ফরসা দিন হয়ে উঠল রাতের প্রশান্ত মহাসাগর।

ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার দেখল, একদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে ওয়েইলার।

পেরিস্কোপ থেকে পিছিয়ে নির্দেশ দিল সে, 'এক্ষুনি কোস্ট গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করো। সবচেয়ে কাছের কাটার লাগবে!'

'স্যর,' বলল রেডিয়োম্যান, 'বিশ মাইলের ভিতর সবচেয়ে কাছে সিনোসুকা ইন্সটিটিউটের জাহাজ নিতু।'

'একটু ভাল করে দেখুন, স্যর,' উঠে দাঁড়িয়েছে সোনারম্যান।

ফ্লুরেসেণ্ট স্ক্রিনে দেখা গেল ডুবন্ত জাহাজ।

কিন্তু ওটাকে চক্কর কাটছে মস্ত কী যেন!

দ্বিতীয়বারের মত কথাগুলো শুনল নিতুর রেডিয়োম্যান, নিশ্চিত হয়ে নিল কেউ ঠাট্টা করছে না। 'ক্যাপ্টেন, আমরা ইমার্জেন্সি কল পাচ্ছি নটিলাস থেকে।'

কণ্ট্রোল রুমে সবার মাথা ঘুরে গেল রেডিয়োম্যানের দিকে।

'তলিয়ে যেতে শুরু করেছে এক জাপানি ওয়েইলার। ওটা পুবে বারো মাইল দূরে। জানাচ্ছে, ওই জাহাজে জীবিত নাবিক থাকতে পারে। আশপাশে কোনও জাহাজ নেই। সাহায্য চাওয়া

হচ্ছে নিতুর কাছে।'

একবার রানা ও নাসিমের দিকে চাইলেন তামেশু।

'মেগালোডন?'

'সেক্ষেত্রে আমাদের হাতে বেশি সময় নেই,' বললেন নাসিম।

'এলাকা ছেড়ে সরে গেছে তিমির পাল, আর মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে ওটা,' মন্তব্য করল রানা। গম্ভীর শোনাল ওর কণ্ঠ, 'তার চেয়ে বড় কথা, ওটা খুব ক্ষুধার্ত।'

'ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেন, যত দ্রুত সম্ভব ওখানে চলুন,' নির্দেশ দিলেন তামেশু।

পোর্টসাইডে কাত হয়ে পড়ে আছে জাপানি ওয়েইলার নাগাসাকি।

বিশ ফুটি সব ঢেউয়ে ডুবছে না।

জাহাজের পেটের ভিতর অন্ধকারে চুপ করে বসে আছে এগারোজন নাবিক। এই মৃত্যুফাঁদ থেকে মুক্তি চাইছে, জানে না উল্টে গেছে কি না জাহাজ।

চারপাশ থেকে আসছে হাওয়া, ভীষণ শীত।

দানব ঢেউয়ের ভিতর কার্গো নেটের তিমির মাংস খেতে ব্যস্ত মেগালোডন, একাই ঠেলে তুলে রেখেছে জাহাজটাকে।

জাহাজ কাত হয়ে পড়বার সময় তলিয়ে গেছে সিনিয়র মেট। কিন্তু কী করে যেন খপ্ করে ধরে ফেলেছে দড়ির মই। এখন একের পর এক ঢেউয়ের ভিতর উঠে আসছে জাহাজের পাশে।

নাগাসাকির খাড়া ডেক সামনেই।

ক' মুহূর্ত পর উঠে এসে কেবিনের খোলা দরজার ফ্রেম ধরল সে। খালাসিদের ভীত চিৎকার। ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে ওদিকে আলো ফেলল সিনিয়র মেট।

বরফ-ঠাণ্ডা পানিতে ভিজে গেছে চার নাবিক। কাঠের মাস্তুলের গোড়া ও দড়াদড়ি শক্ত করে ধরে ঝুলছে।

আঠারো

'ক্যাপ্টেন, ওখান থেকে চিৎকার শুনছি,' বলল সোনারম্যান। 'সাগরে পড়ে গেছে কেউ।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার, তারপর জানতে চাইল, 'নিতু আর কত দূরে?'

'কমপক্ষে আরও ছয় মিনিট,' জানাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার কনি ম্যাককমন।

পরিস্থিতি ভালভাবে বুঝতে চাইছে স্কিলার।

কী করলে মেগালোডনকে সরাতে পারবে জীবিতদের থেকে?

'সোনার দিয়ে জোরালো পিং-পিং আওয়াজ ছাড়ুন, চিফ। দেখা যাক জানোয়ারটা কী করে। অস্বাভাবিক কিছু দেখলে দেরি না করে আমাকে জানাবেন।'

'বারংবার আওয়াজ করব, আই, স্যর।'

এক সেকেণ্ড পর শুরু হলো ভয়ঙ্কর আওয়াজ:

পিং... পিং... পিং...

নটিলাসের ইস্পাতের খোলের ভিতর ধাতব আওয়াজ শুরু হয়েছে। সাগরের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র সাইরেন।

প্রথম সেকেণ্ডে দেহের পাশের ইন্দ্রিয়ে পৌঁছে গেছে জোরালো ধাতব ঘং-ঘং আওয়াজ, পরের কয়েক মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠেছে মেগালোডন। ভীষণ রেগে গেছে সে।

কোথাকার কোন্ অচেনা এক জানোয়ার হুমকি দিচ্ছে তাকে। কেড়ে নিতে চাইছে তার মুখের গ্রাস।

জালের ভিতর রয়ে যাওয়া তিমির মাংস রেখে সরে এল মেগা, ডুবন্ত জাহাজের নীচে বারকয়েক চক্কর কেটে বুঝে নিতে চাইল পরিস্থিতি।

ভীষণ মাথা ধরেছে তার।

পরিষ্কার বুঝল, ওই আওয়াজ আসছে দূরের ওই কালো জানোয়ারের কাছ থেকেই!

'ক্যাপ্টেন বেয়ারিং পাচ্ছি,' বলল সোনারম্যান। 'সিগন্যাল তিন হার্টযের। ওই দানব ছাড়া অন্য কেউ নয়। আপনি তার মনোযোগ পেয়েছেন, স্যর। দুই শ' গজ দূরে। এগিয়ে আসছে।'

'চিফ?'

'আপাতত টেম্পোরারি সলিউশন পেয়েছি, স্যর। কিন্তু যদি টর্পেডোর বিস্ফোরণ হয়, ওয়েইলারের কেউ বাঁচবে না।'

'স্যর, কামিং! ওয়ান হাণ্ড্রেড ইয়ার্ডস!'

'হেলম, কোর্স পাল্টে নাও যিরো-টু-ফাইভে, সরাসরি বিশ ডিগ্রি কাত হয়ে রওনা হও। থামবে গিয়ে বারো শ' ফুট গভীরে। গতি রাখো পনেরো নটে। দেখা যাক আমাদের পিছু নেয় কি না। ওই ওয়েইলার আর এই মাছের মাঝে দূরত্ব চাই।'

কাত হয়ে অগভীর সাগরে নেমে যেতে শুরু করেছে নটিলাস, পিছনে তেড়ে যাচ্ছে মেগালোডন।

ওর দ্বিগুণের চেয়েও বেশি লম্বা নটিলাস।

ওজন তিন হাজার টন।

ওজনে অনেক কম মেগালোডন, কিন্তু ঝট্ করে সাঁতার কেটে নানাদিকে সরতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা, কেউ চ্যালেঞ্জ করলে পাল্টা জবাব দিতেই হবে প্রাপ্তবয়স্ক মেগালোডনকে।

উপর থেকে সাবমেরিনের খোল লক্ষ্য করে নেমে আসছে ষাট ফুটি লোকোমোটিভের মত।

'ধাক্কার জন্য প্রস্তুত থাকুন!' চিৎকার করল সোনারম্যান। ঝট্ করে মাথা থেকে খুলে ফেলেছে হেডসেট।

'বুম!'

ভয়ঙ্কর ঝাঁকি খেয়ে একপাশে কাত হয়ে গেল নটিলাস।

সিট থেকে ছিটকে পড়ল ক্রুরা।

বন্ধ হয়ে গেল পাওয়ার।

চারপাশ এখন ঘুটঘুটে আঁধার।

গোঙাচ্ছে ইস্পাতের খোল।

কয়েক সেকেণ্ড পর টিপটিপ করে জ্বলে উঠল লাল ইমার্জেন্সি বাতি।

থেমে গেছে ইঞ্জিন।

চুপচাপ ভাসছে নটিলাস।

কাত হয়ে গেছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি।

চ্যালেঞ্জ দেয়া জন্তুটাকে খুব সাবধানে চক্কর কাটল মেগালোডন।

শত্রুকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে।

গুঁতো দিতে গিয়ে স্নাউটে বেশ ব্যথা লেগেছে।

আস্তে করে মাথা দোলাল মেগা।

মাড়ি থেকে খসে পড়ল কয়েকটা দাঁত।

চিন্তা নেই, আগামী কয়েকদিনেই গজিয়ে যাবে ক্ষুরধার ছোরাগুলো আবার।

ডানচোখে গরম কী যেন পড়ছে, টের পেল ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার।

কেটে গেছে কপাল।

বিরক্ত হয়ে গলা ছাড়ল, 'সব স্টেশন! রিপোর্ট করো!'

সবার আগে বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার ম্যাককমন, 'ইঞ্জিনরুমে তিন নম্বর কমপার্টমেন্টে পানি ঢুকছে, স্যর। রিঅ্যাক্টর অফ-লাইন হয়ে গেছে।'

'রেডিয়েশন?'

'এখনও কোনও লিক দেখিনি।'

'ব্যাটারি?'

'মনে হচ্ছে ঠিকই আছে, ক্যাপ্টেন। কিন্তু স্টার্ন প্লেনগুলো ঠিক কাজ করছে না। কিলের উপর জোর ধাক্কা খেয়েছে।'

'কুত্তির বাচ্চা!' রেগে গেল ফ্রেড স্কিলার। ভয়ঙ্কর বিরক্ত হয়ে উঠছে, সামান্য এক মাছ পঙ্গু করে দিয়েছে একটা সাবমেরিনকে! 'ওই মেগালোডন এখন কোথায়?'

'আমাদেরকে ঘিরে চক্কর কাটছে, স্যর,' বলল সোনারম্যান। 'খুব কাছে।'

'ক্যাপ্টেন,' বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, 'ড্যামেজ কন্ট্রোল থেকে বলছে: নষ্ট হয়ে গেছে একটা ইঞ্জিন বা প্রপেলার, অন্যটা দশ মিনিটের ভেতর চালু হবে। আপাতত ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চলবে।'

'টর্পেডোগুলো?'

'তৈরি, স্যর।'

'চিফ, দুই টর্পেডো টিউব ফ্লাড করুন। সোনার, আমি জানতে চাই কখন ফায়ারিং সলিউশন মিলবে।'

আবারও গুঙিয়ে উঠল সাবমেরিনের খোল।

হঠাৎ পিচকারির মত পানি নামল কন্ট্রোল রুমের ছাত থেকে।

'সোনার...'

'স্যর?' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সোনারম্যান। 'আমার মনে হয় কামড়ে সাবমেরিনের খোল তুলে নিতে চাইছে মেগালোডন!'

ওয়েইলারের শেষ কোঅর্ডিনেটসে উপস্থিত হয়েছে নিতু, কিন্তু চারপাশের সাগরে কোথাও দেখা গেল না জাহাজটাকে।

মেগালোডন ঠেলে রেখেছিল বলে ভাসছিল, একটু আগেই তলিয়ে গেছে।

রানা, নাসিম ও ডক্টর ম্যাককমন লাইফ জ্যাকেট পরে বেরিয়ে এসেছে ডেকে। কোমরে আটকে নিয়েছে শক্ত দড়ি।

বো-র সামনে চলে গেছে তিনজন।

এখন সার্চলাইট তাক করছে ফিল ম্যাককমন।

নাসিম আহমেদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে রানা, হাতে ডার্ট ভরা রাইফেল।

ওদের দু'জনের অন্যহাতে লাইফ রিং।

সাগরে কাউকে দেখলে ওগুলো ছুঁড়ে দেবে।

দানবীয় সব ঢেউয়ের ভিতর উঠছে-নামছে জাহাজ।

বো-র উপর উঠে আসছে বিশাল সব ঢেউ, যে-কোনও সময়ে রানা, নাসিম ও ম্যাককমন ছিটকে পড়বে সাগরে, বা রেলিঙে আছড়ে পড়ে আহত হবে।

'ওই যে!' হঠাৎ স্টারবোর্ড সাইডে আঙুল দেখালেন নাসিম।

ঝট্ করে ওদিকে চাইল রানা।

ওয়েইলারের মাস্তুল বলতে আছে সামান্য একটা দণ্ড, সেখান থেকেই ঝুলছে দুই লোক।

ওদিকে সার্চলাইট তাক করল ম্যাককমন, ওয়াকি-টকিতে বলতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেনের উদ্দেশে।

ডানদিকে বাঁক নিতে শুরু করেছে ফ্রিগেট নিতু।

ডক্টর নাসিমের হাতে রাইফেল ধরিয়ে দিল রানা, একহাতে শক্ত করে ধরল রেলিং, অন্যহাতে লোকগুলোর দিকে ছুঁড়ল লাইফ রিং।

চোখের সামনে আকাশে উঠছে গোটা সাগর, আবারও নেমে

যাচ্ছে পাতালের দিকে।

ওরা যেন চেপেছে পাগলা ঘোড়ার পিঠে, বেদম নাচতে শুরু করেছে নিতু।

বোঝা গেল না কোথায় গেল রানার লাইফ রিং।

সাগরের কোথায় লোকগুলো, আঁচ করা অসম্ভব।

রেলিঙে ঝুঁকে তাদেরকে খুঁজতে শুরু করেছে রানা।

'না, রানা!' ঝড়ের উপর দিয়ে চিৎকার করলেন নাসিম।

'ভুল করবেন না, মিস্টার রানা!' সতর্ক করল ম্যাককমনও। 'এই খ্যাপা সাগরে ওদের কাছে পৌঁছুতে পারবেন না!'

সাগরের দিকে চেয়ে আছে রানা।

বিদ্যুদ্বেগে তিরিশ ফুট নেমে গেল নিতুর বো, অথচ মাত্র দশ গজ দূরে শুরু হয়েছে নতুন ঢেউ।

আবারও উঠতে শুরু করেছে বো।

তখনই সার্চলাইটের আলো পড়ল এক লোকের উপর।

মাস্তুল ধরে একহাত নাড়ছে সে।

'আমার কোমরের দড়ি ধরার জন্যে লোকের ব্যবস্থা করুন, নাসিম ভাই!' ঝড়ের উপর দিয়ে বলল রানা।

'কী বললেন আপনি?' বোকার মত বলল ম্যাককমন।

যা বুঝবার বুঝেছেন নাসিম আহমেদ।

তাঁর দিকে চাওয়ার সময় নেই রানার, এক পা তুলে ফেলেছে রেলিঙে।

ঠিক তখনই আবারও আকাশ স্পর্শ করতে রওনা হলো নিতুর বো।

চিলের মত ভেসে উঠে সামনে ডাইভ দিল রানা, পেরিয়ে গেল সামনের ঢেউটাকে।

পতন হতেই জমিয়ে দিল ওকে সাগরের বরফ-ঠাণ্ডা পানি। ভুস করে বুক থেকে বেরিয়ে গেল সমস্ত বাতাস। হঠাৎ যেন শেষ

হয়ে গেছে সব শক্তি। পরের ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে উঠল। কোথাও কিছু দেখতে পেল না। শুধু বুঝল, বামদিকে ছিল লোকগুলো। ওদিকে রওনা হয়ে চমকে গেল।

সাগর-সমতল ছিটকে উপরে উঠছে, আবারও নেমে আসছে ঝুপ্ করে।

এই তুমুল ঝড়ে সাঁতার কাটবার উপায় নেই।

পাহাড়ের মত সব ঢেউয়ে কিছুই করতে পারবে না রানা।

এমনসময় শক্ত কী যেন ঠকাস্ করে লাগল ওর মাথার পাশে, সঙ্গে সঙ্গে আঁধার নামল দুই চোখে।

ওই কালো দৈত্যটা বেঁচে আছে কি না, নিশ্চিত নয় মেগালোডন।

তীক্ষ্ণ চিৎকার বন্ধ করেছে মাছটা।

অদ্ভুত, ওটাকে কামড়ে ধরা যায় না। মেগালোডন বুঝে গেছে, ওটা খাওয়ার জিনিস নয়।

আবারও চক্কর কাটতে শুরু করেছে ওটা।

মাঝে মাঝে মস্ত হাঁ করে কামড় বসাতে চাইছে কালো মাছের গায়ে, কিন্তু ওটা এতই বড়, কোনও অংশ মুখে পুরে নেয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ সাগরের উপরে কম্পন টের পেল মেগালোডন।

নিজের স্ক্রিনের দিকে ইশারা করল রেইডারম্যান। 'ক্যাপ্টেন, ওটা সরে যেতে শুরু করেছে!'

'কথা ঠিক, স্যর,' নিশ্চিত করল সোনারম্যান। 'ওপরের দিকে যাচ্ছে।'

'ঠিক হয়েছে ইঞ্জিন, ক্যাপ্টেন,' রিপোর্ট দিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার কনি ম্যাককমন।

তার কথায় সায় দিতেই যেন সোজা হলো সাবমেরিন।

'লক্ষ্মী মেয়ে নটিলাস,' খুশি হলো ফ্রেড স্কিলার। 'হেলম, নাক ঘুরিয়ে নাও, কোর্স হবে যিরো-ফাইভ-যিরো, প্লেনে দশ ডিগ্রি। আমাদেরকে একহাজার ফুট গভীরতায় স্থির করো। চিফ, আমি ওই দানবের উপর ফায়ারিং সলিউশন চাই। দেরি না করে আবারও সোনারের আওয়াজ শুরু করুন। উপর থেকে তেড়ে এলে একসঙ্গে দুই টর্পেডো চালাব ওটার উপর!'

চিন্তিত দেখাল কনি ম্যাককমনকে। 'স্যর, আমার ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান বলে, আবারও মুখোমুখি হামলা হলে টিকবে না নটিলাস। আমার পরামর্শঃ স্যর, দেরি না করে পার্ল হার্বারে...'

'নেগেটিভ, মিস্টার ম্যাককমন। সব ঝামেলা শেষ করে তারপর বাড়ি ফিরব আমরা।'

শক্তিশালী এক হাত খপ্ করে ধরল কলার, টেনে তুলে আনল ওকে—পুরোপুরি ফিরে এল রানার জ্ঞান। ওয়েইলারের সিনিয়র মেট ভড়ভড় করে কী সব বলছে আঞ্চলিক জাপানি ভাষায়।

খুশিতে বকবক করে চলেছে লোকটা।

ঘুরে দেখতে চাইল রানা।

দ্বিতীয় নাবিক হারিয়ে গেছে মাস্তুল থেকে।

কোমরে জোরালো টান পড়ল রানার।

নাসিম আহমেদ এবং নিতুর নাবিকরা টানছে, ওকে টেনে তুলবে জাহাজে।

নাগাসাকির সিনিয়র মেটকে পিছন থেকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখল রানা।

ওদের দু'জনকে তুলে নেয়া হচ্ছে জাহাজে।

বিশেষ কম্পনে মন দিয়েছে মেগালোডন, তীব্র গতি তুলে উঠে চলেছে শিকারের দিকে। আর মাত্র এক শ' ফুট গেলেই তাজা

খাবার। কিন্তু ঠিক তখনই আবারও পিং-পিং আওয়াজ শুরু হলো। উষ্ণ রক্তের সুবাস পেয়েছে মেগা, কিন্তু আক্রমণাত্মক শত্রুর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল সে, খিদের কথা ভুলে ঘুরেই রওনা হয়ে গেল শত্রু বধ করতে।

'ছয় শ' গজ, আরও দ্রুত আসছে, ক্যাপ্টেন,' প্রায় চিৎকার করল সোনারম্যান।

'চিফ ম্যাককমন, ফায়ারিং সলিউশন পেয়েছেন?'

'জী, স্যর।'

'তা হলে আমার কথা অনুযায়ী...'

'দুই হাজার ফুট...'

'সবাই শান্ত থাকুন।'

'দেড় হাজার ফুট...'

'আসুক...'

'একহাজার ফুট, স্যর!'

'ওটাকে আরও আসতে দিন...'

'স্যর, কোর্স পাল্টে নিয়েছে!' ঝট্ করে মুখ তুলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। 'স্ক্রিন থেকে হারিয়ে গেছে!'

দৌড়ে গিয়ে কন্সোলের সামনে থামল ক্যাপ্টেন স্কিলার, গাল বেয়ে নামছে ঘাম ও রক্তের ফোঁটা। 'কী হয়েছে?'

নিজের কন্সোলের উপর ঝুঁকে গেছে সোনারম্যান। কাপের মত করে হাত রেখেছে কানের উপর। 'স্যর, আরও গভীরে যাচ্ছে। আওয়াজ শুনছি। একমিনিট... চার হাজার ফুট... হায় ঈশ্বর, ওটা আমাদের ঠিক নীচে!'

'ফুল স্পিড অ্যাহেড!' হুঙ্কার ছাড়ল স্কিলার।

হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল প্রাচীন সাবমেরিন।

দশ নট গতি তুলতে গিয়ে হিমশিম খেতে শুরু করেছে।

গভীর থেকে উঠে আসছে কারকারোডন মেগালোডন।

তার মনে হয়েছে শত্রুর লেজে হামলা করাই উচিত।

পঁয়ত্রিশ নট গতি তুলে বুম করে স্টিলের প্লেটে গুঁতো দিল ওর স্নাউট।

ধাক্কা খেয়ে ফুটো হয়ে গেল নটিলাসের খোল।

সঙ্গে সঙ্গে সাগরের পানি ঢুকতে লাগল ইঞ্জিনরুমে।

ফেটে গেছে সাবমেরিনের পিছনের ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক।

নটিলাসের কিল ভরে উঠছে সাগরের পানিতে।

পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাত হয়ে গেছে ক্রু এরিয়া।

সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইঞ্জিনরুম।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ডেনিস রিচার্ড হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আঁধারে। কন্ট্রোল প্যানেলে মাথা ঠুকে জ্ঞান হারিয়েছে।

একটা বিধ্বস্ত বাল্কহেডের নীচে নিজেকে আবিষ্কার করল লেফটেন্যান্ট স্কট বার্নস, গুঁড়িয়ে গেছে বাম গোড়ালির হাড়।

পানিতে ভরে উঠতে শুরু করেছে ইঞ্জিনরুম।

টানা হ্যাঁচড়া করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল স্কট বার্নস, হামাগুড়ি দিয়ে উঠে গেল পরের কম্পার্টমেন্টে। সাগরের পানি উঠে আসবার আগেই বন্ধ করে দিল ওয়াটার টাইট হ্যাচ।

'ড্যামেজ রিপোর্ট!' জানতে চাইল ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার।

'ইঞ্জিনরুম ডুবতে শুরু করেছে,' বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। 'মনে করি না...'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই জ্বলে উঠল লাল বাতি, সেই সঙ্গে সাইরেন।

'কোরের হিট বেড়ে গেছে,' চিৎকার করল ইঞ্জিনিয়ার। 'কাউকে বন্ধ করতে হবে রিঅ্যাক্টর।'

'হেলম, ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কগুলোর ভিতর হাই প্রেশার এয়ার দাও,' নির্দেশ দিল স্কিলার। 'ম্যাককমনকে যেতে হবে রিঅ্যাক্টর

রুমে...'

'আমি যাচ্ছি, স্যর!' ছুট দিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

উপরে উঠতে শুরু করেছে নটিলাস, স্টারবোর্ডে এখনও কাত হয়ে আছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি।

সবার হৈ-চৈ-এর ভিতর ছুটছে কনি ম্যাককমন।

প্রতিটি কম্পার্টমেন্টের ক্রুরা চেষ্টা করছে আহতদেরকে সেবা দেয়ার। সরিয়ে নিচ্ছে সাগরের পানির কাছ থেকে।

অসংখ্য ফুটো হয়েছে সাবমেরিনের খোলে।

পিচকারির মত ঢুকছে পানি।

থেমে গেছে অন্তত ছয়টা ইলেকট্রিকাল কন্সোল।

পাগলের মত সুইচ অন-অফ করছে লেফটেন্যান্ট স্কট বার্নস, বন্ধ করতে চাইছে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর।

এমনসময় কম্পার্টমেন্টে ঢুকল ইঞ্জিনিয়ার কনি ম্যাককমন।

শেষ তিনটে সুইচ বন্ধ করল সে।

থেমে গেল অ্যালার্ম।

'রিপোর্ট, লেফটেন্যান্ট।'

'এখানে চারজন মারা গেছে, স্যর। ধাক্কা খেয়ে খসে পড়েছিল পুরো এক সেকশন পাইপ। ইঞ্জিনরুমের পিছনের সবই এখন পানির নীচে।'

'রেডিয়েশন?'

চিফ ইঞ্জিনিয়ারের দিকে চাইল অফিসার। আস্তে করে মাথা নাড়ল। 'স্যর, এ সাবমেরিনের বয়স উনষাট বছর, হারিয়ে গেছে খোলের টিকে থাকার শক্তি। মরচে ধরা পুরনো টিনের মত খসে পড়ছে স্টিলের প্লেট। স্যর, রেডিয়েশন আমাদেরকে শেষ করার আগেই পানিতে ডুবে মরতে চলেছি আমরা।'

উনিশ

মাসুদ রানা ও জাপানি নাবিককে তুলে আনা হলো জাহাজের ডেকে। ভেজা বেড়ালের মত অবস্থা দু'জনের। ওদেরকে সরিয়ে নেয়া হলো পাইলট হাউসে।

'আপনি কি পাগল?' খেপে গিয়ে রানার কাছে কৈফিয়ত চাইল ডাক্তার ম্যাককমন। 'এই ঝড়ের মধ্যে এভাবে কেউ ঝাঁপ দেয় সাগরে?'

'ডাক্তার, মাথা ঠাণ্ডা করুন,' বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড। 'আমরা নটিলাস থেকে ডিসট্রেস কল পাচ্ছি।'

জাপানি নাবিককে নিয়ে যাওয়া হলো একতলা নীচের ডেকে।

অন্যরা এইমাত্র কমাণ্ড সেণ্টারে এসে ঢুকেছে।

'কী বলছে ওরা?' জানতে চাইল ডাক্তার ম্যাককমন।

কান ঢেকে কাপ তৈরি করেছে সোনারম্যান। মনোযোগ দিয়ে শুনতে চাইছে। 'ওরা উঠে আসছে ওপরে। ইঞ্জিন চলছে না। জরুরি সাহায্য চাই ওদের!'

একের পর এক নির্দেশ দিল ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন।

বাঁক নিল নিতু।

বিশ ফুটি একেকটা ঢেউয়ের বিরুদ্ধে লড়ছে।

কতক্ষণ জ্ঞান ছিল না, জানে না ডেনিস রিচার্ড।

এইমাত্র হুঁশ ফিরেছে।

ওয়াটার টাইট দরজার পাশে চুপ করে পড়ে আছে।

ভিতরে রয়ে গেছে সামান্য বাতাস।

চেম্বারে জ্বলছে লাল বাতি।

কপাল ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে ডেনিসের।

উপরে উঠছে নটিলাস, ওটার খোল থেকে সাগরে বেরুচ্ছে নানা আবর্জনা।

সাবমেরিনের সঙ্গে উঠছে মেগালোডনও।

কিছু নড়লেই খপ্ করে চোয়ালে পুরে নিচ্ছে সেটা।

রক্তের গন্ধ পেয়েছে শিকারি দানবী।

স্নাউট দিয়ে স্টিলের কয়েকটা প্লেট খসিয়ে ফেলেছে, এখন সাবমেরিনের খোলে ভরতে চাইছে মস্ত মাথা।

নীচের কম্পার্টমেন্টে মেগালোডনের ত্বকের মৃদু সাদা আলো।

পানি উঠে আসছে এই কম্পার্টমেন্টে, তলিয়ে গেল মেঝে।

দু' মিনিট পেরুবার আগেই ডুবে গেল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, নীচের ঘরের দিকে চাইল। চমকে গেল ভীষণ ভয়ে।

পুরো কম্পার্টমেণ্ট জুড়ে নয় ফুট চওড়া মুখ মেলে রেখেছে সাদা দানবটা!

মাথা থেকে সামনে বেড়ে আছে উপরের চোয়াল।

দেখলে মনে হয় থ্রি-ডি হরর সিনেমা শুরু হয়েছে।

ত্রিকোণ ভয়ঙ্কর দাঁতগুলো মাত্র পাঁচ ফুট দূরে!

ডেনিস রিচার্ড টের পেল, শোঁ-শোঁ করে পানি টেনে ওকে মুখে পুরতে চাইছে দানবটা!

দরজা জাপ্টে ধরে নিজেকে সামলে রাখতে চাইল ডেনিস, কাঁদতে শুরু করেছে।

পানির ভিতর টান খেয়ে নীচে নামছে তার শরীর।

নোনা পানিতে দম নিল, ভরে গেল ফুসফুস। বেদম কাশি। একটু আগে প্রার্থনা করেছে: নয় ইঞ্চি দাঁতগুলো ওকে ছিঁড়ে

ফেলার আগেই যেন শ্বাস আটকে মারা যায় সে!

প্রার্থনা মঞ্জুর হলো না। যিশুরও ক্ষমতার একটা সীমা আছে।

ইঞ্জিনিয়ারের দেহ সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল মেগালোডনের মুখে, একবার চিবিয়েই কোঁৎ করে গিলে নিল।

উষ্ণ রক্তের স্বাদে নতুন করে পাগল হয়ে উঠল মেগা।

ঘন ঘন মাথা নাড়তে শুরু করেছে।

সাবমেরিনের গর্ত থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চক্কর কাটতে শুরু করল নটিলাসকে।

এইমাত্র সাগর-সমতলে উঠে এসেছে সাবমেরিন।

'সাবমেরিন থেকে বেরিয়ে পড়ো সবাই! সবাই, বেরিয়ে যাও নটিলাস থেকে!' কয়েকবার চিৎকার করে আদেশ দিল ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার। প্রবল ঢেউ ডানদিকে কাত করে ফেলেছে সাবমেরিন নটিলাসকে।

ঝটাং করে খুলে গেল তিন হ্যাচ।

খোলের ভিতর ঢুকতে শুরু করেছে সাগরের পানি।

লালচে ফসফোরেসেন্ট ফ্লেয়ার ছোঁড়া হলো আঁধার আকাশে।

আট ফুট দৈর্ঘ্যের তিনটে হলদে ভেলা নামিয়ে দেয়া হয়েছে সাগরে। একমিনিট পেরুবার আগেই ভেলায় উঠল জীবিতরা। খ্যাপা সাগরে টিকে থাকতে চেষ্টা করছে সবাই।

একটু দূরে নিতু, পথ দেখাতে শুরু করেছে ওটার স্পটলাইট

শেষ ভেলায় উঠেছে ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিতেই পরিত্যক্ত নটিলাসের দিকে চাইল সে। মাত্র কয়েক মুহূর্ত, তারপর সাগরের নীচে তলিয়ে যেতে শুরু করল ওটা।

একসময়ের সেরা সাবমেরিন উপরে তুলল নাকটা—যেন শেষবারের মত শ্বাস নিল বুক ভরে, তারপর চিরকালের জন্য

নেমে গেল গভীর কবরে।

ঝলসে উঠছে রুপালি বিজলি।

প্রথম ভেলা পৌঁছে গেল নিতুর পাশে।

হুড়মুড় করে স্টারবোর্ডের কার্গো নেটে উঠে এল পনেরোজন।

দড়াম করে জাহাজে বাড়ি দিল আরেকটা ঢেউ।

আকাশের দিকে রওনা হয়েছে জাহাজ।

পরক্ষণে তিরিশ ফুট নীচে নেমে গেল নিতু।

তারই ভিতর ক্যাপ্টেন স্কিলারের একজন নাবিককে হ্যাঁচকা টান দিয়ে কেড়ে নিয়ে গেল নিষ্ঠুর সাগর।

স্পটলাইট পাগলা ঢেউয়ের উপর তাক করল রানা।

ওই নাবিক নটিলাসের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কনি ম্যাককমন।

ছোট ভাইকে দেখতে পেয়েছে ডাক্তার ম্যাককমনও।

নিতু থেকে মাত্র পনেরা ফুট দূরে ভাসতে চাইছে বেচারা।

নিতু থেকে একটা লাইফ রিং ছুঁড়ে দিল রানা।

একই সময়ে জাহাজের কাছে চলে এল দ্বিতীয় ক্রাফট।

রানার ছুঁড়ে দেয়া লাইফ প্রিযার্ভার খপ্ করে ধরল কনি ম্যাককমন, তার বড় ভাই দড়ি টেনে তাকে সরিয়ে নিতে চাইল।

দ্বিতীয় রাফটের নাবিকরা উঠতে শুরু করেছে জাহাজে।

তৃতীয় ভেলা চলে এসেছে নিতুর মাত্র দশ ফুট দূরে।

নেট বেয়ে উঠছে কনি ম্যাককমন, মাঝামাঝি যেতেই পৌঁছে গেল তার সঙ্গীরা।

তারাও উঠতে শুরু করেছে নেট বেয়ে।

আর তখনই খাড়া এক ঢেউয়ে সিধে হয়ে আকাশ ছুঁতে চাইল নিতু।

রেলিঙের পাশে চুপ করে পড়ে আছে ফিল ম্যাককমন, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ছোট ভাইয়ের দিকে।

দু'জনের হাতের মাঝে মাত্র তিন ফুট দূরত্ব।

'কনি, হাত দাও!' চিৎকার করল ডাক্তার ফিল।

মুহূর্তের জন্য পরস্পরের হাত ছুঁয়ে গেল।

ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ।

ঢেউয়ের ভিতর থেকে উঠে এল মস্ত এক সাদা স্তম্ভ।

ওটা খপ্ করে চোয়ালে পুরে নিল কনি ম্যাককমনকে।

হতবাক হয়ে গেছে ডাক্তার ফিল ম্যাককমন।

তার থেকে মাত্র একফুট দূরে মেগালোডন। যেন দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত ঝুলে থাকল আকাশে, তারপর আবারও ধড়াস্ করে নেমে গেল সাগরে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ছোট ভাই কনি ম্যাককমনকে।

'না! না! না!' অসহায় ভঙ্গিতে চিৎকার করে উঠল ডাক্তার। বোকার মত চেয়ে রইল সাগরের দিকে। হাতটা এখনও সামনে বাড়ানো। যেন আশা করছে, প্রিয় ছোট ভাইকে ফিরিয়ে দেবে মেগালোডন।

নিজ চোখে দৃশ্যটা দেখেছে ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার এবং অন্যরা। ভীষণ ভয় পেয়েছে সবাই। পিঁপড়ের মত পিলপিল করে উঠতে শুরু করেছে কার্গো নেট বেয়ে।

আবারও লাফিয়ে উঠল কারকারোডন মেগালোডন।

ফ্রিগেটের আলোয় দেখা গেল ওটার রক্তাক্ত দাঁত।

বিকট আর্তচিৎকার জুড়েছে ক্যাপ্টেন স্কিলার, শুয়ে পড়ল কার্গো নেটে।

বামহাতে সার্চলাইট ঘুরিয়েই মেগালোডনের চোখে অত্যুজ্জ্বল আলো ফেলল রানা। অন্যহাত রাইফেলে। তাক করবার সময় নেই, টিপে দিল ট্রিগার। ব্যারেল থেকে ছিটকে বেরুল ডার্ট।

ঠকাস্ করে ওটার ডানদিকের পেক্টোরাল ফিনের কাছে বিঁধল ওটা।

ভীষণ জ্বলতে শুরু করল ওটার ত্বক।

সার্চ লাইটের শক্তিশালী আলোর ঝলক অন্ধ করে দিয়েছে মেগালোডনকে। পুড়ছে দানবের চোখের টিশ্যু। এতই ব্যথা, নাগালের মধ্যে স্কিলারকে পেয়েও পিছিয়ে ঝুপ করে নামল সাগরে, মুহূর্তে হারিয়ে গেল নীচে।

এই সুযোগে ফ্রিগেট নিতুর ডেকে উঠল স্কিলার ও তার নাবিকরা। একেকজন হুমড়ি খেয়ে পড়ছে আরেকজনের ওপর। তাদেরকে সাহায্য করছে জাহাজের নাবিকরা, নিয়ে চলেছে সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর।

ফ্রেড স্কিলারের হাত ধরে টেনে তুলল রানা।

ডক্টর নাসিম আহমেদ তুললেন ডাক্তার ফিল ম্যাককমনকে।

সে কিছুতেই রেলিং থেকে সরে যেতে রাজি নয়।

জোর করে তাকে সরিয়ে নিলেন নাসিম।

'তুই শেষ, শুয়োরের বাচ্চা, শুনছিস আমার কথা?' ঝড়ের ভিতর গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে ফিল ম্যাককমন। 'সব শেষ হয়ে যায়নি! আমি তোকে খুন করব! দেখিস, করবই!'

বিশ

আজ বিশেষ দিন, জড়ো হয়েছে ছয় শ'র বেশি দর্শক। দাওয়াত পেয়ে উপস্থিত হয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর। নামকরা অনেকেই এসেছেন। বাজনা বাজিয়ে চলেছে এক স্কুলের মার্চিং ব্যাণ্ড। গোটা অনুষ্ঠান কাভার করছে চারটে টেলিভিশন

নেটওঅর্ক। আজই খুলে দেয়া হয়েছে টয়োডা সিনোসুকা মেমোরিয়াল লেগুন। প্রকাণ্ড ফটক সরে যেতেই প্রশান্ত মহাসাগরের বিপুল পানি ঝাঁপিয়ে এসে ঢুকেছে ভিতরে। উপত্যকাটা হয়ে উঠেছে মানুষের তৈরি করা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুইমিং পুল।

নীচের অবযার্ভেশন ডেকে মানামি সিনোসুকার পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। এই বিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে পারছে না। মস্ত সব বাঁধ ও বাড়ির নকশা থেকে জ্ঞান নিয়ে তৈরি করা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের পাশেই এই লেগুন। সাগর ও লেগুনের মাঝে চওড়া খাল। সাগর থেকে অনায়াসে লেগুনের ভিতর ঢুকতে পারবে তিমির পাল। আবার ইচ্ছে হলে বেরিয়েও যেতে পারবে সাগরে। তিমিদেরকে সহজেই দেখা যাবে ফ্যাসিলিটি ঘেরা বাইশ ফুটি অ্যাক্রেলিক জানালা দিয়ে। লেগুনের নীচ থেকেও দেখার ব্যবস্থা আছে।

দুই সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে ওয়েইলার ও সাবমেরিন বিপর্যয়ের। টয়োডা সিনোসুকা নেই। নাগাসাকির চোদ্দজন নাবিক এবং সাবমেরিন নটিলাসের ঊনত্রিশজন নাবিক করুণভাবে মারা গেছে। পার্ল হার্বারে এই মানুষগুলোর জন্য একটি শোকানুষ্ঠান করা হয়েছে। তার দুই দিন পর নেভি থেকে রিটায়ার করেছে ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার।

পার্ল হার্বারের কমাণ্ডার ফিলিপ গোল্ডম্যানের চাকরি নিয়ে টানাটানি চলছে। প্রশ্ন উঠেছে: কে হুকুম দিয়েছিল ইউনাইটেড স্টেটস নেভিকে মেগালোডনের পিছু নিতে? আর ওই মিশনে নটিলাসকে কেন পাঠাল গোল্ডম্যান? তার জানা থাকার কথা, ওই সাবমেরিনকে কয়েক দশক আগে কাজ থেকে অবসর দেয়া হয়েছে। লড়বার সাধ্য ছিল না ওটার।

নাবিকদের আত্মীয়-স্বজনরা খেপে উঠেছে, বাধ্য হয়ে তদন্ত

কমিটি গঠন করেছে পেন্টাগন।

অনেকে ধারণা করছে, শীঘ্রি অবসরে যেতে হবে কমাণ্ডার ফিলিপ গোল্ডম্যানকেও।

এদিকে খ্যাপা কুকুর হয়ে উঠেছে ডাক্তার ফিল ম্যাককমন। তিনবছর আগে মা মারা যাওয়ার পর তার একমাত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলতে ছিল শুধু ছোট ভাই কনি ম্যাককমন। এখন আর কিছু ভাবতে পারছে না ডাক্তার ম্যাককমন, একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে মেগালোডনকে ঘৃণা করা। পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে যাচ্ছে তার অন্তরটা। তামেশু সিনোসুকাকে জানিয়ে দিয়েছে, ওই হারামি হাঙরটাকে ধরতে যাওয়ার পাগলামির ভিতর সে থাকবে না। তার নিজেরই আলাদা পরিকল্পনা আছে। নিজ হাতে ওই শ্বেত-ইবলিশকে খুন করবে সে। সাগরে হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর ওয়াহু থেকে সরাসরি ক্যালিফোর্নিয়ায় ফিরেছে ফিল ম্যাককমন।

সাংবাদিক ডন রে-র কল্যাণে নটিলাস বিপর্যয়ের চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস্ এবং ওয়াশিংটন পোস্টে ছাপা হয়েছে: শীঘ্রি কারকারোডন মেগালোডনকে ধরবার জন্য সাগরে নামছে সিনোসুকা ইন্সটিটিউট।

এ খবর ছড়িয়ে যেতেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে মিডিয়া।

এতে গোপনে খুশি হয়ে উঠেছে জাপান মেরিন সায়েন্স টেকনোলজি সেণ্টার। যত প্রচার, ততই সুবিধা। যখন সত্যি আটক মেগালোডনকে দেখতে উপচে পড়বে হাজারো মানুষ, আসতে শুরু করবে বিপুল অর্থ। এসব ভেবেই ফাণ্ড দিয়েছে তারা। প্রতিদিন চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলেছে লেগুনে। এখন একটা জিনিসেরই অভাব: কখন আসছেন অতিসম্মানিত কারকারোডন মেগালোডন!

লেগুনের পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছে রানা: পেরিয়ে গেছে বেশ

কয়েকটা দিন, কিন্তু এখনও এদিকে আসবার কোনও নামগন্ধ নেই মহিলার।

সাবমেরিন নটিলাসে হামলার পরের ছয় রাত মেগালোডনের জন্য হাওয়াইয়ের উপকূলীয় সাগর কপ্টার নিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে রানা ও বাড।

কাজ ঠিকই করেছে হোমিং ডিভাইস, কপ্টারে করে দানবীর পিছু নিয়েছে ওরা।

ডুবে গেছে মেগালোডন, পিছু নিয়েছে ফ্রিগেট নিতুও।

হয়তো ব্যথার কারণেই সাগরের গভীরে থেকেছে ওটা, উঠে আসেনি। তারপর সপ্তম দিন হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল সিগনাল।

পরের দু'দিন চারপাশের সাগরে কপ্টার নিয়ে ঘুরেছে রানা ও বাড। শেষে নাসিম আহমেদের সঙ্গে আলাপের পর তামেশু সিনোসুকাকে জানিয়ে দিয়েছে রানাঃ নিতু ফিরে যাক মণ্টেরেই-তে। এমন হতে পারে, ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেছে মেগালোডন, ভবঘুরে তিমির পালকে অনুসরণ করছে।

কিন্তু এসবের পর পেরিয়ে গেছে আরও সাত দিন।

কোনও খোঁজ নেই মেগার।

এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ ওটা গেল কোথায়?

টয়োডা সিনোসুকা লেগুনের পশ্চিম দেয়াল থেকে মাত্র দুই শ' গজ দূরেই গভীর সাগরে মণ্টেরেই-বে ক্যানিয়ন। লক্ষ লক্ষ বছর আগে ফাটল তৈরি হয়েছিল উত্তর আমেরিকার প্লেটে। ওই গভীর খাদ সাগরের মেঝে চিরে গেছে কমপক্ষে ষাট মাইল। এ এলাকার গভীরতা একমাইলের চেয়ে বেশি। ক্যানিয়ন মিশেছে সাগরের মেঝেতে, শেষে নেমে গেছে বারো হাজার ফুট গভীরে।

মণ্টেরেই-বে ক্যানিয়ন আসলে মণ্টেরেই-বে ন্যাশনাল মেরিন স্যাংচুয়ারির মূল অংশ। ওটা দেশের সবচেয়ে বড় মেরিন ওয়াইল্ড

লাইফ প্রিযার্ভ। অন্য সব জাতীয় উদ্যানের মতই এ স্যাংচুয়ারির পানিকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে, আকারে কানেকটিকাটের চেয়েও বড়। মেরিন পার্ক শুরু হয়েছে স্যান ফ্রান্সিসকোর পশ্চিমের ফ্যারালন আইল্যাণ্ড থেকে, দক্ষিণে চলে গেছে তিন শ' মাইল, থেমেছে ক্যালিফোর্নিয়ার ক্যামব্রিয়ার কাছে। সাগরতলের এ পার্কে রয়েছে সাতাশ প্রজাতির স্তন্যপায়ী, তিন শ' পঁয়তাল্লিশ প্রজাতির মাছ, সাড়ে চার শ' অ্যালজি এবং বাইশ ধরনের প্রায়-বিলুপ্ত প্রজাতি। এ জলোদ্যানে প্রতি বছর বিশ হাজার তিমি আসছে সন্তান উৎপাদনের জন্য।

এখন তাদেরই একজন ক্যানিয়নের খাড়া দুই দেয়ালের মাঝের ছয় শ' ফুট গভীর দিয়ে চলেছে পাঁচ নট গতিতে। সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাণী। দৈর্ঘ্যে ছিয়ানব্বুই ফুট, ওজন প্রায় এক শ' টন। মাদি নীল তিমি সাঁতারের ফাঁকে তার বেলিন গ্রুভে ধরছে অতি খুদে হাজার হাজার প্ল্যাঙ্কটন।

বাতাস নিতে উপরে উঠছে নিরীহ দানবীর ছয়মাস বয়সী বাছুর। পূর্ণবয়স্ক ম্যামালদেরকে প্রতি ঘণ্টায় বড়জোর তিন থেকে পাঁচবার দম নিতে হয়, কিন্তু তাদের বাচ্চাদের ভেসে উঠতে হয় প্রতি চার বা পাঁচ মিনিটে। ফলে মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যায় প্রতি কয়েক মিনিট পর পর।

মন্টেরেই-বের পাঁচ মাইল দক্ষিণে, ঘুটঘুটে আঁধারে ক্যানিয়নের পাথুরে মেঝের একটু উপর দিয়ে চলেছে ফ্লুরেসেন্ট বাতির মত ম্লান সাদা আলোময় কী যেন। তিমি খুঁজতে গিয়ে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উপকূলীয় এলাকা ছেড়েছে সে। ইকুয়েটর পেরিয়ে এই দক্ষিণ-পুবের সাগরের উষ্ণ স্রোতে চলে এসেছে। খোলা হাওয়ায় যেমন ওড়ে বোয়িং ৭৪৭, ঠিক সেইভাবে সাগরতলে উষ্ণ স্রোতে ভাসছে কারকারোডন মেগালোডন। পৌঁছে গেছে গ্যালাপাগোস

আইল্যাণ্ডস, ভাল লেগেছে ওর প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় পরিবেশ। সোজা মধ্য আমেরিকার উত্তর দিকে এসেছে, আসবার পথে শিকার করেছে ধূসর তিমি ও তাদের শাবকগুলোকে।

বাজা-র উপকূলীয় পানিতে এসে অস্থির হয়ে উঠেছে মেগা। শুনছে দশ হাজার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। নড়ছে হাজার হাজার পেশি। উত্তেজনায় পাগল হয়ে গেছে সে, শিকারির ইন্দ্রিয় তাকে টেনে এনেছে উত্তরদিকের মণ্টেরেই-বে ক্যানিয়নে।

ক্যানিয়নের মেঝের হাইড্রোথার্মাল ভেণ্টগুলো পরিচিত লেগেছে তার। জোরালো স্রোত ও তাপমাত্রা মনে করিয়ে দিয়েছে জন্মস্থান ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চকে।

অভ্যাস অনুযায়ী ষাট ফুটি মেগা সাম্রাজ্যবাদী, এখানে এসেই মনে হয়েছে, নতুন এই রাজ্য শুধু তার। কেউ প্রতিবাদ করে দেখুক একবার।

তাকে ঠেকাবে কে!

আশপাশের প্রতিটি প্রজাতি জেনে গেছে, ভয়ঙ্কর কোনও শিকারি এসেছে। এরই ভিতর টের পেয়েছে সে, এ এলাকায় তার সমকক্ষ পূর্ণবয়স্ক আর কোনও মেগালোডন নেই।

কেউ চ্যালেঞ্জ করবে না তাকে।

কাজেই সহজে দখলে রাখতে পারবে এ রাজ্য।

তিনঘণ্টা হলো নীল তিমি ও তার সন্তানের পিছু নিয়েছে মেগালোডন। দেহের পাশের অগভীর নালা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জেনে গেছে, যদি হামলা করতেই হয়, ছোট প্রাণীটাকে আক্রমণ করাই ভাল।

তবুও অপেক্ষা করছে, দূরে দূরে থাকছে।

উজ্জ্বল আলো পড়ে কানা হয়ে গেছে ডান চোখ, চাইছে না রোদ লেগে অন্ধ হয়ে যাক বাম চোখও।

অনুসরণ করছে শিকারকে, ক্রমে হয়ে উঠছে অধৈর্য। তবে

আগে নামুক রাত। তখন পেট পুরে খাবার পাবে।

ছয় শ' ফুট গভীর সাগরের উপর ভাসছে ইয়ট লাভ অ্যাট সি। মৃদু ঢেউ দোলাচ্ছে ওটাকে। সাগরে প্রতিফলিত হচ্ছে দিন শেষের সোনালী রোদ। একটু পর নামবে আঁধার। ইয়টের মেইন ডেকে অ্যানি ল্যামবার্টের ক্রুরা ক্লান্ত চোখে দেখছে ক্যালিফোর্নিয়া সিল ও সি লায়নগুলোকে। ফ্যারালনের পাথুরে সৈকতের উপর পড়ে আছে ওগুলো।

অ্যানি ল্যামবার্ট যখন জানল, নাসিম আহমেদ ধারণা করছে আগে হোক বা পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় আসবে মেগালোডন, তখনই ঠিক করেছে, আগেভাগেই ক্রুদের নিয়ে হাজির থাকবে ফ্যারালন দ্বীপপুঞ্জে।

সাগরের এই এলাকাকে বলা হয় রেড ট্রায়াঙ্গল।

পৃথিবীর সমস্ত শ্বেত-হাঙরের হামলার পঞ্চাশ ভাগ ঘটনা ঘটে এই এলাকায়।

নাসিম আহমেদের ধারণা সঠিক হওয়ারই কথা।

সময় নষ্ট না করে চলে আসবার কথা মেগালোডনের।

এখানে অনায়াসেই পাবে লাখ লাখ সি লায়ন।

শ্বেত-হাঙররা মহানন্দে শিকার করে ওই প্রাণীগুলোকে।

এখানে আসবার পর পেরিয়ে গেছে পুরো পাঁচ দিন, বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে গেছে ফিল্ম ক্রুরা। একবারের জন্যও দেখা দেয়নি মেগালোডন। ইয়টের ডেকের উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে আণ্ডারওয়াটার ভিডিয়ো ক্যামেরা, অডিয়ো ইকুইপমেন্ট, স্পেশাল আণ্ডারওয়াটার লাইট।

এ ছাড়া আছে শত শত সিগারেটের ফিল্টার ও ক্যাণ্ডি র‍্যাপার। আপার ডেকে লণ্ড্রির জন্য ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে তার। ওটা থেকে ঝুলছে সুইমসুট, আণ্ডারওয়ায়ার ও হাফপ্যান্ট।

বিরক্ত হয়ে গেছে সবাই। সকাল থেকে কড়া রোদ। মাঝে মাঝে এসেছে সি-সিকনেস। ছোট হাঙরগুলোকে আকর্ষণ করতে ফেলা হচ্ছে পচা মাছ। লাভ অ্যাট সি-র কারও সাধ্য নেই যে সাগরে একটা ডুব দেবে। তা-ও হয়তো সহ্য করা যেত, কিন্তু নভেম্বরের এই পরিবেশে ওই ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ মেনে নেয়া পুরোপুরি অসম্ভব।

ইয়টের পিছনে স্টিলের কেবলে আটকে রাখা হয়েছে পচে যাওয়া একটা মর্দা হাম্পব্যাক তিমির লাশ।

বিকট দুর্গন্ধ যেন ঘিরে রেখেছে এই ইয়টকে, প্রমাণ করে দিচ্ছে এখানে একটা জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।

মণ্টেরেই-বে স্যাংচুয়ারিতে তিমি হত্যা করা মস্ত অপরাধ।

ধরা পড়লে জেলও হতে পারে।

অবশ্য, টাকার জোরে হয়তো ঝামেলা সামলে নিতে পারবে মিলিয়োনেয়ার ম্যাক্স ডোনোভান। সে-ই তো দুই স্থানীয় জেলেকে পয়সা খাইয়ে তিমির লাশ এনেছে।

কেউ জিজ্ঞেস করেনি ওটা এখানে কেন।

কিন্তু টানা তিরিশ ঘণ্টা পচা মাংসের ঘ্রাণ সহ্য করার পর এখন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে লাভ অ্যাট সি-র ক্রুরা।

'অ্যানি, অ্যানি, অ্যানি, আমার কথাটা শোনো,' কাতর সুরে বলল ডিরেক্টর জর্জ হোম্‌স্‌। 'আমাদেরকে একটু বাঁচতে দাও। এমনও হতে পারে ছয় মাস পর এদিকের সাগরে আসবে তোমার সেই বান্ধবী। ...আমরা যে খুব বেশি কিছু চাইছি তা-ও নয়, চব্বিশ ঘণ্টার জন্য তীরে নামব। হোটেলে উঠে গোসল করব, বিশ্রাম দেব নাকটাকে। আমাদেরকে নামতেই হবে এই দুর্গন্ধওয়ালা ইয়ট থেকে!'

কঠোর মুখে মাথা নাড়ল অ্যানি ল্যামবার্ট। 'জর্জি, এখন যাওয়া চলবে না কোথাও। এই কাহিনি হবে দশ বছরের সেরা

কাহিনি। এখন সব ভণ্ডুল করতে দেব না আমি তোমাদেরকে। তোমরা আসলে চাইছ হোটেলের বারে গিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হতে।'

'অ্যানি, কথাটা ঠিক নয়...'

'জর্জি, ভেবে দেখো সব গুছিয়ে আনতে কত কষ্ট হয়েছে! ...ক্যামেরা ...শার্ক টিউব ...বাদই দিলাম ভাসতে থাকা তিমির লাশটার কথা!'

'হ্যাঁ, ওটার কথা আর বোলো না,' টিটকারির সুরে বলল ডিরেক্টর। 'কোথায় গেল তোমার তিমি রক্ষা করার ক্যাম্পেইন? নিজ চোখে দেখেছি সেভ দ্য ওয়েইল ফাউণ্ডেশনের তরফ থেকে লুফে নিলে গোল্ডেন ঈগল। বক্তৃতায় কত কথাই না বলেছ!'

'ক্রাইস্ট, জর্জি! কবে বড়দের মত ভাবতে শিখবে তুমি? আমি তো ওই তিমিকে খুন করিনি! টোপ হিসাবে ব্যবহার করছি মাত্র। চারপাশ দেখে এসো, এই স্যাংচুয়ারিতে ঢুকছে হাজার হাজার প্রাণী। তাদের কাউকে বিরক্ত করছি না। বাস্তবে পা দাও, জর্জি, নিশ্চয়ই বুঝছ আমাদের সামনে ঝুলছে এ দশকের সেরা কাহিনি?' বারকয়েক মাথা নাড়ল অ্যানি, কাঁধে এলিয়ে পড়ল সোনার তারের মত চুলগুলো।

'অ্যানি,' গলা নিচু করল জর্জ হোমস, 'তুমি আসলে কল্পনায় ডুবে আছ। ভেবে দেখো, রেড ট্রায়াঙ্গলে মেগালোডন আসবে সে সম্ভাবনা কতটুকু? গত দু' সপ্তাহে কেউ ওটাকে দেখেনি কোথাও।'

'শোনো, জর্জি, ফালতু লোক আমার স্বামী নাসিম আহমেদ, কিন্তু একটা বিষয়ে সেরা— সে চেনে এসব মেগালোডনকে। বাজি ধরতে পারো, সত্যিই হাজির হবে ওটা। আর আমরাও ঠিকই সেরা সব ছবি ও ফিল্ম তুলব।'

'তখন ঢুকবে ওই প্লাস্টিকে? ক্রাইস্ট, অ্যানি, তুমি বোধহয় আত্মহত্যা করতে চাও?'

মিষ্টি করে হাসল অ্যানি। 'ওই প্লাস্টিক আসলে তিন ইঞ্চি পুরু প্লেক্সিগ্লাস। এতই পুরু, কামড়ে কিছুতেই ভাঙতে পারবে না মেগালোডন। তোমরা ইয়টে যতটা নিরাপদ, তার চেয়ে ঢের বেশি নিরাপদে থাকব আমি ওটার ভেতর।'

'শুনে খুব আনন্দ পেলাম!' নাক কুঁচকে ফেলেছে জর্জ।

ডিরেক্টরের রোমশ, ঘর্মাক্ত বুকে সরু আঙুল বোলাল অ্যানি। ওর জানা আছে, ম্যাক্স এখনও বিছানায়, ঘুমিয়ে হ্যাংওভার কাটাতে চাইছে।

'জর্জি, আমরা একই প্রজেক্টে পাশাপাশি কাজ করেছি, এখনও করছি। একবার ভাবো ওই ডকুমেণ্টারি দিয়ে কত উপকার করেছি তিমিগুলোর?'

নাক শিঁটকে ফেলল হোমস। 'ওসব ওই মরা হাম্পব্যাকটাকে শোনাও গিয়ে।'

'ওটার কথা ভুলে যাও,' পুরুষ সঙ্গীর তেলতেলে দুই কাঁধ দুই হাতে খপ্ করে ধরল অ্যানি। 'জর্জি ডার্লিং, তুমি বুঝছ না? এটা আমাদের কত বড় সুযোগ! এ কাহিনি আমাদেরকে তুলে দেবে টপে। দু'জনই সেরা হয়ে উঠব। শুনতে কেমন লাগবে তোমার: এগযেকিউটিভ প্রডিউসার?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল হোমস, তারপর হাসল। 'শুনতে ভালই তো লাগছে!'

'ধরে নাও, ওই পদ পেয়ে গেছ তুমি। এবার লক্ষ্মী ছেলের মত ভুলে যাও মরা তিমির কথা। ঠিক আছে?'

'ভুলে গেছি কখন! এগযেকিউটিভ প্রোডিউসার হিসাবে ভাবছি: অধৈর্য হয়ে গেছে ফিল্ম ক্রুরা, অন্যদিকে সরিয়ে দিতে হবে ওদের মন। এমন কিছু চাই, যাতে সবাই খুশি হয়।'

'এ নিয়ে ভেবেছি আমি। শার্ক টিউবে নেমে টেস্ট রান করলে কেমন হয়? পানিতে একা আমি, আজই তুলব কয়েকটা ফুটেজ।'

'হুম্, মন্দ হয় না, আর এই সুযোগে পানির নীচে আলোর সেটিংটা বুঝে নিতে পারব আমি,' মুচকি হাসল হোমস। 'বলা যায় না, কোনও শ্বেত-হাঙরের ভাল ফুটেজও পেয়ে যেতে পারো। ওটা পেলেও ধরে নেয়া যায়, ট্রিপ সফল হয়েছে আমাদের।'

'আসলে তোমার বড় সমস্যা কী জানো, জর্জি, মাই লাভ? সবসময় কম আশা করো তুমি। নিজের ভাল চাইলে লেগে থাকো আমার সঙ্গে।' মাতৃস্নেহের ভঙ্গিতে জর্জের গালে আলতো টোকা দিল অ্যানি। ওয়েট সুট তুলতে নিচু হয়ে জর্জ হোমস্‌কে দেখতে দিল ট্যান করা স্তন। সোজা হয়ে মিষ্টি হাসল। 'আরেকটা কথা, ভুলেও ডোনোভানের সামনে এগযেকিউটিভ প্রডিউসার বা এ ধরনের কথা মুখেও নেবে না। ও খুব জেলাস ফিল করে।'

একুশ

মেগালোডনটাকে পাগল করে তুলছে হাজারো ধুকপুক করা হৃৎপিণ্ড ও ফিনের কম্পন। ধীরে ধীরে সাগর-সমতলে উঠছে শ্বেতাঙ্গিনী।

অনেক আগেই চারপাশে নেমেছে আঁধার।

মস্ত নীল তিমির বাছুরের সঙ্গে দূরত্ব কমিয়ে এনেছে ধবল শিকারি।

প্লাঙ্কটন খাওয়া থামিয়ে সচেতন হয়ে উঠেছে মা-তিমি। টের পেয়েছে, পিছন থেকে বাচ্চার উপর আসতে পারে ভয়ানক কোনও বিপদ। সাগর-সমতলে উঠে এল সে, নাক দিয়ে ঠেলে

ছেলেকে বুঝিয়ে দিল, এখন থেকে খুব কাছে থাকতে হবে।

আগের চেয়ে গতি বাড়িয়ে দিল মা ও ছেলে।

একমাইল পিছনে আসছে ধবল দানবী। কয়েক মিনিট পর হামলা করবার দূরত্বে পৌঁছে গেল। সামান্য হাঁ হয়ে গেছে মুখ, রওনা হয়েছে ছোট তিমিকে লক্ষ্য করে। তবে খুব সতর্ক, বিশাল তিমি মা-র লেজ থেকে সরে থাকতে হবে। কয়েক মুহূর্ত পর হামলা করবে, এমন সময় অস্বাভাবিক এক ঘটনা ঘটল।

ভীষণ কেঁপে উঠল মেগা, পিঠটা বাঁকা হয়ে যাচ্ছে আপনা-আপনি! শিকারের কথা ভুলে গেল সে, দ্রুত নামতে লাগল ক্যানিয়নের মেঝে লক্ষ্য করে। প্রচণ্ডভাবে থরথর করে কাঁপছে সমস্ত পেশি। পেটের ভিতর তীব্র ব্যথা, ক্রমাগত ঝাঁকি খাচ্ছে শরীরের ভেতরটা। সেই সঙ্গে কাঁপুনি... নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কিছুতেই। প্রায় গোল হয়ে চক্কর কাটছে। ঠিক তখনই তার গোটা কাঠামোয় প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়ে বাম ওভিডাক্ট থেকে বেরিয়ে এল শাবক।

ওটা মর্দা, ধবধবে সাদা, দৈর্ঘ্যে আট ফুট। এখনই ওজন পনেরো শ' পাউণ্ড। দাঁতগুলো ছোট, কিন্তু মা-র দাঁতের চেয়ে অনেক বেশি ধারালো। সম্পূর্ণ জাগ্রত ইন্দ্রিয়, জন্মেছে শিকারি চেতনা নিয়েই, এখনই জানা হয়ে গেছে, যেভাবে হোক বাঁচতে হবে। দুই সেকেণ্ড একই জায়গায় ভাসল, বরফ-নীল চোখে দেখল মাকে, কীভাবে যেন বুঝে গেল, পড়েছে মস্ত বিপদে। পরক্ষণে ঝড়ের গতি তুলে সাঁৎ করে হারিয়ে গেল ক্যানিয়নের দক্ষিণে।

এখনও ঝাঁকি খেতে খেতে একই জায়গায় চক্কর কাটছে মেগালোডন। আবারও দেহের অভ্যন্তরে শুরু হয়েছে থরথর কম্পন। এবার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এল দ্বিতীয় শাবকের লেজ, তারপর দেহ।

এবারের শাবক মাদি, ভাইয়ের চেয়ে তিন ফুট বড়।

ঝট্ করে মাকে পাশ কাটাল। আরেকটু হলেই মারা পড়ত। প্রসব বেদনায় দাঁত কিড়মিড় করছে বয়স্কা মাদি, ঝটকা দিচ্ছে নানাদিকে। বিদ্যুদ্বেগে পালিয়ে গেল মাদি শাবক।

আবার শুরু হয়েছে খিঁচুনি। এবার গর্ভ থেকে বেরিয়ে এল তৃতীয় ও শেষ শাবক। ছিটকে বেরুল ধোঁয়া বা মেঘের মত রক্ত ও এমব্রায়োনিক ফ্লুইড। এসব আর্বজনা থেকে সরে নীচে রওনা হলো সাড়ে সাত ফুটি পুরুষ মেগালোডন। চোখ পরিষ্কার করে নেয়ার জন্য বারবার নাড়ছে মাথা।

ঠিক তখনই পিছনে নড়ে উঠল ওটার মা, হাঁ করেই ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল সন্তানের লেজ ও যৌনাঙ্গ। ছটফট করতে করতে মেঝের দিকে নামছে রক্তাক্ত শাবক, কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, মরছে খুব কষ্ট পেয়ে। আর তখনই আবার ধেয়ে এল মা-জননী, আরেক কামড় দিয়েই গিলে নিল ওটাকে। বড্ডো খিদে যে!

ক্যানিয়নের মেঝের কাছেই ভাসছে মেগা, প্রসববেদনা দূর হলেও খুব ক্লান্ত। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিল ক্যানিয়নের স্রোতে। কিছুক্ষণ পর আবারও দু'পাশে দোলাতে লাগল মাথা। বিস্ফারিত হলো নাকের পাটা। পানি থেকে সংগ্রহ করছে নানান তথ্য। চোখের কাজ অনায়াসে চালাতে পারছে নাক দিয়ে।

একটু সচেতন হতেই টের পেল, আশপাশের সাগরে নড়ছে হাজারো তিমি!

ধুপধুপ করছে হাজার হাজার হৃৎপিণ্ড!

আরও কাছে কী যেন!

হ্যাঁ, ওই তো ভেসে আসছে রক্তের লোভনীয় ঘ্রাণ!

লেজ নাড়ল মেগা, উপরে উঠবার ফাঁকে রওনা হয়ে গেল উত্তরদিকে। জানল না, টয়োডা সিনোসুকা মেমোরিয়াল লেগুনে ঢোকার মুখটা মাত্র তিরিশ ফুট দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেছে সে।

লাভ অ্যাট সি ইয়টের বিরক্ত, হতাশ ক্রুদেরকে সামান্যতম সতর্ক না করেই এল ওরা।

প্রথমে ধূসর ডরসাল ফিন দেখতে পেলেন ক্যাপ্টেন রডনি রায়ান। আঁধার নেমে এসেছে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে। ইয়টের স্টারবোর্ডের মাত্র বিশফুট দূরে হাজির হয়েছে ওই হাঙর।

কয়েক মিনিট পর হাজির হলো আরও দুটো পাখনা।

মরা তিমির পচা মাংস টেনে এনেছে ওদেরকে।

ব্যস্ত হয়ে পাইলট হাউস থেকে বেরুলেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা ভেবে অ্যানি ল্যামবার্টকে সাবধান করতে গেলেন না।

একটু দূরে লুমিনেসেন্ট সাদা ওয়েট সুট পরে নাইট ডাইভের জন্য তৈরি হচ্ছে অ্যানি।

'তুমি না অ্যাকশন চাও? কেমন লাগবে তিনটা শ্বেত-হাঙরের সঙ্গে টেস্ট ডাইভ দিতে?' হাসি-হাসি ভঙ্গি করে জানতে চাইল ডিরেক্টর জর্জ হোমস।

'এ নিয়ে ভাবছিই না,' হাসল অ্যানি। 'সবাই তৈরি তো?'

'পানিতে দুই রিমোট। সঠিক সময়ে অন করা হবে পানির নীচের বাতি। তোমার জন্য অপেক্ষা করছে প্লাস্টিকের টিউব। ও, আরেকটা কথা, এখনও ঘুমাচ্ছে ম্যাক্স ডোনোভান।'

'তাতে সমস্যা নেই। জর্জি, এমনভাবে ফিল্ম করবে, যেন মনে হয় সাগরে হাঙরের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা আমি। ...আমার টিউবের সঙ্গে কত গজ কেবল দিয়েছ?'

এক পলক ভেবে নিয়ে জবাব দিল ডিরেক্টর, 'সবমিলে ষাট থেকে সত্তর ফুট হবে, কিন্তু তোমাকে আমরা রাখব চল্লিশ ফুটের ভেতর। নইলে আলো পাবে না।'

'ঠিক আছে, আমি তৈরি,' বলল অ্যানি। 'জর্জি, আমার ক্যামেরা দাও। ম্যাক্স জেগে ওঠার আগেই পানিতে নামতে চাই।'

তাড়া খেয়ে ভাগছে এমন ভঙ্গি করে স্টারবোর্ড সাইডে চলে গেল অ্যানি ও জর্জ হোমস। এপাশে নামানো হয়েছে প্লাস্টিকের শার্ক সিলিণ্ডার। স্বচ্ছ জিনিসটা দশ ফুট দৈর্ঘ্যের, ডায়ামিটারে বারো ফুট— অ্যানির জন্য বিশেষভাবে ডিযাইন করা।

হাঙরের ছবি তুলতে সাধারণত ব্যবহার করা হয় স্টিলের খাঁচা, কিন্তু অ্যানির এ জিনিস অত্যাধুনিক। কামড় দিতে পারবে না হাঙর, ভাঙতেও পারবে না। ঠিক চল্লিশ ফুট গভীরতায় ঝুলে থাকবে। ফটোগ্রাফার পরিষ্কার দেখবে চারপাশ। লাভ অ্যাট সি ইয়টের উইঞ্চ থেকে স্টিলের কেবলে ঝুলবে গোটা সিলিণ্ডার।

ইয়টের নীচে দুই রিমোট-কন্ট্রোল্‌ড্ আণ্ডারওয়াটার ক্যামেরা। অপারেট করা হবে ডেকের উপর থেকে। সাগরতলে মেগার চলচ্চিত্র তুলবে অ্যানি, আবার ক্রুদের মুভি ক্যামেরা তুলবে ওর ভিডিও। বাতির পজিশন যদি ঠিক থাকে, পানিতে একেবারে অদৃশ্য মনে হবে শার্ক টিউব। পরে ছায়াছবি দেখলে মনে হবে, খোলা সাগরে হাঙরের সঙ্গে সাঁতার কাটছে দুঃসাহসী অ্যানি ল্যামবার্ট।

মুখে মাস্ক পরে নিল অ্যানি। বুঝে নিল ঠিকঠাক আছে অক্সিজেনের সরবরাহ। গত কয়েকবছর ডাইভ দিয়েছে, কিন্তু কোনদিন রাতে নামেনি। আজকের অভিজ্ঞতা হয়তো পরে কাজে লাগবে।

আগেই ইয়ট থেকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে প্লাস্টিকের টিউব। ভেন্ট হোল দিয়ে পানি ঢুকে ভারী হয়ে উঠেছে, সহজেই ডুববে।

টিউবে ডান পা রাখল অ্যানি, ডানহাতে ধরেছে পাশের স্টিলের কেবল। চট্ করে দেখে নিল চারপাশ।

কয়েক মুহূর্ত পর বুঝল ওর ওপর হামলা করবে না শ্বেত-হাঙর। বাম পা রাখল গার্ডরেলের ওপাশে। টিউবের কিনারে বসে ঝুঁকে হাত বাড়াল। ওর হাতে চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের ভারী মুভি

ক্যামেরা ধরিয়ে দিল জর্জ হোমস।

পুরু কেসিং সরিয়ে টিউবে নামল অ্যানি। পানির ভিতর ভাসছে। মাথার উপর আটকে নিল হ্যাচ।

এবার প্লাস্টিকের টিউবে করে নেমে যাবে সাগরের গভীরে।

ইয়টের দিক থেকে অন্যদিকে বইছে স্রোত।

হোমস এবং এক ক্রু মিলে সাবধানে স্টিলের কেবল ছাড়তে শুরু করেছে।

কয়েক সেকেণ্ডেই পানির নীচে তলিয়ে গেল টিউব, স্রোতের টানে সরে যাচ্ছে ইয়ট থেকে।

'জনি, ঠিক চল্লিশ ফুটে থামবে,' নির্দেশ দিল ডিরেক্টর জর্জ হোমস। 'ট্যালবট, তোমার রিমোটগুলো ঠিকভাবে কাজ করছে?'

গাস ট্যালবট তার ডুয়াল মনিটর থেকে মুখ তুলল। 'রিমোট 'এ' ভাল কাজ করছে না। তবে পার পেয়ে যাব। রিমোট 'বি' নিখুঁত। সরাসরি অ্যানির উপর যুম করতে পারি— ডাইভিং বিকিনি না থাকলেই বোধহয় বেশি জমত।'

আটান্ন ডিগ্রি ঠাণ্ডা পানি আর অ্যাড্রেনালিনের কারণে শিউরে উঠেছে অ্যানি। ধূসর ও কালো ছায়ায় নামছে। বেশিদূর দেখতে পাচ্ছে না। পিছনে দুই রিমোট ক্যামেরা ও বাতির সেটিংস। ঠিক তখনই দপ্ করে জ্বলে উঠল বাতিগুলো। অ্যানির প্লাস্টিকের আশ্রয় থেকে শুরু করে বিশ ফুট এলাকা দিনের মত ফরসা হয়ে গেল। তিন সেকেণ্ড পর বাতির আওতায় ঢুকল প্রথম হাঙর।

একটা মর্দা, স্নাউট থেকে শুরু করে লেজ পর্যন্ত সতেরো ফুট। ওজন পুরো এক টন।

সন্দেহ নিয়ে চক্কর কাটল প্লাস্টিকের টিউবের চারপাশে।

ঘুরে ওটার উপর চোখ রাখল অ্যানি।

পায়ের নীচে কীসের ভীতিকর নড়াচড়া।

তলদেশ থেকে উঠে আসছে পনেরো ফুটি এক মাদি।

ভীষণ ভয় পেয়ে ফিন নেড়ে সরে যেতে চাইল অ্যানি। ভুলেই গেছে, ও আছে নিরাপদ টিউবের ভিতর।

স্নাউট দিয়ে টিউবে গুঁতো দিল হাঙর।

একই সঙ্গে উপরের হ্যাচে মাথার তালু দিয়ে ঢুঁ দিল অ্যানি। দুই সেকেণ্ড পর হেসে ফেলল। বুঝে গেছে বোকা বনেছে।

গাস ট্যালবটও হাসতে শুরু করেছে। দুর্দান্ত ফুটেজ পেয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়েছে অ্যানি। মনে হবে পানির তলে ও একা, আর চারপাশে তিন-তিনটা শ্বেতহাঙর।

নকল বাতির সঙ্গে দারুণ মানিয়ে গেছে সাদা ডাইভ সুট।

দর্শকরা বুঝবে না ওখানে অ্যানির চারপাশে প্রোটেকটিভ টিউব আছে।

'জর্জ, দারুণ ছবি পাচ্ছি,' খুশি হয়ে বলল ট্যালবট। 'দর্শকরা ভীষণ ভয় পাবে। সত্যিই, এসব কাজে দারুণ ন্যাক অ্যানির।'

ছবিতে মনোযোগ দিল জর্জ হোমস।

হাম্পব্যাকের লাশে হামলে পড়েছে তিন হাঙর।

'সব ফিল্ম করো, গাস। পরে হয়তো মেগালোডন আসার আগেই অ্যানিকে বোঝাতে পারব, অত বেশি ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না।'

নিজের অন্তরে হোমস জানে, থামবে না অ্যানি। অনেক বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা মহিলার।

দক্ষিণ উপকূল পাশে রেখে একহাজার ফুট উপর দিয়ে উড়ে চলেছে কপ্টার। নাইট বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে নীচে চেয়ে আছে রানা। মাঝে মাঝে কপ্টারের কারণে ঝাঁকি লাগছে হাতে।

পাশের সিটে বিশ্রাম নিচ্ছেন নাসিম আহমেদ। একটু পর বললেন, 'বহুদিন পর এত তিমি এক জায়গায় দেখছি।'

'কে জানে, আমরা হয়তো সময় নষ্ট করছি,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল

বাড লিটলটন। 'বেশ ক' দিন আগেই ফুরিয়ে যাওয়ার কথা হোমিং ট্র্যান্সমিটারের ব্যাটারি। হয়তো এখন লাখ লাখ মাইল দূরে মেগালোডন।'

'হতে পারে, আবার তা না-ও হতে পারে,' একটু উদাস শোনাল রানার কণ্ঠ।

নাসিম ও রানার চোখ নীচের সাগরের দিকে।

দু'জনই স্পষ্ট বুঝতে পারছে, কী ভাবছে বাড। হতাশ হয়ে পড়েছে। ওকে দোষ দেয়াও যায় না।

নিজের ধারণা থেকে একচুল নড়েনি রানা বা নাসিম, কিন্তু যদি এদিকের সাগরে শিকার করত মেগালোডন, পাওয়া যেত তিমির লাশ।

কিছুই পাওয়া যায়নি।

হোমিং সিগনাল নেই।

ওরা হয়তো খড়ের গাদায় খুঁজছে সামান্য সুঁচ।

রানার খারাপ লাগছে অন্য কারণে।

চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছেন নাসিম আহমেদ।

দু'একবার বলেও ফেলেছেন: পুরো তিনটে বছর নষ্ট করেছি, রানা। কীসের পেছনে ছুটলাম? দুনিয়াকে কী প্রমাণ দেখাব? শেষ হয়ে গেল সংসার, থাকল শুধু কষ্ট আর লাঞ্ছনা। মাঝে মাঝে মনে হয় মরে গেলে...

'অ্যাই, রানা!' আনমনে কথাগুলো ভাবছিল রানা, চমকে গেল বাডের চড়া স্বরের ডাক শুনে। 'রানা, মিস্টার আহমেদ, ওটা কী? মেগালোডন?'

'না... মনে হয়,' সিধে হয়ে বসলেন নাসিম।

'সরাসরি নীচে দেখুন, নাসিম ভাই,' বলল রানা। 'তিমির পালের ভিতর অস্বাভাবিকতা দেখছেন?'

'পাঁচ মিনিট আগেও সব স্বাভাবিক ছিল,' বলল বাড। 'কিন্তু

এখন ওখানে...'

'হ্যাঁ, কোর্স পাল্টে নিয়েছে,' বললেন নাসিম। 'যাওয়ার কথা দক্ষিণে, কিন্তু নীচের পড হঠাৎ করেই বাঁক নিয়েছে পশ্চিমে!'

'তার মানে কাউকে এড়াতে পাল্টে নিচ্ছে গতিপথ?' বলল বাড। 'আমার মনে হয়েছে নীচে সাদা আলোও দেখেছি।'

'চলো, ওদিক থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি,' বলল রানা।

আবারও তিমিগুলোর দিকে চাইল বাড, দেখে নিল থার্মাল ইমেজারে।

যদি উপকূল ধরে উত্তরদিকে আসে মেগালোডন, তিমির পালের খুবই যৌক্তিক কাজ হবে পথ ছেড়ে পালাতে শুরু করা।

এক সেকেণ্ড পর হেলিকপ্টার ঘুরিয়ে নিল লিটলটন, পিছু নিল তিমির পালের।

মনের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার পর ক্যামেরা পরীক্ষা করছে অ্যানি। প্রচুর ফিল্ম আছে। ট্যাঙ্কে আছে বিশ মিনিট চলবার মত অক্সিজেন। হাম্পব্যাকের লাশের নীচে লটকে দেয়া হয়েছে শার্ক টিউব। খুব কাছ থেকে দারুণ সব দৃশ্য তুলতে পারবে।

তবে আজকাল সহজেই মেলে শ্বেতহাঙরের কামড়া-কামড়ির ফুটেজ।

এসব চাই না অ্যানির, ওর দরকার দুনিয়ার সেরা ফিল্ম।

'আমি ফিল্ম নষ্ট করছি,' মনে মনে বলল ও।

ওকে উপরে তুলে নেয়ার জন্য ইশারা করতে গিয়েও থেমে গেল। ভীষণ অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে সাগরের এদিকটায়।

ঝড়ের গতিতে পালিয়ে গেছে তিন তিনটে শ্বেতহাঙর!

আশপাশে একটা পোনা মাছও নেই।

যেন খাঁ-খাঁ করছে সাগর!

উলঙ্গ দেহ থেকে লাথি দিয়ে মখমলের চাদর সরিয়ে দিল ম্যাক্স ডোনোভান, হাত বাড়াল জ্যাক ড্যানিয়েল্‌স্‌-এর বোতলের দিকে। বিরক্ত হয়ে ভাবল, ধুশ্‌শালা, বোতল দেখি খালি!

রেগে গিয়ে উঠে বসল। দপ্‌ দপ্‌ করছে মাথাটা। পুরো দুই দিন যাচ্ছে না এই যন্ত্রণা। 'মারল ওই শালার মরা তিমি,' স্বগতোক্তি করল, 'যেভাবে হোক ভাগাতে হবে ওটাকে!'

টলতে টলতে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল ম্যাক্স, কেবিনেট খুলে বের করল অ্যাসপিরিনের বোতল। কঠিন মনে হলো চাইল্ডপ্রুফ ক্যাপ খোলা। খেপে গিয়ে বলল, 'মরুক শালার ট্যাবলেট!' ধৈর্য হারিয়ে গেছে, কমোডের ভিতর ফেলে দিল বোতল। নিজেকে দেখল আয়নায়। 'ছিহ্‌, তোমার অবস্থা এত করুণ, ম্যাক্স ডোনোভান?' হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। 'মিলিয়োনেয়ারদের খারাপ থাকতে হয় না। নিজের দিকে তাকাও। ভেবে দেখো: কেন এত খারাপ লাগছে তোমার।'

মাথা জুড়ে বেদম ব্যথা। খুব অসুস্থ লাগছে নিজেকে।

'অ্যানির কথায় কোন্‌ দুঃখে এখানে এসেছি? যথেষ্ট হয়েছে, এবার আর নয়!' বাথরোব পরে সুইম ট্রাঙ্ক তুলে নিয়ে খোলা ডেকে উঠতে রওনা হয়ে গেল ম্যাক্স।

দশ সেকেণ্ড পর পৌঁছল আকাশের নীচে। প্রায় হুঙ্কার ছাড়ল, 'অ্যাই! অ্যানি কোথায়?'

ডেকে মন দিয়ে অডিয়ো ট্র্যাক মনিটর করছিল বার ফ্রিম্যান, শান্ত স্বরে বলল, 'অ্যানি টিউবের ভেতর, ডোনোভান। আরে, দারুণ...'

'আমরা এখান থেকে চলে যাব। ...হোমস!'

মুখ তুলল ডিরেক্টর। 'সত্যিই? এটা সারা সপ্তাহের সেরা খবর... কখন যাচ্ছি?'

'এক্ষুনি। টেনে তোলো অ্যানিকে, আর ঘাড় থেকে নামাও

শালার ওই মরা তিমি। যেকোনও সময় আমাদেরকে গ্রেফতার করবে কোস্ট গার্ড।'

'একমিনিট!' মাথার উপর হাত তুলল গাস ট্যালবট। 'কী যেন হচ্ছে নীচে। আমার মনিটর দেখো। আলোকিত হয়ে উঠছে ওদিকটা।'

ম্লান আলো দেখতে পেয়েছে অ্যানি। ওই সাদা আলোয় পরিষ্কার চোখে পড়ছে হাম্পব্যাকের অবশিষ্ট মড়ি। এর মাত্র দু' সেকেণ্ড পর হাজির হলো ওর মা'র মোবাইল হোমের চেয়ে বড় একটা মাথা, একেবারেই সাদা।

নিজ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুনতে পেল অ্যানি। ভালভাবে বুঝল না ওই দানব কত বড় হতে পারে।

অলস ভঙ্গিতে আসছে মড়ি খেতে। একবার খাবারের উপর স্নাউট বোলাল, বুঝে নিল জিনিসটা খাবার কি না।

তারপর হাঁ করল।

প্রথম কামড়ে ছিঁড়ে নিল ব্লাবারের ছয় ফুট টুকরো, পরের সেকেণ্ডে উধাও হলো মাংসটা। চিবুতে শুরু করেছে শক্তিশালী চোয়াল। কানকোর কাছে চলছে থরথর কম্পন। খাওয়ার সময় সামান্য নড়ছে পেটের নীচের পেশি।

আস্তে করে শার্ক টিউবের নীচে বসে পড়ল অ্যানি, নিজ চোখে মেগালোডনকে দেখে সত্যিই ভয় পেয়েছে। বুঝতে দেরি হয়নি ওটা কত ভয়ঙ্কর।

শক্তিশালী।

রাজকীয়।

নড়াচড়া করছে বড় অনায়াসে।

বুঝতে দেয়া চলবে না যে এখানে কেউ আছে। খুব সাবধানে ক্যামেরা তাক করল অ্যানি।

আপনমনে খেয়ে চলেছে ধবল দানবী।

'ক্রাইস্ট!' চেঁচিয়ে উঠল ম্যাক্স, 'দেরি না করে ওকে টেনে তোলো!'

'ম্যাক্স, আমরা এখানে এসেছি এ জন্যেই,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল ডিরেক্টর জর্জ হোমস। 'কী বিশাল! হায় ঈশ্বর, কী সব ফুটেজ!'

'দেরি না করে ওকে তোলো, হোমস,' রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে ম্যাক্স। মনিটরে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মস্ত ওই মেগালোডনকে।

ওটা দেখলে কারও বুঝতে দেরি হবে না, এই মুহূর্তে ভয়ঙ্কর বিপদে আছে অ্যানি।

'খুব রেগে যাবে অ্যানি,' বলল ট্যালবট।

'আমার কথা কানে যাচ্ছে না তোমাদের?' ধমকে উঠল ম্যাক্স। 'এটা আমার ইয়ট! সমস্ত টাকা খরচ করেছি আমি! দেরি না করে এক্ষুনি ওকে টেনে তোলো!'

উইঞ্চ চালু করল জর্জ হোমস।

ঝটকা খেয়ে সোজা হলো ইস্পাতের কেবল, উঠে আসতে শুরু করেছে সিলিণ্ডার।

চারপাশের সামান্যতম নড়াচড়াও পরিষ্কার বোঝে মেগালোডন।

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল। খাবার থেকে মুখ ফেরাল।

কোনও ইলেকট্রনিক কম্পন তৈরি করেনি প্লাস্টিকের শার্ক টিউব, কাজেই পাত্তা দেয়নি সে। কিন্তু জিনিসটা নড়ে উঠতেই খাবার বাদ দিয়ে ওটা দেখতে রওনা হয়ে গেল মেগালোডন।

ভয়ঙ্কর দানবীর দিকে চেয়ে আছে অ্যানি।

ওটা আসছে অনায়াস ভঙ্গিতে।

শার্ক টিউবের ভাঁজে আলতো করে স্নাউট বোলাল। বুঝল না, জিনিসটা আসলে কী। এবার ঘুরে বাম চোখে দেখল।

আমাকে দেখছে, ভাবল অ্যানি।

লাভ অ্যাট সি'র দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে টিউব।

ওই গাধাগুলো আমাকে খুন করাবে, ভাবল অ্যানি। টিউবের দেয়ালে দুই পা বাধিয়ে জুত করে বসল।

বারবার মুখ নাড়ছে মেগালোডন, যেন সাগরতলে অ্যানির সঙ্গে কথা বলছে। হাঁ করে বিস্তৃত করল চোয়াল, মতলব দেখে মনে হলো যেন মুখে পুরে নেবে টিউব।

কিন্তু পিছলে সরে গেল ফস্কা জিনিসটা।

দাঁত বসানো গেল না।

হেসে ফেলল অ্যানি। 'তোর জন্য বেশি বড়, না রে?' সাহস ফিরে পেয়েছে। কাঁধে তুলে নিল ক্যামেরা, মেগার প্রকাণ্ড মুখের ভিডিও তুলতে শুরু করেছে। মাত্র কয়েক ফুট দূরেই ওটা।

'এ ফিল্ম আমাকে অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড এনে দেবে,' ভাবল অ্যানি।

লাভ অ্যাট সি থেকে মাত্র বারো ফুট দূরে শার্ক টিউব, এমন সময় ঘুরেই আরেক দিকে রওনা হলো মেগালোডন। মুহূর্তে মিলিয়ে গেল ধূসর জলের ওপাশে।

বড় করে শ্বাস নিল অ্যানি, আনমনে হাসতে শুরু করেছে।

'হঠাৎ করে চলে গেল,' বলল গাস ট্যালবট।

'যাক, বাঁচা গেছে,' বলল ডোনোভান। 'আবারও আসতে পারে, দেরি না করে ওকে তুলে আনো।'

'হায় ঈশ্বর! হায়-হায়!' চেঁচিয়ে উঠল ট্যালবট।

রেলিং থেকে চার হাত-পায়ে পিছিয়ে এল মাকড়সার মত।

আবারও ফিরেছে মেগালোডন, শার্ক টিউবকে ঝড়ের গতিতে

চক্কর কাটতে শুরু করেছে।

ভীষণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে অ্যানি, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরেছে অক্সিজেন রেগুলেটর। বিস্ফারিত দুই চোখ।

মুখ বাড়িয়ে সিলিণ্ডার কামড়ে ধরতে চাইল বেয়াল্লিশ হাজার পাউণ্ডের দানবী।

টিউবের ভিতর-দেয়ালে ধুপধাপ বাড়ি খেল অ্যানি, ছিটকে পড়ল নানাদিকে। জোরালো সব ধাক্কা খেয়ে চরকির মত ঘুরছে ওর মাথা। সাগরতলে রয়েছে বলে ফেটে যায়নি করোটি।

লাভ অ্যাট সি'র খোলে গুঁতো দিল সিলিণ্ডার, ওদিক থেকে ঠেলছে মেগালোডন। মস্ত হাঁ করেও মুখে নিতে পারছে না গোটা জিনিসটা। শক্তভাবে বসাতে পারছে না মুখ, কিন্তু সিলিণ্ডারের ড্রেনেজের গর্তগুলোকে আঁকড়ে ধরছে দাঁত দিয়ে।

ভীষণ খেপে গেছে দানবী, ভেসে উঠল সমতলে। এখনও মুখে আলগা ভাবে ধরে আছে প্লাস্টিকের সিলিণ্ডার।

ধীরে ধীরে লাভ অ্যাট সি থেকে খোলা সাগরের দিকে ঘুরে গেল ওটা, মুখ দিয়ে ঠেলতে শুরু করেছে টিউব। ওটার কারণে চারপাশে তৈরি হলো বৃত্তাকার ঢেউ।

হঠাৎ করেই ঝড়ের গতি তুলল মেগালোডন।

ঠিক তিন সেকেণ্ড পর ঝটাং করে ছিঁড়ে গেল স্টিলের কেবল।

বাধা দূর হতেই সাগর থেকে লাফিয়ে উঠল মেগালোডন। দেখা গেল ওর সত্যিকারের ভয়ঙ্করত্ব। শার্ক টিউব তুলে ধরেছে চোয়ালে। একের পর এক ঝাঁকি দিচ্ছে। ইঁদুরকে নিয়ে ঠিক যে ভাবে খেলে বিড়াল।

টিউবের ভেণ্ট হোল থেকে ঝরঝর করে পড়ছে পানি।

চোখ বুজে ফেলেছে অ্যানি। সরসর করে নেমে গেল নীচে। টিউবের তলে গুঁতো দিল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। পরের সেকেণ্ডে উল্টো দিকে আছড়ে পড়ল অ্যানি।

শার্ক টিউবের ভিতর ব্যাডমিন্টনের শাটল ককের মত এদিক-ওদিক ছিটকে গিয়ে পড়ছে মেয়েটা।

বিরক্ত হয়ে মুখ থেকে সিলিণ্ডার ছেড়ে দিল মেগালোডন, টুপ করে ওটা তলিয়ে গেল ঢেউয়ের নীচে।

জিনিসটার চারপাশে চক্কর কাটছে ক্ষুধার্ত রাক্ষুসী।

বাইশ

'বাড, দারুণ দামি ইয়ট দেখছি,' গলা উঁচু করল রানা।

আঁধার মহাসাগরে অনেক উপরে উড়ছে ওদের কপ্টার।

রানার চোখে নাইট বিনকিউলার।

পাশের সিটে বসে নীচে চেয়ে আছেন নাসিম আহমেদ, তাঁরও হাতে বিনকিউলার।

চট্ করে থার্মাল ইমেজিং মনিটর দেখল লিটলটন। 'আমিও দেখছি।'

'আমরা আছি কোথায়?' জানতে চাইলেন নাসিম।

'স্যান ফ্রান্সিসকোর ছাব্বিশ মাইল পশ্চিমে, খেয়াল করলে দেখবেন ফ্যারালন দ্বীপপুঞ্জ,' বলল বাড লিটলটন। এইমাত্র মনিটরে উষ্ণ কিছু দেখেছে। সম্ভবত কোনও টুইন ইঞ্জিন। 'আরে, ওই ইয়ট উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কেন?'

'বাড, নামাও তো কপ্টার,' বলল রানা।

পরের কয়েক সেকেণ্ডে পাঁচ শ' ফুট নামল বাডের কপ্টার।

নাইট বিনকিউলার দিয়ে চাইল রানা ও নাসিম।

ঘুম করছে ইয়টের ডেকের উপর।

'আরে... ওটা তো লাভ অ্যাট সি! ম্যাক্স ডোনোভানের!'-গম্ভীর হয়ে গেলেন নাসিম আহমেদ।

'ওই লোকই না আপনার স্ত্রীর প্রতি...' চুপ হয়ে গেল বাড। এক সেকেণ্ড পর বলল, 'কেমন হয় এই উচ্চতা থেকে শালার ইয়টে টুল চেস্ট ফেললে? শালা না মরলেও ইয়ট ডুবলেই দ্বীপে গিয়ে উঠবে।'

'থাক্,' মানা করলেন নাসিম।

'ওই পেট-মোটা মানিব্যাগ শালা এখন এদিকে কী করছে,' রাগ কমেনি বাডের। 'আটষট্টি মিলিয়ন ডলারের ইয়ট এখানে কেন?'

বিনকিউলার থেকে চোখ সরিয়ে নিল রানা। আনমনে বলল, 'লাভ অ্যাট সি কাজে ব্যস্ত।'

পাগল হয়ে উঠেছে ইয়টের ডেকের প্রত্যেকে। ক্যাপ্টেন রডনি রায়ান চালু করেছেন ইঞ্জিনগুলো। আবারও অফ করেছেন সুইচ। ভয় পেতে শুরু করেছেন, এসব আওয়াজে খেপে উঠতে পারে কারকারোডন মেগালোডন।

চেঁচিয়ে সবাইকে নির্দেশ দিয়েছে ডিরেক্টর জর্জ হোমার। যেভাবে হোক এই ফিল্ম ঠিকভাবে নিতেই হবে।

ভীষণ হতভম্ব হয়ে গেছে ম্যাক্স ডোনোভান। হাঁটু গেড়ে বসেছে ডেকে, দুই হাতে চেপে ধরেছে মাথা।

হঠাৎ উপরে হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেয়ে উপরে চাইল সবাই।

বেদম ভয় পেল ম্যাক্স ডোনোভান। ওর মনে হলো, কী করে যেন খবর পেয়ে হাজির হয়েছে কোস্ট গার্ড!

এবার ধরবে ওকে!

কোনও জবাব দিতে পারবে না ও।

এখানে কোত্থেকে এল হাম্পব্যাক তিমির লাশ?

'মিস্টার ডোনোভান,' চিৎকার ছাড়লেন ইয়টের ক্যাপ্টেন রডনি রায়ান, 'হেলিকপ্টার থেকে কে যেন আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। নাম বলছে মাসুদ রানা।'

'চিনি না, এ আবার কে?' পাল্টা জানতে চাইল ম্যাক্স।

দশ সেকেণ্ড পর আবারও বললেন ক্যাপ্টেন, 'নাসিম আহমেদের ভাই! কিছু বলতে চান ডক্টর আহমেদ বা মাসুদ রানাকে?'

লাফিয়ে উঠে দৌড়ে গিয়ে পাইলট হাউসে ঢুকল ম্যাক্স, তুলে নিল মাইক। 'নাসিম? আমার কথা শুনছ? এসব আমার দোষ না! তুমি তো জানো অ্যানি কেমন! যা খুশি করে!'

'শান্ত হোন, ডোনোভান,' উপর থেকে এল রানার কণ্ঠ। 'বলুন কী হয়েছে।'

'ওই মেগালোডন। ওটা নিয়ে গেছে অ্যানিকে। শার্ক টিউবের ভিতর আটকা পড়েছে ও। আমার কিছু করার ছিল না!'

উপর থেকে মেগালোডনকে দেখতে পেয়েছে বাড লিটলটন ও নাসিম। ওদের মনিটরের মাঝে যেন চক্কর কাটছে। সাগরের গভীরতা হবে ওখানে পঞ্চাশ ফুট। লাভ অ্যাট সি'র বো থেকে তিন শ' গজ দূরে।

'অ্যানি আহমেদের থার্মাল রিডিং পাচ্ছি,' বলল বাড। 'ওয়েট সুট পরে আছে।'

রানা ও নাসিম ফোকাস করল নাইট গ্লাস।

'পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে,' বলল রানা।

ফ্লুরেসেন্ট সাদা ওয়েট সুটের একই দৃশ্য দেখছেন নাসিম। চট্ করে তুলে নিলেন রেডিয়োর মাইক। 'ম্যাক্স, ওর ট্যাঙ্কে কতক্ষণের অক্সিজেন আছে?'

ডোনোভানের কাছ থেকে রেডিয়ো মাইক নিয়ে জবাব দিল

হোমস, 'আমি ডিরেক্টর জর্জ হোমস, আর বড়জোর পাঁচ মিনিট বাতাস পাবে। কেউ যদি মেগালোডনকে সরিয়ে দিতে পারে, বাঁচার সুযোগ পাবে অ্যানি।'

চিন্তা শুরু করেছে রানা। নাসিম আহমেদও ভাবছেন।

একই কথা ভাবছে ওরা।

কী পেলে অ্যানির কাছ থেকে সরবে মেগালোডন?

কপ্টার এ মুহূর্তে কোনও কাজে আসবে?

'নাসিম ভাই, ওদিকে যোডিয়াক দেখুন,' চট্ করে বলল রানা।

'হ্যাঁ, কিন্তু...'

'ম্যাক্স ডোনোভানকে জিজ্ঞেস করুন, কাজ করে কি না ওটা।'

নাসিম জানতে চাইলেন রেডিয়োতে।

ম্যাক্স জানাল, 'হ্যাঁ? হ্যাঁ, কাজ করে! ঠিকভাবেই করে!'

'তা হলে লঞ্চ করতে তৈরি হোন,' নির্দেশ দিল রানা।

'আমি যাব,' রানা বলবার আগেই জানিয়ে দিলেন নাসিম।

জেগে থাকতে চাইছে অ্যানি ল্যামবার্ট। সারা দেহে টনটনে ব্যথা। কিন্তু ওই ব্যথাই জাগিয়ে রেখেছে তাকে। ফেস মাস্কে চুলের মত ফাটল ধরেছে, তিরতির করে চোখে এসে পড়ছে পানি। ঝনঝন করছে দুই কানের পর্দা। শ্বাস নিতেও বুকে কষ্ট।

ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে চক্কর কাটা বন্ধ করেনি মেগালোডন, বাম চোখে দেখছে শিকারকে।

ওটার ত্বক থেকে আসছে ভূতুড়ে সাদা আলো।

ওই আলো পড়ে কেমন অদ্ভুত লাগছে অ্যানির ওয়েট সুট।

একবার অক্সিজেনের সাপ্লাই দেখে নিল অ্যানি।

আর মাত্র তিন মিনিট, তারপর...

আগেই সরে যেতে হবে।

ক্যামেরা বুকের কাছে শক্ত করে ধরল অ্যানি, এ জিনিস ফেলে কখনও যাবে না।

'নাসিম ভাই, আমি বরং যাই,' বলেছিল রানা।

মানা করে দিয়েছেন নাসিম আহমেদ।

আপাতত ঝুলছেন কপ্টারের উইঞ্চের কেবল থেকে। পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছেন ডার্ট গান। রানার চেয়ে অনেক কাছ থেকে লক্ষ্যভেদ করবার কথা তাঁর। গলা থেকে ঝুলছে এয়ার ফোন।

'মনে রাখবে, রানা,' গলা উঁচু করলেন নাসিম। 'ওটার চোখে আলো ফেলার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করবে।'

বামদিকের স্পটলাইট দেখল রানা। 'ঠিক আছে, নাসিম ভাই।'

লিটলটন বলল, 'আপনি শুধু খেয়াল রাখুন যেন আপনাকে খেয়ে না ফেলে!'

রানা ও বাডের দিকে চেয়ে বুড়ো আঙুল দেখালেন নাসিম।

উইঞ্চ ব্যবহার করে তাঁকে নামিয়ে দিতে শুরু করেছে রানা।

ভদ্রলোক নামবেন লাভ অ্যাট সি'র ডেকে।

নেমে যাওয়ার সময় কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না।

চার হাতে ডক্টর নাসিমের কোমর ধরে তাঁকে নামিয়ে নিল ডোনোভান ও ক্যাপ্টেন রায়ান।

হার্নেস থেকে বেরিয়ে এলেন নাসিম। 'আর সব রেডি?'

স্টারবোর্ডের রেলিঙের ওপাশটা দেখাল ম্যাক্স ডোনোভান। 'পানিতে নামানো হয়েছে যোডিয়াক। ...এবার, নাসিম?'

'মনোযোগ সরিয়ে নেব মেগালোডনের,' বললেন নাসিম। 'আমার পিছু নেবে। আর সে সুযোগে ইয়ট নিয়ে গিয়ে তুলে নেবে অ্যানিকে।'

নাসিমকে রেলিঙ টপকে নেমে যেতে সাহায্য করল ম্যাক্স।

হলদে রাবারের রাফটের মাঝে দাঁড়ালেন নাসিম।

জনসন মোটর পঁয়ষট্টি হর্সপাওয়ারের। ইঞ্জিন চালু করলেন নাসিম, একবার দেখলেন বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে।

'রানার জন্য অপেক্ষা করবে, ও যখন বলবে মেগালোডন সরে গেছে, তখন গিয়ে তুলে নেবে অ্যানিকে। বুঝতে পেরেছ?'

আস্তে করে মাথা দোলাল ম্যাক্স ডোনোভান।

মাত্র তিন সেকেণ্ড পর রওনা হলো নাসিমের যোডিয়াক। ঝড়ের গতি তুলছে ওটা, সেই সঙ্গে তীক্ষ্ণ আওয়াজ।

'রানা, বাড, কথা শুনতে পাচ্ছ?' গলা উঁচু করলেন নাসিম।

'শুনছি না বললেই চলে,' বলল বাড।

'নাসিম ভাই, ওটার পঞ্চাশ গজের ভেতর যাবেন না,' সতর্ক করল রানা। 'অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে শুরু করেছেন। যে-কোনও সময়ে তেড়ে আসবে!'

উড়ে চলেছে নাসিমের যোডিয়াক, হঠাৎ করেই ডানে পনেরো ফুট দূরে সাগর-সমতল ভেদ করে ভেসে উঠল ডরসাল ফিন।

বিদ্যুদ্বেগে সরতে শুরু করেছেন নাসিম। 'কেমন করছি, রানা-বাড?'

'বামে বাঁক নিন,' কড়া স্বরে সতর্ক করল রানা।

ঘুরে বাম দিকে রওনা হলো নাসিমের যোডিয়াক

এক সেকেণ্ড পর উঠে এসেই খপ্ করে মস্ত মুখ বন্ধ করল মেগালোডন।

প্রাণের তোয়াক্কা করছেন না নাসিম।

'এঁকেবেঁকে ছুটতে শুরু করুন, নাসিম ভাই,' তাড়া দিল রানা। 'গতি বাড়ান! ওটা ঠিক আপনার নীচে!'

ইঞ্জিনকে পূর্ণ গতি দিলেন নাসিম। আশপাশে দেখতে পেলেন না মেগালোডনকে, কিন্তু বুঝলেন ওটা আছে খুব কাছেই!

‘এবার ম্যাক্স ডোনোভান, অ্যানি ল্যামবার্টকে তুলে নিন,’ কপ্টার থেকে জানাল রানা।

ছোট ভাইয়ের প্রাণের বন্ধুর মনোভাব বুঝলেন নাসিম।

মিসেস আহমেদ হিসাবে অ্যানিকে সম্মান দেয়নি রানা, বলেছে অ্যানি ল্যামবার্ট।

লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল লাভ অ্যাট সি ইয়ট, নীল ধোঁয়া বেরুতে শুরু করেছে টুইন ইঞ্জিন থেকে।

এরই ভিতর সিলিণ্ডার থেকে বেরিয়ে এসেছে অ্যানি। পিছনে রেখে এসেছে সবকিছু। ফেলে আসতে পারেনি শুধু ক্যামেরাটা। বহু কষ্ট করে সঙ্গে আনছে।

ফ্লিপার চলছে দ্রুতগতিতে।

একবার ইয়টে পৌঁছতে পারলেই আর কোনও চিন্তা নেই।

‘নাসিম ভাই!’ জোর গলায় ডাকল রানা। ‘ওটা উধাও হয়েছে।’

‘কী? কী বললে?’

নীচের সাগরে চেয়ে আছে রানা। ওর মনে হলো না ধাওয়া বাদ দিয়ে হতাশ হয়ে ফিরছে কারকারোডন মেগালোডন।

কয়েক মুহূর্ত পর বলল রানা, ‘ওটা এখন আর আপনার পিছনে নেই, নাসিম ভাই!’

আঁধারে ধীরে ধীরে উঠছে অ্যানি, কানের ভিতর হৃৎপিণ্ডের দুপদুপ আওয়াজ। কয়েক সেকেণ্ড পর উঠে এল লাভ অ্যাট সি’র দশ ফুট দূরে। বড় করে শ্বাস নিল, শুনল ইয়টে হৈ-হৈ করে উঠেছে প্রোডাকশন ক্রুরা।

‘সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ান তুমি!’ চিৎকার করল গাস ট্যালবট।

‘ইয়টে উঠে এসো, অ্যানি!’ প্রায় ধমকে বলল ম্যাক্স।

অতি ক্লান্ত অ্যানি, কাঁধ থেকে খসিয়ে দিল ভারী অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, দু' পা চালিয়ে আসতে শুরু করল ইয়টের দিকে।

'ম্যাক্স, আমার ক্যামেরা ধরো,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল। জিনিসটা তুলতে কষ্ট হচ্ছে ওর। পানির উপর চল্লিশ পাউণ্ড কম কথা নয়।

রেলিঙের পাশে ঝুঁকে গেল ডোনোভান, আশপাশে কোনও মই নেই। 'ধূর, অ্যানি, তোমাকে তুলে নিতে পারছি না!'

নিজেকে বড্ড দুর্বল মনে হলো অ্যানির। গলা উঁচু করে বলল, 'আগে ক্যামেরা ধরো, ম্যাক্স!'

রেলিঙের ওপাশে ঝুঁকে ক্যামেরা ধরল ম্যাক্স ডোনোভান। জিনিসটা পাশ থেকে নিল ডিরেক্টর, পরক্ষণে ভীষণ চমকে গেল।

সাগরের তলা থেকে উঠে আসছে অ্যানি ল্যামবার্ট।

আছে মস্ত এক মুখে দাঁতের ফাঁকে।

পিলারের মত উঠে আসছে বিশাল মেগালোডন সাগর থেকে।

নীচে ইয়টের ডেক দেখল অ্যানি।

উপরের ডেকে রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন রায়ান, চোখে ভীষণ ভয় ও দুশ্চিন্তা। বুঝতে পারছেন না এবার কী করা উচিত।

সাগরতলের চেয়ে উপরটা অনেক গরম, ভাবল অ্যানি। এক সেকেণ্ড পর টের পেল কোথায় আছে।

প্রকাণ্ড দানবী ঝপাস্ করে নামল সাগরে। ঝট্ করে বুজে ফেলল মুখ।

বুক বেরিয়ে রইল অ্যানির। আটকে আসতে চাইল ওর দম। ফুসফুসে চাপ পড়ছে। ত্রিকোণ ছোরার মত দাঁতগুলো ফুটো করতে শুরু করেছে বুকের পিঞ্জর। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেল সুন্দরী। বেসুরো করুণ এক আর্তনাদ বেরুল মুখ থেকে।

তিন সেকেণ্ড পর থেমে গেল চিৎকার।

পানির নীচে ডুবে গেছে অ্যানি।

ভীষণ ভয় পেয়েছে ম্যাক্স ডোনোভান, থরথর করে কাঁপছে হাত-পা।

ইয়টের আণ্ডারওয়াটার লাইট জ্বলছে। আর সে উজ্জ্বল সাদা আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল দানবের বিশাল মাথা।

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল হতবাক ম্যাক্স।

সাগরের দশফুট নীচে পরিষ্কার দেখা গেল মেগালোডনকে। ওটা যেন হাসছে অ্যানিকে মুখে নিয়ে!

দুই হাত ঝট্‌কাতে শুরু করেছে অ্যানি। পানির নীচে চিৎকার করছে।

ওকে নিয়ে খেলছে মেগালোডন, মস্ত চোয়ালে যুবতীর তন্বী কোমর।

শেষবারের মত ভীষণ এক ঝাঁকি খেল অ্যানি।

চুরচুর হয়ে গেল পাঁজরের সব ক'টা হাড়।

বন্ধুর বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর মুখ থেকে গল গল করে তাজা রক্ত বেরুতে দেখল ম্যাক্স ডোনোভান। বাম চোখ দিয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে মেগালোডন। একবার মুখ বুজে আবারও হাঁ করল। ওই গহ্বরে এখন আর অ্যানি নেই। আছে শুধু ঘুটঘুটে আঁধার।

থ হয়ে গেছে ডোনোভান।

মেগালোডনের মুখ থেকে উঠল লাল বড় একটা রক্তাক্ত বুদ্বুদ!

নড়তে ভুলে গেছে ডোনোভান, বুজে ফেলল দুই চোখ। বুঝতে পেরেছে, এবার মরতে হবে।

যেন আমন্ত্রণ দেয়া হয়েছে, এমন ভঙ্গিতে আবারও উঠে এল মেগালোডন, পরের খাবারের জন্য হাঁ করেছে।

আর তখনই আঁধার চিরে আকাশ থেকে নেমে এল অত্যুজ্জ্বল সাদা কিরণ, যেন ঈশ্বরের তলোয়ার। পুড়ে গেল মেগালোডনের অক্ষত বাম চোখের মণিও। সাদা উত্তপ্ত ব্যথা পাগল করে দিল

তাকে। চিরকালের জন্য অন্ধ হয়ে গেল জানোয়ারটা। ঝটকা দিয়ে সরে যেতে চাইল, কিন্তু যোডিয়াক নিয়ে কাছে পৌঁছে গেছেন নাসিম আহমেদ। প্রায় পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে ডার্ট বিঁধিয়ে দিলেন দানবীর তলপেটে।

চরকির মত ঘুরে গেল মেগালোডন, ছুট দিল খোলা সাগর লক্ষ্য করে। ওই ঢেউ উল্টে ফেলল নাসিমের যোডিয়াকটাকে।

কয়েক সেকেণ্ড পর ভেসে উঠলেন নাসিম, রেলিং ধরে উঠে পড়লেন ইয়টে। অ্যানির কথা জানতে চাইলেন না। সবই দেখেছেন তিনি।

বড় বিষণ্ণ এখন তাঁর মন।

তেইশ

চারপাশ স্তব্ধ। আকাশে চাঁদ বা তারা নেই। সাগর নিথর।

রেলিঙের পাশে দাঁড়িয়ে লাভ অ্যাট সি'র আণ্ডারওয়াটার আলোয় নীচে চেয়ে আছে ম্যাক্স ডোনোভান। হঠাৎ করেই কানের কাছে ফিসফিসে কণ্ঠ শুনতে পেল:

'ম্যাক্স... তুমি কোথায়?'

'অ্যানি? ...অ্যানি?' রেলিঙে ঝুঁকে গেল ম্যাক্স। আঁধার সাগরে চাইল। মনে মনে বলল, আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?

'ম্যাক্স... প্লিজ, সাহায্য করো!' কানে ভেসে এল নিচু স্বর।

'তুমি কোথায়, অ্যানি?' জবাব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করল ম্যাক্স।

কোনও সাড়া নেই।

মস্ত কী যেন উঠে আসছে সাগরের তলা থেকে।

ম্লান আভা, দেখা গেল বিরাট, বিকট মুখ। ওটা সাগর সমতল থেকে অল্প একটু নীচে। খুলে গেল মুখটা। ভিতরে বিরাট কালো গহ্বর।

ভেসে এল নিচু স্বর: 'ম্যাক্স, আমি... মরতে... চাই না!'

'অ্যানি!' গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে অ্যানির মুখ দিয়ে।

দৌড়ে এসে খপ্ করে ম্যাক্সের হাত ধরল নার্স।

'অ্যানি! অ্যানি! অ্যানি! না! না! না!'

ঘুরে গেল ভয়ঙ্কর শ্বেত দানবী, নেমে যাচ্ছে নীচে। ওখান থেকে বের হচ্ছে লাল বুদ্বুদ, তাজা রক্ত কী ভয়ঙ্কর!

ইদানীং দুঃস্বপ্ন দেখে এই রকম চিৎকার শুরু করে ম্যাক্স।

হাসপাতালের আর্দালি এসে ঠেসে ধরল ওকে বিছানার সঙ্গে। বাহুতে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে ঘুমের ওষুধ দিল নার্স। গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিল, 'চিন্তা করবেন না, মিস্টার ডোনোভান, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আপাতত তামেশু সিনোসুকার বাড়িতে উঠেছে রানা ও নাসিম। এখনও স্থির হয়নি কীভাবে আবারও খুঁজে বের করা হবে ওই মেগালোডনকে।

এখন বিকেল তিনটা।

একটু আগে পেট পুরে মানামির রান্না করা চায়নিজ খেয়ে ড্রয়িং রুমে এসে বসেছে ওরা।

টিভিতে সেভেন অ্যাকশন নিউজ চ্যানেল চলছে।

মুখোমুখি সোফায় বসেছে রানা, নাসিম ও তামেশু।

সেভেন অ্যাকশন নিউজ চ্যানেলের তরফ থেকে ডক্টর নাসিম আহমেদকে জানানো হয়েছে, আজ অ্যানি আহমেদের অকল্পনীয়

কিছু ফুটেজ দেখাবে তারা।

কয়েক সেকেণ্ড পর শুরু হলো নিউজ।

শুরুতেই সংক্ষেপে বলা হলো কে এবং কী ছিলেন অ্যানি আহমেদ।

গম্ভীর চেহারার এক লোক বলে চলেছে, '...একটু পর দেখবেন অ্যানি আহমেদের তোলা ফুটেজ। মেগালোডনের হামলায় মারা যাওয়ার কয়েক মিনিট আগে এসব ছবি তোলেন তিনি। গতকাল সেভেন অ্যাকশন নিউজ চ্যানেলের তরফ থেকে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। আজ রাত আটটার সময় মিসেস আহমেদের সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হবে।

'এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়ে রাখি, আজ মেগালোডনকে মন্টেরেই-বে স্যাংচুয়ারির প্রোটেকটেড স্পিশিয় হিসাবে ঘোষণা করেছেন একজন ফেডারাল জাজ। তাঁর রুলিং-এ বলা হয়েছে, প্রায় বিলুপ্ত ওই প্রাণীকে সরকার থেকে নিরাপত্তা দেয়া দায়িত্ব হয়ে উঠেছে। এখন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি ফেডারাল কোর্ট বিল্ডিঙে।'

রিমোট ব্যবহার করে ভলিউম বাড়ালেন তামেশু।

...হ্যাঁ, এইমাত্র বেরিয়ে এসেছেন মোঁসিউ দো টুহোনো। ...মোঁসিউ টুহোনো, আমরা জানতে চাইছি, জাজ এত দ্রুত রুলিং দেয়ায় আপনারা কি বিস্মিত? অনেকেই ভাবেননি মেগালোডন সংরক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহী হবে আদালত। বিশেষ করে এত হামলা ও প্রাণনাশের পর...'

উকিলের পাশে দাঁড়িয়েছে কুস্টো সোসাইটির দো টুহোনো। কয়েকটা টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক মাইক্রোফোন বাড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে।

'না, আমরা মোটেও বিস্মিত নই,' শুরু করল টুহোনো। 'মন্টেরেই স্যাংচুয়ারি ফেডারাল প্রটেকটেড মেরিন পার্ক। ওটার

কাজ সব প্রজাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তা ছোট হোক বা বড়, অটার হোক বা নীল তিমি। ওই মেরিন পার্কে মেগালোডনের মত অন্য অনেক শিকারি প্রাণী রয়েছে। যেমনঃ কিলার ওয়েইল কিংবা শ্বেতহাঙর। আমরা প্রতিবছর ওয়াইট শার্কের আক্রমণে অনেক ডাইভারকে আহত বা নিহত হতে দেখি, কিন্তু এসব ঘটনা কাকতালীয় ছাড়া কিছুই নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, কখনও কখনও সার্ফারদের সিল মনে করে হামলা করে হাঙর। কিন্তু তাদের খাবারের তালিকায় মানুষ নেই। একই কথা বলা চলে ষাট ফুটি কারকারোডন মেগালোডনের বিষয়ে। আর সেকারণেই আরও জরুরি ওই প্রাণীকে নিরাপত্তা দেয়া। আমাদের সবারই দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সাগরে ওটাকে নিরাপদ রাখা।'

'মোঁসিউ দো টুহোনো, কুস্টো সোসাইটির আপনারা সিনোসুকা ওশনোগ্রাফিক ইন্সটিটিউটের পরিকল্পনাকে কী চোখে দেখছেন? আমরা জানতে পেরেছি, ওই ইন্সটিটিউট বন্দি করতে চাইছে কারকারোডন মেগালোডনকে।'

'কুস্টো সোসাইটি বিশ্বাস করে, প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রতিটি প্রাণীর বেঁচে থাকার অধিকার আছে। কিন্তু এমন কিছু প্রজাতি রয়েছে যারা মানুষের সংস্পর্শে বাস করতে পারে না। আমরা মনে করি, ষাট ফুটি আদিম ওই আতঙ্কের জন্য যথেষ্ট বড় টয়োডা সিনোসুকা মেমোরিয়াল লেগুন। ওখানে তার অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সবার জন্যই ভাল হবে মেগালোডনকে ওখানে রাখা।'

সেভেন অ্যাকশন নিউজ চ্যানেল অ্যাংকরকে আবারও দেখা গেল।

'আমাদের মৃত কলিগ অ্যানি আহমেদের সঙ্গে কাজ করত ফিল্ড রিপোর্টার ডন রে। এখন জনগণের মতামত সংগ্রহ করছে সে। এবার কথা বলছি তার সঙ্গে। ...রে?'

টিভির পর্দায় দেখা গেল মোটা ভুরুওয়ালা লোকটাকে।

চট্ করে চিনে ফেললেন নাসিম। গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'ফিল্ড রিপোর্টার?' এক সেকেণ্ড পর বললেন, 'অ্যানির টিভি নেটওঅর্কে কাজ করে? এখন বুঝলাম, আমার সর্বনাশ করতে একে কাজে লাগিয়েছিল অ্যানি, চাইছিল...' চুপ হয়ে গেলেন তিনি।

'সাধারণ মানুষ ভাবছে ওই ধবল দানবীকে বন্দি করা হলে মন্দ হয় না। যদিও বহু মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে ওটা। তাদের মধ্যে রয়েছে আমাদের কলিগ অ্যানি আহমেদও। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ওই দানবী আসলে মস্ত এক অভিশাপ ছাড়া কিছুই নয়। শেষ করে দেয়া উচিত তাকে। এরই ভিতর আলাপ করেছি কয়েকজন বায়োলজিস্টের সঙ্গে। তাঁরা ধারণা করছেন, মানুষের মাংস খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে ওই পিশাচিনী। ফেডারাল কোর্টের রুলিঙের পর এবার ওটার অকাতরে মানব-হত্যা ঠেকাতে পারবে না কেউ। ওই ভয়ঙ্কর প্রাণী যা খুশি করবে! চ্যানেল সেভেন অ্যাকশন নিউজ, ডন রে।'

রানা চেয়ে আছে নাসিম আহমেদের দিকে।

এক এক করে মনের সুতো গুছিয়ে নিচ্ছেন নাসিম।

বোধহয় ভাবছেন, কী ক্ষতি করেছিলাম তোমার, অ্যানি?

পরের দুই দিন দুই রাত ধরে নিতু, ওটার হেলিকপ্টার এবং তিন কোস্ট গার্ড কাটার তন্নতন্ন করে খুঁজল মন্টেরেই-বে স্যাংচুয়ারি।

সবার উদ্দেশ্য মেগালোডনের দেহে গেঁথে দেয়া ট্র্যান্সমিটারের হোমিং সিগনাল ধরা। জিনিসটা তিন মাইলের ভিতর থাকলে সিগনাল দেবে রিসিভার।

কিন্তু উপকূলীয় চার শ' মাইল খুঁজেও কিছুই পাওয়া গেল না।

স্যাংচুয়ারির মাঝ দিয়ে দক্ষিণে চলেছে শত শত তিমি, বিশেষ কোনও পডে অস্বাভাবিক কোনও আচরণ চোখে পড়েনি কারও।

তৃতীয় দিন হতাশ হয়ে তল্লাশী বন্ধ করল কোস্ট গার্ডরা। তাদের ধারণা হলো: ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল থেকে সরে গেছে মেগালোডন, অথবা নষ্ট হয়ে গেছে ট্র্যান্সমিটার।

এরপর আরও দুটো দিন পেরিয়ে গেল, এমন কী হতাশ হয়ে পড়ল নিতুর ক্রুরাও।

হাল ছাড়তে রাজি নয় শুধু মাসুদ রানা, নাসিম আহমেদ ও বাড লিটলটন।

চব্বিশ

তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে দশম বিবাহবার্ষিকী পালন করতে স্যান ফ্রান্সিসকো শহরে এসেছে গ্রেগ ফেরল ও নিনা ফেরল। পিটসবার্গের হিমঠাণ্ডা থেকে এখানে এসে সবাই খুশি। নিজ চোখে কখনও জীবিত তিমি দেখেনি, কাজেই সারাদিন সাগরে তিমির পিছু নেবে শুনে এখন টগবগ করছে ওরা উত্তেজনায়।

স্ত্রীর পিছন পিছন ক্যাপ্টেন অ্যাবির ওয়েইল ওয়াচার বোটে উঠে এসেছে গ্রেগ। পরনে হলদে স্লিকার। কাঁধে, গলায় এবং হাতে ক্যামকর্ডার, বিনকিউলার ও বিশ্বস্ত ৩৫এমএম নাইকন।

এখন মণ্টেরেই-বে জেটির পাশে ভাসছে বেয়াল্লিশ ফুটি বোট। স্টার্নে খালি জায়গা পেয়ে থিতু হলো স্বামী-স্ত্রী এবং ওদের সন্তানরা। আরও সাতাশজন টুরিস্ট কাঠের বেঞ্চগুলোতে বসে অপেক্ষা করছে। একটু পর রওনা হবে জলযান।

মেগালোডনের খবর ছড়িয়ে পড়লে ক্ষতি হয়েছিল মণ্টেরেই'র

ওয়েইল ওয়াচিং টুরের ব্যবসায়। কিন্তু গত কয়েক দিনে আবারও ফিরতে শুরু করেছে টুরিস্টরা। প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলেছে, এর ভিতর কেউ দেখেনি মেগালোডনকে। ওটা দেখা দিত শুধু রাতে। তবুও বাড়তি ঝুঁকি নেয়নি টুর বোটগুলোর মালিকরা, গত কয়েক দিনে সাগরে সূর্যাস্ত দেখাতে নেয়া হয়নি টুরিস্টদেরকে।

'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন,' নাবিকের সাদা পোশাক পরনে লালচে চুলের সুন্দরী এক মেয়ে বলে উঠল, 'ওয়েলকাম অন বোর্ড ক্যাপ্টেন অ্যাবি'য ওয়েইল ওয়াচার। আজ আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব তিমিদের খুব কাছে। আজ সকাল থেকে দারুণ সব খেলা দেখাচ্ছে হাম্পব্যাক তিমিগুলো। আজ সাগরে প্রাণ ভরে ওদেরকে দেখবেন আপনারা। তৈরি রাখুন ক্যামকর্ডার!'

আগেই জেটি থেকে খুলে নেয়া হয়েছে দড়ি, এবার ধ্যার-ধ্যার আওয়াজ তুলে রওনা হয়ে গেল পুরনো বোট। স্টার্নে বসা টুরিস্টদের মাথার উপর লাফিয়ে উঠল নীল ধোঁয়া।

পিএ সিস্টেমে বলে উঠল মোটা পুরুষ কণ্ঠ: 'আশা করি দারুণ উপভোগ করবেন আপনারা। আমাদের বামে দেখছেন বড় এক পাল কিলার ওয়েইল।' বোটের পোর্ট সাইডে চাইল সবাই। সবার হাতে ক্যামেরা। 'এসব কিলার ওয়েইলের আরেক নাম অর্কা। ভয়ঙ্কর চালাক আর সাহসী ওরা। নিজেদের চেয়ে বড় তিমিকেও আক্রমণ করতে ভয় পায় না। ধারণা করছি, ওরা এখন দল বেঁধে শিকারে বেরিয়েছে।'

বোটের বেশ দূর দিয়ে চলেছে উঁচু সব কালো ডরসাল ফিন।

বিনকিউলার দিয়ে তিমির পাল দেখতে শুরু করেছে গ্রেগ।

তিমিগুলো সরে আসছে বোটের দুই শ' গজের ভিতর।

পালে কমপক্ষে তিরিশটা অর্কা।

তাদের দশটা আবার ছোট কিছুর পিছু নিয়েছে।

অন্যরা ঘিরে ফেলছে শিকারকে।

অবাক হয়ে তিমিদের রণকৌশল দেখছে গ্রেগ। হঠাৎ দেখতে পেল একটা হাঙর। ওটা পুরোপুরি সাদা, তিন ফুটি ডরসাল ফিনের অর্ধেক ছিঁড়ে নেয়া হয়েছে।

কিলার ওয়েইলগুলো খুবলে তুলতে চাইছে ওটার মাংস।

গ্রেগ ফেরল জানল না, ওটা সাধারণ কোনও শ্বেত-হাঙর নয়, মেগালোডন পুরুষ শাবকটাকে হত্যা করতে চলেছে ওরা।

নীচ থেকে হামলা করা হচ্ছে তাকে।

বাধ্য হয়ে সাগর-সমতলে উঠে পালাতে চাইছে সে।

ফ্যারালন আইল্যাণ্ডের কাছে ছয়টা অর্কা অনুসরণ করতে শুরু করেছিল ওকে।

তারপর আরও দুই দফায় চব্বিশটা কিলার ওয়েইল এসে যোগ দিয়েছে শিকারে।

এসব ম্যামালদের যুক্তি খুব সোজা: মেগালোডনের বাচ্চাকে কোনওভাবেই বাঁচতে দেয়া যাবে না।

তীব্র গতি ও প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে মেগালোডন শাবকের উপর হামলা করছে অর্কা পুরুষগুলো। ধারালো দাঁতে ছিঁড়ে নিচ্ছে মাংস।

নিজ দাঁত ব্যবহার করে পাল্টা হামলা করছে মেগালোডন শাবক। একটা অর্কা পাশে চলে আসতেই ওটার বুকের পাশের অর্ধেক ফিন ছিঁড়ে নিল সে।

অবশ্য কয়েক সেকেণ্ডেই শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ।

বারোটা অর্কা মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষ করে দিল শত্রুকে।

অর্কাগুলো পঁচিশ ফুটি দানব। একসঙ্গে মিলে ছিঁড়ে ফেলল মেগালোডনের শাবককে।

সাগরের ভবিষ্যৎ একচ্ছত্র রাজা খুব কম বয়সেই মৃত্যুবরণ করল।

নিজের সামান্য যা আছে, সব গুছিয়ে নিয়েছে ম্যাক্স ডোনোভান।

বেশ ক'দিন শেভ করেনি ম্যাক্স।

গা থেকে বেরুচ্ছে বোটকা গন্ধ।

আগে গর্বিত মানুষ ছিল— মিলিয়োনেয়ার।

কিন্তু এখন হয়ে উঠেছে দুর্বল এক ভীতু লোক।

ভীষণ হতাশ।

নিজ চোখে দেখেছে অ্যানি ল্যামবার্টের মৃত্যু।

এসব নিয়ে অনেক ভেবেছে ও।

নিজের মনে বুঝতে দেরি হয়নি, অ্যানি ওর প্রেমিকা ছিল না।

ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ব্যভিচারিণী স্ত্রী ছিল মেয়েটা।

আর সুযোগ পেয়ে তাকে ভোগ করেছে ও।

তাতে কোনও দোষ আছে এমনও ভাবেনি।

শারীরিক চাহিদা তো দু'জনেরই ছিল।

অ্যানি চেয়েছিল নাম ও যশ। ওর মাধ্যমে।

ম্যাক্সের মনে হয়েছিল সুন্দরী মেয়েটা স্বেচ্ছায় বিছানায় এলে মন্দ কী?

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল সব।

মনেও হয়নি নাসিমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে ওরা।

কিন্তু অ্যানি যখন মারা গেল, তারপর থেকেই শুরু হলো সব সমস্যা। চোখের সামনে দেখল, সব জেনেও অ্যানির বিপদে রাফট নিয়ে নেমে গেল নাসিম সাগরে। কই, ও তো পারল না?

প্রমোদ তরীর নিরাপদ ডেক থেকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে ও।

এখন আর ঘুমোতে পারে না ম্যাক্স।

পারে না, তা-ও নয়।

কিন্তু ঘুমালেই আসে ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন।

মেগালোডনের দু পাটি দাঁতের ফাঁকে আটকা পড়েছে অ্যানি।

চিৎকার করতে থাকে মেয়েটা।

বুক-পাঁজর চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়ে।

মুখ থেকে গল গল করে বেরিয়ে আসে তাজা রক্ত।

শুধু তাই?

ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে অ্যানির চেহারা!

ঘুমের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর উপর।

অ্যানি নিজেই যেন মস্ত এক মেগালোডন!

নিজের বিকট আর্তচিৎকার শুনে ঘুম ভাঙে ম্যাক্সের।

তখন মনে হয়, ও আছে লাভ অ্যাট সি ইয়টে।

সাগর থেকে উঠে আসছে মেগালোডন আর ওই অ্যানি!

ওই হারামজাদী মেয়েলোকটা আসলে মরে গিয়ে মেরে রেখে গেছে ওকে!

গত বেশ কয়েক দিন ঘুমাতে পারেনি ম্যাক্স।

এসেছে ঘুম, আর তারপরই মারাত্মক সেই রক্তাক্ত দুঃস্বপ্ন!

হাসপাতালের তৃতীয়তলার ডানদিকের উইঙে সবাই জেনে গেছে, এখানে চিকিৎসা চলছে এক বদ্ধ পাগলের।

আজকাল ব্যস্ত হয়ে ম্যাক্সের ঘুম ভাঙায় নার্স, তখনও চিৎকার করতে থাকে ও।

চারপাশে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে।

এ পর্যায়ে আর্দালিরা বেঁধে ফেলে ওর হাত-পা বিছানার স্ট্যাণ্ডে। ইনজেক্ট করা হয় ঘুমের ওষুধ। কারও চোখে-মুখে কোন সহানুভূতি নেই, সবাই জানে বন্ধুর বউকে নিয়ে ফুর্তি করতে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে ওর।

এই কয়েকদিনে বুঝে গেছে ম্যাক্স, আসল কথা হচ্ছে, ও মরে যাচ্ছে, না কি বাঁচবে— এ নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।

নিজ শহরের হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ও, কিন্তু একটা বন্ধুও আসেনি ওকে দেখতে।

নিজেই বোঝে ও: কেন আসবে কেউ?

নিরীহ, ভদ্র প্রফেসর নাসিমের সঙ্গে কী আচরণ করেছে ও?

নাসিমের বউকে নিয়ে অবৈধ মৌজ করতে গিয়ে...

অথচ, একসময় সবাই ওর সঙ্গে মিশত।

এখন আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না ওর।

কিছুই খেতে মন চায় না।

ডাক্তাররা ধারণা করেছেন, কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াতে গেলে সেটা ওর জন্য সত্যিকারের চিকিৎসার কাজ করতে পারে।

দু'দিন আগে ওকে দেখে গেছেন একজন নামকরা সাই-কিয়াট্রিস্ট। তাঁর ডায়াগনসিস: তীব্র আতঙ্ক ও পাপবোধ ওকে দগ্ধে মারছে।

বোধহয় তখনই ঠিক হয়েছে, হাসপাতাল ডিসচার্জ করবে ওকে।

আর আজ হাসপাতাল ছেড়ে চলে যাবে ও।

কেউ আসেনি ওকে নিয়ে যেতে।

কয়েক মিনিট পর ওর পাশে এসে দাঁড়াল নার্স। যেমন নিয়ম, হুইল চেয়ারে করে ম্যাক্সকে নীচতলা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে সে।

'মিস্টার ডোনোভান, আপনার জন্য কেউ আসেননি?' জানতে চাইল নার্স।

'না।'

'কিন্তু, স্যর, কেউ না এলে আপনাকে ডিসচার্জ করি কী করে?'

'আমরা এসেছি, মিস্টার ডোনোভান,' এইমাত্র ঘরে ঢুকেছে বয়স্ক এক লোক। তার পিছনে আরেকজন। বয়স তার চেয়ে অল্প একটু কম।

'মিস্টার ডোনোভান, আমাদেরকে আপনি চেনেন না। আমার নাম ডক্টর ফিল ম্যাককমন। আর ইনি নিউক্লিয়ার সাবমেরিন নটিলাসের রিটায়ার্ড ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার।' হাত বাড়িয়ে দিল

ডাক্তার।

হাতটা ধরল না ম্যাক্স। নার্সের দিকে চাইল। 'আমি এদের চিনি না। আর সত্যি বলতে, পরিচিত হওয়ার ইচ্ছেও নেই। আমাকে নিয়ে যান নীচে।'

চাকা ঘুরিয়ে ম্যাক্সের হুইলচেয়ার সামনে বাড়াল নার্স।

পিছু নিল ম্যাককমন ও স্কিলার।

'একমিনিট, মিস্টার ডোনোভান, জরুরি আলাপ করতে চাই,' হুইলচেয়ারের সামনে হাঁটছে ডাক্তার। 'মাত্র একমিনিট, মিস্টার ডোনোভান। জানি আপনি অ্যানি আহমেদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁকে মেরে ফেলেছে মেগালোডন। ওই একই দানব খুন করেছে আমার আপন ভাইকেও।'

মুখ তুলে চাইল ম্যাক্স। 'আপনার এই ক্ষতির জন্য দুঃখিত, কিন্তু আপাতত আমি নিজেই কষ্টের ভিতর আছি। আপনার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ আমার নেই!'

'কথাটা একটু শুনুন, স্যর,' বলে উঠল স্কিলার। 'ওই দানব কেড়ে নিয়েছে বহু লোকের জীবন। চাইলে ওটাকে খুন করতে পারেন!' অস্বস্তি নিয়ে ডাক্তার ম্যাককমনের দিকে চাইল ক্যাপ্টেন স্কিলার। 'আমাদের ধারণা, আপনি হয়তো প্রতিশোধ নিতে চাইতে পারেন।'

কারকারোডন মেগালোডনকে খতম করবার প্রস্তাবটা বেশ ভাল লেগেছে ডোনোভানের। আর ওই শয়তান যদি না-ই থাকে, হয়তো রক্তাক্ত অ্যানিও ফিরবে না দুঃস্বপ্নে।

জীবন হয়ে উঠবে স্বাভাবিক।

প্রথমবারের মত স্কিলারের চোখে চাইল ডোনোভান।

'দেখুন মিস্টার, ওই দানব শেষ করে দিয়েছে আমার জীবন। ওর কারণে এখন আর ঘুমাতে পারি না। আপনারা যদি সত্যিই ওটাকে খুন করা নিয়ে আলাপ করতে চান, আমি শুনব।'

‘বেশ,’ মাথা দোলাল স্কিলার। ‘সেক্ষেত্রে প্রথমেই লাগবে আপনার ইয়ট।’

মহাবিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল ডোনোভান। ‘আরে, ওই শালার ইয়টের কারণেই তো এই ঝামেলার ভিতর পড়েছি!’

চুরাশি হাজার পাউণ্ড দেহটা শূন্যে ভাসিয়ে দিল পুরুষ হাম্পব্যাক, আবারও ঝপাস্ করে নেমে এল সাগরে, লেজ আছড়াল।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জোর আওয়াজ তুলেছে তিমিটা।

দুই শ’ গজ দূরে চলেছে ওয়েইল ওয়াচার বোট।

হাম্পব্যাকের দিকে চেয়ে হই-হই করে হাততালি দিল সবাই।

‘আরিব্বাপরে! গ্রেগ, ভিডিয়ো করতে পেরেছ?’ জানতে চাইল নিনা ফেরল।

‘হ্যাঁ!’

‘পারলে কয়েকটা স্টিল ছবি তোলো, ঠিক আছে?’

‘নিনা, এরই ভিতর কমপক্ষে দুই রোল শেষ করেছি, আর নেই।’

খুশিতে চিৎকার করছে ওদের ছেলে-মেয়েরা।

পরবর্তী কয়েক মিনিটের ভিতর ভাসল না কোনও তিমি।

তারপর হঠাৎ করেই ঘূর্ণন শুরু হলো বোট ঘিরে।

তারই ভিতর এল জোরালো ঢেউ।

‘কী যেন সাগরের তলা থেকে উঠে আসছে!’ ঘোষণা করবার ভঙ্গিতে বলল টুর গাইড। ‘আপনারা ক্যামেরা তৈরি রাখুন!’

তৈরি হয়ে গেল অন্তত বিশটা ক্যামকর্ডার।

কয়েক সেকেণ্ড পর পিঠ ভাসিয়ে উঠে এল বিশাল তিমি।

কিন্তু নড়ছে না।

আশপাশে কিছুই নেই।

কয়েক সেকেণ্ড পর কাত হয়ে গেল তিমির লাশ।

আর তখনই দেখা গেল পেটে বারো ফুট গোল এক ক্ষত।

হতবাক হয়ে গেল তিমি দর্শকরা।

'ওটা মরে গেছে!' প্রথমজন অবাক কণ্ঠে বলল।

'মারল কে?' জানতে চাইল আরেকজন।

'ওটা কি সত্যিই কামড়ের ক্ষত? কিন্তু...' গলা শুকিয়ে গেল আরেকজনের।

হাম্পব্যাকের নীচে কী যেন উঠতে শুরু করেছে।

কয়েক ফুট উঁচু হয়ে উঠল একচল্লিশ টন ওজনের স্তন্যপায়ী, তারপর তলিয়ে গেল সাগরের ঢেউয়ের নীচে।

হৈ-চৈ তুমুল হয়ে উঠেছে তিমি দর্শকদের ভিতর।

আবারও ভেসে উঠল লাশটা।

এবার আরেক দিকে দেখা গেল মস্ত আরেক ক্ষত।

লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে ওদিকের সাগর।

ভীষণ চমকে গেছে ওয়েইল ওয়াচার বোটের ক্যাপ্টেন। ইঞ্জিনের গতি বাড়াল সে, ঘুরিয়ে নিল বোট, তারপর রওনা হয়ে গেল তীরের দিকে। এত দ্রুত ঘুরিয়ে নিয়েছে, সিট থেকে পড়ে গেল বেশ কয়েকজন যাত্রী। চেঁচামেচি করছে দর্শকরা। এখনও বুঝতে পারেনি সমস্যাটা কী হতে পারে।

পঞ্চাশ ফুট নীচ থেকে ইঞ্জিন কম্পনের হঠাৎ পরিবর্তন ঠিকই টের পেল শিকারি ধবল দানবী।

সিনোসুকা ইন্সটিটিউট থেকে আট মাইল পশ্চিমে রাখা হয়েছে ফ্রিগেট নিতুকে। ভোররাত পর্যন্ত মেগালোডনকে খুঁজে এখনও ঘুমাচ্ছে জাহাজের বেশিরভাগ ক্রু।

আপার ডেকে স্ট্রিং বিকিনি পরে লাউঞ্জ চেয়ারে শুয়ে সূর্যস্নান করছে মানামি সিনোসুকা। ঘিয়ে রঙের ত্বকে তেল দেয়ায় চকচক

করছে।

ছায়ার ভিতর বসে আছে রানা। খবরের কাগজ পড়ছে। একটু পর পর কাগজ ছেড়ে মেয়েটির লোভনীয় সুডৌল ঊরু ও সুউন্নত স্তনের দিকে চোখ যাচ্ছে।

'তোমার শীত লাগছে না?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল রানা।

মিষ্টি হাসল মানামি। 'রোদটা বেশ গরম। ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে দেখো।'

'আমাদের এ কাজ শেষ হলে কোনও ট্রপিকাল দ্বীপে যাব ছুটি কাটাতে,' বলল রানা। হাসল মানামির দিকে চেয়ে। 'ইচ্ছে করলে তুমি যেতে পার সাথে।'

উঠে বসল মানামি। 'কেন নয়?'

রানা কথার কথা বলেছিল, টের পেল, সিরিয়াস হয়ে উঠেছে মেয়েটা।

কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে গেল রানার, 'সত্যিই যেতে চাও?'

চোখ থেকে সানগ্লাস খুলল মানামি। সরাসরি চাইল রানার চোখে।

'মিথ্যা বলব না, ভাল লাগবে তোমার সঙ্গে বেড়াতে।'

'সিআইসি-তে এখনই যোগাযোগ করুন, মিস্টার রানা,' ধাতব কণ্ঠ ভেসে এল স্পিকারে।

উঠে পড়ল রানা। স্থির করতে পারল না, মানামিকে কী বলা উচিত।

'দাঁড়াও! তোমার সঙ্গে যাব, একটু অপেক্ষা করো,' বলল মানামি। বিকিনির ওপর সোয়েট সুট পরে নিচ্ছে।

একমিনিট পেরুবার আগেই সুপারস্ট্রাকচারের দিকে রওনা হয়ে গেল ওরা।

'হাওয়াই-এ কোন্ হোটেলে উঠবে?' জানতে চাইল মানামি।

'ভাল কোনও হোটেলে,' মন্তব্য করল রানা।

‘একটা রুম নেবে, না দুটো?’

‘তোমার কী মনে হয়?’

‘আমি কি জানি?’ লাল হয়ে গেল মানামির গাল।

‘ঠিক আছে, পরে এ নিয়ে ভাবব আমরা,’ মৃদু হাসল রানা।

পাইলট হাউসে অপেক্ষা করছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড। ‘মিস্টার রানা, এইমাত্র এক ওয়েইল ওয়াচিং বোট থেকে ডিসট্রেস কল এসেছে। মনে হচ্ছে হাজির হয়েছে মেগালোডন!’

‘দিনের আলোয়?’ আপত্তির সুরে বলল মানামি।

এইমাত্র ঘরে ঢুকেছেন নাসিম আহমেদ। মানামির কথা শুনতে পেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন প্যালিয়োনটোলজিস্ট, ‘সূর্যের আলোয় ওর আর কোনও সমস্যা নেই, ও তো অন্ধ হয়ে গেছে! এখন যখন যা খুশি করবে!’

‘ডক্টর, সত্যিই ওই দানব এখন অন্ধ?’ প্রশ্ন করল মানামি।

‘অন্ধ, আবার অন্ধ নয়ও, সবকটা ইন্দ্রিয় সবই জানাবে ওকে,’ কথাটা বলল রানা। করিডোরের দিকে রওনা হয়ে গেছে। ‘নাসিম ভাই, সিআইসিতে বোধহয় ডাকছেন মি. তামেশু সিনোসুকা।’

কয়েক মুহূর্ত পর ইনফর্মেশন সেণ্টারে এসে ঢুকল রানা, নাসিম ও মানামি। পিছনে এল ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড।

নোঙর তুলে রওনা হয়ে গেছে নিতু, পানি কাটছে দুই প্রপেলার।

সোনারম্যানের পাশেই অপেক্ষা করছেন তামেশু, ঘরের আঁধার পরিবেশে জ্বলছে সবুজ ফ্লুরেসেণ্ট বাতি।

‘ও এখন কোথায়?’ গত কয়েক মিনিটে সপ্তমবারের মত জানতে চাইলেন তামেশু।

‘দুঃখিত, স্যর, ট্র্যান্সমিটারের রেঞ্জে নেই ও।’

‘কত দূরে আছি?’

নাকের ডগা চুলকে নিল সোনারম্যান, শান্ত করতে চাইছে

নিজেকে। ‘ডিসট্রেস কল থেকে বারো মাইল দক্ষিণ-পুবে আমরা। আগেই বলেছি, স্যর, ওই সিগনাল পাব তিন মাইলের ভিতর গেলে। অবশ্য আমাদের টো অ্যারে পাঁচ হাজার ফুটে বাড়িয়ে নিয়েছি।’

‘নাসিম-স্যান,’ ক্লান্ত স্বরে বললেন তামেশু, ‘আসলে কী হচ্ছে? আপনি না বলেছিলেন ওটা শুধু রাতে উঠে আসবে?’

‘একটা জরুরি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম,’ বললেন নাসিম। ‘এমনও হতে পারে, পুরো অন্ধ হয়ে গেছে মেগালোডন। ঝড়ের রাতে নিতুর ডেক থেকে সার্চলাইট মেরে এক চোখ নষ্ট করে দিয়েছিল রানা। পরে কপ্টার থেকে আবারও জোরালো আলো ফেলে অন্ধ করে দিয়েছে দ্বিতীয় চোখটাও।’

‘তার মানে ওই দানবী এখন অন্ধ,’ বললেন তামেশু। ‘এটা ভাল বলেই তো ধারণা করছি।’

‘খবরটা ভাল না-ও হতে পারে,’ বলল রানা। ‘হয়তো সত্যিই অন্ধ, আর তার ফলে কাটিয়ে উঠেছে অতিবেগুনী রশ্মির ভয়।’

‘ওটা কিছু না দেখলেই বা কী,’ বললেন নাসিম। ‘সাধারণ মানুষের মত অন্ধ নয়। আরও সাতটা তুখোড় ইন্দ্রিয় কাজ করছে ওর দেহে। নিচু ফ্রিকোয়েন্সির শব্দ শুনবে, বিশেষ করে ছল-ছলাৎ আওয়াজ পাবে কয়েক মাইল দূর থেকে। পানির এক শ’ মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ বা এক কণা রক্ত বা প্রস্রাবের গন্ধ টের পাবে পঞ্চাশ মাইল দূর থেকেও। নানাদিকে সরাবে নাকের পাটা, অনুসরণ করবে ওলফ্যাকটোরি ইমপালস। দেহের পাশের ল্যাটারাল লাইনের কারণে চারপাশের ইলেকট্রনিক ইমপালস ও ভাইব্রেশন বুঝবে। সবচেয়ে আধুনিক টর্পেডোর চেয়ে অনেক নিখুঁতভাবে ধরবে সিগনাল। তা ছাড়া, জিভ ও ত্বক দিয়ে সহজেই বুঝবে জিনিসটা কী ধরনের। আরও কথা আছে, আমাদের মনে রাখতে হবে, ওই মেগা জীবনের বেশিরভাগ সময় পার করেছে

আঁধার সাগরে, যেখানে দেখা যায় না কিছুই। চোখ নেই বলে ওর অন্তত কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।'

'অর্থাৎ নাসিম ভাই বলছেন, আমাদেরকে এবার লড়তে হবে প্রকৃতির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শিকারি প্রাণীর বিরুদ্ধে,' বলল রানা, 'যেটাকে এখন আর রাতের অপেক্ষায় থাকতে হবে না, দিনে রাতে যখন খুশি হামলা করতে পারবে।'

'তারমানে, পরিস্থিতি আগের চেয়ে আরও খারাপ হয়ে গেছে,' বলল মানামি।

পঁচিশ

'স্যর, আমি সোনারে ভিযুয়াল পাচ্ছি,' বলল সোনারম্যান।

তার পাশে পৌঁছে গেল রানা, নাসিম, তামেশু, মানামি ও হ্যারল্ড ডেভিড।

'এদিকের এই লাইনের উপর আছে, খুব আবছা,' দুই হাতের তালু বাঁকা করে ইয়ারপিস ঢেকে ফেলল সোনারম্যান। 'হ্যাঁ, আগের চেয়ে জোরালো... এখনও আছে আমার অন্য কন্সোলে।' পাশের কমপিউটারস্ক্রিন দেখাল সে। মনিটরে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ঘুরছে সবুজ ঢেউ, তার ভিতর লাল এক বিন্দু।

'ওটা কোথায় চলেছে, পল?' স্ক্রিনের কাছে এসে জানতে চাইল ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন।

'আমাদের কাছ থেকে সরছে। পুবে দুই মাইল দূরে।'

'গুড জব, লেগে থাকো,' সোনারম্যানের কাঁধ চাপড়ে দিল

ক্যাপ্টেন। 'হেলম, স্টারবোর্ডে পাঁচ ডিগ্রি সরে যাও, গতি কমিয়ে নাও দশ নটে।' রানার দিকে চাইল। 'আপনার পাইলট বন্ধু কোথায়, মিস্টার রানা?'

'আমি এখানে!' ঘরে এসে ঢুকেছে বাড লিটলটন। এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

'মেগালোডনের খোঁজ পাওয়া গেছে, তুমি তৈরি, বাড?' বলল রানা।

চোখ ডলল বাড। 'হ্যাঁ, রেডি। তবে বিশ সেকেণ্ড সময় দাও, দুই চোখে দু' কাপ কফি ঢেলে নিই।'

'রানা, রিকি, আপনারা নিজ নিজ স্টেশনে থাকুন,' বলল তামেশু। 'মিস্টার লিটলটন...'

'আমি কাজে গেলাম,' দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বাড।

পাঁচ মিনিট পর নিতুর ডেক ছেড়ে আকাশে উঠল কপ্টার।

তিমির দর্শকরা এখন পরিষ্কার দুই মাইল দূরে দেখছে মাটি।

হতাশ হয়ে নিজ চেয়ারে বসে আছে টুর গাইড। ক্যাপ্টেনের প্রপেলারের লবণাক্ত পানি ভিজিয়ে দিয়েছে ওর লাল চুলগুলোকে।

'মিস, আমরা ফিরছি কেন?' জানতে চাইল নিনা ফেরল। 'আমাদের টাকা ফেরত দেয়া হবে তো?'

'ম্যাম, আমি এখনও জানি না ঠিক কেন...'

বুম!

জোরালো ধাক্কা খেয়ে টুল থেকে ছিটকে ডেকে পড়ল লাল চুলের মেয়েটা।

চিৎকার শুরু করেছে দর্শকরা।

দু'হাতে স্বামীর বাহু খামচে ধরল নিনা।

ব্যথা পেয়ে মুখ কুঁচকে ফেলেছে গ্রেগ ফেরল।

চলন্ত বোটের খোলে স্নাউট দিয়ে হাল্কা গুঁতো দিয়েছে মেগালোডন, বুঝতে দেরি হয়নি জিনিসটা খাওয়ার নয়।

খোলা সাগরের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

আবার চক্কর কাটতে লাগল মৃত তিমিকে ঘিরে।

নৌযান বিরাট কিন্তু খাওয়া যায় না, আবার কোনও হুমকিও নয়, পুরো নিশ্চিত হয়েছে সে।

কিন্তু বোটের ক্যাপ্টেন ধারণা করেছে, সবাইকে নিয়ে মস্ত বিপদে পড়েছে। বুদ্ধি করে এঁকেবেঁকে চলেছে এখন উপকূল লক্ষ্য করে। সাগরের তিন ফুটি ঢেউয়ে বাড়ি খেয়ে নাচতে শুরু করেছে বোটের বো।

গতি কমাল মেগালোডন।

কেমন যেন এবারের কম্পনগুলো।

ওই দানব আসলে আহত।

ইন্দ্রিয় মেগালোডনকে জানিয়ে দিল— শত্রু দুর্বল, এবার হামলা করো!

কাজেই বাঁক নিতে শুরু করল সে, আবারও উঠে আসতে লাগল সাগর-সমতলে।

আক্রমণ করবে শত্রুকে!

'রানা, আমার কথা শুনছ?'

'পরিষ্কার, বাড,' ওয়াকি-টকিতে বলল রানা। হ্যারল্ড ডেভিড এবং ও দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের স্টার্নে। তৈরি অবস্থায় ডেকের উপর রাখা আছে হার্পুন গান।

'আমি বোটের দু' শ' ফুট উপরে,' বলল বাড। 'সারফেসে রোদ পড়ায় কিছুই দেখছি না। একমিনিট, পাল্টে নিচ্ছি আমার অ্যাংগেল।' দক্ষিণে কপ্টার সরিয়ে নিল লিটলটন, সরে এসেছে জাহাজের ডানদিকে। রোদের কারণে থার্মাল ইমেজারের ক্ষমতা

বিলীন হয়েছে। 'ওই যে! আরে, ওই যে শালী!'

'কোথায়, বাড?'

'ওয়েইল ওয়াচার বোটের পিছনে,' কেঁপে গেল বাডের কণ্ঠ। 'সর্বনাশ, রানা! ওটা তো ওই বোটের প্রায় দ্বিগুণ!'

টুরিস্ট বোটের তৈরি ঢেউয়ের মাঝে চলেছে ফ্রিগেট নিতু।

'ডেভিড, ব্র্যাডসেনকে বলুন ওই বোটের পাশে নিতে,' নির্দেশ দিল রানা। 'এই অ্যাংগেলে হার্পুন ছুঁড়বার ঝুঁকি নেব না। মারা পড়তে পারে যাত্রীদের কেউ।'

পাইলট হাউসে সংযুক্ত ইন্টারনাল ফোনে যোগাযোগ করল ডেভিড।

স্টারবোর্ডে বাঁক নিতে শুরু করেছে নিতু।

ওভারটেক করছে ছোট বোটকে।

হার্পুন গান ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে সরাতে শুরু করেছে রানা। নিতুর ডেক থেকে কমপক্ষে পঁচিশ ফুট নীচে ওই ছোট বোট।

সেফটি রিলিয করল রানা, এমনসময় এঁকেবেঁকে চলল বোট।

'বাড, ওটা কোথায়?' হেডসেটে জানতে চাইল রানা।

'এগিয়ে আসছে, তৈরি থাকো।'

দর্শনার্থীদের বোটের পাশে ছুটছে নিতু।

দুই জলযানের মাঝে মাত্র বিশ ফুট দূরত্ব।

বোটের পিছন সিট থেকে পরিষ্কার দেখল গ্রেগ ফেরল, আসছে নেভির ফ্রিগেট। ওদের বোটকে বামন করে দিয়েছে সাদা বো। তৈরি করছে চার ফুটি ঢেউ। ভীষণ নাচছে ক্যাপ্টেন অ্যাবি'র বোট।

'নিনা, হাত ছাড়ো, ওই জাহাজের ছবি তুলতে চাই!'

স্বামীর বাহু ছেড়ে দিল নিনা।

আবারও এঁকেবেঁকে রওনা হয়েছে বোট।

ক্যামকর্ড চোখে তুলল গ্রেগ, কিন্তু দেখল বুকে উঠে আসছে ফ্রিগেটের বো— সাদা ও ত্রিকোণ। দেরি না করেই অটোফোকাস করল ও, পরক্ষণে হাত থেকে পড়ে গেল ক্যামেরা।

তীক্ষ্ণ চিৎকার শুরু করেছে নিনা।

অন্যরা ঘুরে চাইল।

পরক্ষণে তুমুল হৈ-চৈ-চিৎকার শুরু করল অনেকে মিলে।

ক্যাপ্টেন অ্যাবি'র বোটের স্টার্নে উঠে এসেছে মেগালোডনের বিশাল মাথা। ধুপ্ করে ডেকে নামল নীচের চোয়াল। নলখাগড়ার কাঠির মত মট্ করে ভাঙল দুই প্রপেলার শাফট। হাজার টুকরো হলো ট্র্যানসম।

বোট থেকে পিছলে সাগরে পড়ল গ্রেগ ও নিনা।

একটু দূরে তরতর করে চলেছে প্রকাণ্ড ফ্রিগেট নিতু।

বরফ-ঠাণ্ডা সাগরে পড়ে ভীষণ চমকে গেল গ্রেগ ও নিনা। টুপ করে ডুবে গেল পানির নীচে।

কয়েক সেকেণ্ড পর বউকে নিয়ে আবারও ভেসে উঠল গ্রেগ।

একটু দূরে ধীরে ধীরে থেমে যেতে শুরু করেছে বোট।

ভীষণ ভয় নিয়ে দম্পতি দেখল বোট থেকে নেমে গেল দানবটা। ঘুরেই স্নাউট তাক করল ওদের দিকে!

চিল চিৎকার জুড়ল নিনা।

শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরল গ্রেগ, তারপর হতাশ হয়ে বুজে ফেলল দুই চোখ।

আর তখনই হার্পুন গান ফায়ার করল রানা।

কামানের ভিতর থেকে ছিটকে বেরুল মস্ত তীর।

ওটার পিছনে এল স্টিলের কেবল।

থ্যাক!

আওয়াজ তুলে মেগালোডনের দেহে বিঁধল হার্পুন।

লেগেছে ডরসাল ফিনের কয়েক ইঞ্চি দূরে।

হোঁচট খেল দানবী। পিঠ বাঁকিয়ে এদিক ওদিক নাড়তে শুরু করেছে মাথা।

দানবী সরতে চাইতেই স্টারবোর্ডে টান খেল নিতু।

পা পিছলে রেলিং টপকে পড়তে লাগল হ্যারল্ড ডেভিড, মনে হলো ডাইভ দিচ্ছে সাগরে।

সামনে বেড়ে দুই হাতে তার ডান গোড়ালি ধরে ফেলল রানা। গায়ের জোরে টেনে আনতে চাইল ডেকের এপাশে। কিন্তু ফস্কে গেল ওর নিজেরই পা। আর তখনই ভেঙে গেল পাশের রেলিং।

কিছুই পাত্তা দিল না রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে হ্যারল্ডকে তুলে আনল ডেকে। পরক্ষণে ডেকের উপর হুড়মুড় করে পড়ল দু'জন।

'দারুণ ক্যাচ!' বেগুণী মুখে কয়েক মুহূর্ত পর বলল হ্যারল্ড, 'আমি পারতাম না!'

বুম!

নিতুর পোর্ট সাইডের ইস্পাতের খোলে জোরালো গুঁতো দিয়েছে মেগালোডন!

আবারও বেদম হোঁচট খেয়ে ডেকের উপর পড়েছে রানা ও হ্যারল্ড!

'স্টারবোর্ডে সরে যেতে শুরু করো!' কন্ট্রোল রুমের মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন। 'মিস্টার সিনোসুকা, ওই জাহান্নামের হাঙর কখন ঘুমাবে?'

'জানি না, রিকি। টুরিস্টদের বোট থেকে সরে যাও।'

'শুনতেই তো পেলে!' নাবিকের উদ্দেশে বলল ক্যাপ্টেন। 'আমাদেরকে নিয়ে চলো সাগরের খোলা জায়গায়!'

গ্রেগ ফেরল তার বউকে নিয়ে ঢেউয়ের উপর উঠে আসতে চাইছে। কাছেই থাকবে ভাঙা বোট।

কয়েক সেকেণ্ড পর গ্রেগের কবজি খপ্ করে ধরল কে যেন।

টেনে তুলে নেয়া হলো দু'জনকে।

দম্পতির উপর চাপিয়ে দেয়া হলো শুকনো কম্বল।

প্রকাণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরের তিন শ' ফুট উপর থেকে ফ্রিগেট নিতুকে দেখছে বাড লিটলটন।

খোলা সাগর লক্ষ্য করে সোজা চলেছে জাহাজ।

ওটার পিছু নিয়েছে কারকারোডন মেগালোডন।

একটু পর পর নীচ থেকে উঠে আসছে স্টিলের কেবলের টান খেয়ে।

প্রতিবার দানবী গুঁতো দিচ্ছে জাহাজের বো-তে।

'রানা, তোমাদের অবস্থা কী?' জানতে চাইল বাড।

'ভাল না, বাড, হামলা করছে জাহাজে,' বলল রানা।

'কোস্ট গার্ডে রেডিয়ো করেছি, টুরিস্টদেরকে তুলে নেবে। ভাল হয় মেগালোডনকে খোলা সাগরে নিতে পারলে। ...পারবে, রানা?'

'চেষ্টা করছি,' বলল রানা। 'তুমি কি ওকে দেখছ?'

ওদিক থেকে কোনও জবাব এল না।

'বাড, শুনছ?'

'রানা, ওটা ডুব দিয়েছে।'

উইঞ্চে রয়ে গেল হ্যারল্ড, প্রায় ছুটতে ছুটতে কণ্ট্রোল রুমে গিয়ে ঢুকল রানা।

'পল, ওটা কোথায়?' ঘরে ঢুকেই জানতে চাইল।

মন দিয়ে হেডফোনের সিগনাল শুনছে সোনারম্যান। 'আমার

মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়ছে ওটা।'

কার্ডিয়াক মনিটরের তথ্য দেখতে শুরু করেছে রানা।

মেগালোডনের পেটে গেঁথে দেয়া ট্র্যান্সমিটারের ডেটা-বলছে: দানবীর হৃৎস্পন্দন মিনিটে চলছে দুই শ' বারো বার।

সিআইসিতে উপস্থিত আছেন নাসিম আহমেদ, তিনি বললেন, 'আমার ধারণা ওই ড্রাগসের ফলে মেজাজ খারাপ হয়ে উঠছে।' ইণ্টারনাল ফোন তুলে নিলেন। 'এখন পর্যন্ত ওটা কত কেবল নিয়েছে, ডেভিড?'

'দুই হাজার ফুট হবে। আমি কি কেবল গুটিয়ে...'

'ওটা উঠে আসছে!' চেঁচিয়ে উঠল সোনারম্যান। 'কিছু ধরে থাকুন সবাই!'

নীরবে কেটে গেল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর এল জোরালো আওয়াজ: 'বুম!'

জাহাজের নীচে গুঁতো দেয়া হয়েছে।

মস্ত এক হোঁচট খেল নিতু।

'ভীষণ রেগে গেছে,' প্রায় ফিসফিস করে বললেন নাসিম।

'আমার জাহাজ ডুবিয়ে দেবে নাকি!' আতঙ্কিত স্বরে বলল ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেন। চট্ করে তুলে নিল ফোন। 'ইঞ্জিনরুম...'

'ক্যাপ্টেন, ইঞ্জিনরুমে সমস্যা,' রিপোর্ট করল ইঞ্জিনিয়ার। 'আপনি কি নীচে আসতে পারেন?'

'আসছি।' এক ক্রুকে হেলম ধরতে ইশারা করল রিকি ব্র্যাডসেন, নিজে রওনা হয়ে গেল ইঞ্জিনরুমে যাওয়ার জন্য। ঘর থেকে বেরুবার আগে কঠোর চোখে দেখল নাসিম ও রানাকে।

ক্যাপ্টেনের পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকল মানামি। 'রানা, ডক্টর নাসিম, শেষ পর্যন্ত ঘুমাবে ওটা?'

জবাব দিল না রানা।

মনিটর দেখছেন নাসিম, বিরতি শেষে বললেন, 'ঘুম নয়,

হামলা করতে চাইছে ওটা!'

'আমি ডেকে চললাম!' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

ছাব্বিশ

দাউদাউ আগুন জ্বলছে কারকারোডন মেগালোডনের মগজে, আগ্নেয়গিরির লাভার মত ফুটছে রক্ত, ভীষণ ধুপধাপ করছে হৃৎপিণ্ড। শক্তিশালী সেনসরি সিস্টেম অতি-ব্যস্ত, পাগল করে দিচ্ছে পেনটোবারবিটালের বিপুল ডোজ।

সব ইন্দ্রিয়ের নির্দেশ পেল দানবী: হামলা করো শত্রুর ওপর!

সাগরের দেড় হাজার ফুট নেমেই চরকির মত ঘুরে গেল মেগালোডন, পরক্ষণে রওনা হলো ছুঁড়ে দেয়া তীরের মত। তুমুল গতি তুলছে বাঁকা চাঁদের মত লেজ। যেন উপরে উঠছে সাদা একটা বর্শা বা টর্পেডো।

নিতুর বো-র পানি কাটবার শব্দ বা অদ্ভুত কম্পন শুনছে মেগালোডন। এক সেকেণ্ড পর বুঝল, শত্রুর কোথায় হামলা করা উচিত। জাহাজের সামনের কম্পার্টমেন্ট লক্ষ্য করে বিদ্যুদ্বেগে উঠতে লাগল সে।

নিতুর চ্যাপ্টা কিলে মেগালোডন গুঁতো মারলে কয়েক মিনিটে তলিয়ে যেত জাহাজ, কিন্তু হামলাটা হলো বো-র কাছে।

এতে কমল আঘাতের চোট।

এবং ভয়ঙ্কর গুঁতো দিয়ে হঠাৎ করে নিজেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল আদিম আতঙ্ক।

খুব দ্রুত কমছে তার হৃৎস্পন্দনের গতি।

কাজ করছে পেনটোবারবিটাল ও কেটামিন, ঘুমিয়ে পড়ছে সে, শান্ত হয়ে আসছে সেণ্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম।

ভারী পাথরের মত নীচে নামছে মেগালোডন।

হারিয়ে গেছে লেজের সব অনুভূতি।

নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না ওর।

আরও মন্থর হলো হৃৎস্পন্দন।

বারো শ' ফুট উপরের সাগরে থেমে গেছে ফ্রিগেট নিতু।

'হৃৎস্পন্দন মিনিটে তিরাশি বিট,' ফোনে রানাকে বললেন নাসিম। 'এটা স্বাভাবিক কি না জানি না। বোধহয় কাজ করছে ড্রাগস। হাতে বাড়তি সময় নেই। রানা, এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করতে পারো।'

'মিস্টার রানা, রেডি?' জানতে চাইল ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে স্টার্নে।

'জ্ঞান হারাচ্ছে ওটা, এবার টেনে তুলুন,' বলল রানা। 'ডুবে মরার আগেই জাহাজ দিয়ে ওটাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। ক্রুরা স্টার্ন থেকে নামিয়ে দেবে জাল। আর আমি যাব মেগালোডনের নীচে নেট বাঁধতে।'

পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মানামি, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। ইতস্তত করে বলল, 'রানা, তুমি ঠিক জানো তো, অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানে বিপদ হবে না তোমার?'

'হওয়ার তো কথা নয়,' মেয়েটির চোখে চোখ রেখে হাসল রানা।

কাজে নেমে পড়েছে চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড় ও তার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পিটার প্যাসকুয়াল। উইঞ্চের মাধ্যমে গুটিয়ে তুলছে স্টিলের কেবল।

'প্যাসকুয়াল, একহাজার ফুট থাকতে একবার থামতে হবে,' বলল হ্যারল্ড ডেভিড। 'যদি সরে যেতে চায়, আবারও গোটাতে শুরু করব কেবল। শয়তানটাকে পিছন পিছন আসতে হবে।' চট্ করে ডানদিকে চাইল ইঞ্জিনিয়ার।

স্যাডলে এখনও ঝুলছে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান।

এরই ভিতর ওয়েট সুট পরে নিয়েছে রানা, কয়েক সেকেণ্ড পর ঢুকে পড়বে সাবমারসিবলের ভিতর।

'শোনো,' রানার হাত ধরল মানামি, ফিসফিস করে বলল, 'আমাদের বেড়াতে যাওয়ার কথাটা কিন্তু ভুলে যেয়ো না।'

'আমার মনে থাকবে,' মৃদু হাসল রানা, ক্রল করে ঢুকে পড়ল সাবমারসিবলের ভিতর।

শুয়ে পড়েছে চেম্বারে।

নাকের কাছেই স্বচ্ছ লেক্সান নোজ কোন্।

নিজ পজিশন ঠিক করে নিল পাইলট হার্নেসে।

টের পেল, ডেক থেকে তুলে নেয়া হয়েছে সাবমারসিবলকে, নামিয়ে দেয়া হচ্ছে জাহাজের পাশে।

কয়েক মুহূর্ত পর নামল মহাসাগরে।

সিট বেল্টগুলো আটকে নিল রানা, আনমনে ভাবল মানামির অপরূপ সৌন্দর্য: নিষ্পাপ চেহারা, মসৃণ, সুডৌল ঊরু, সরু কোমর, ভারী নিতম্ব, সরু বিকিনি...

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল রানা, মনে মনে ভাবল: এখন কি এসব নিয়ে স্বপ্ন দেখার সময়?

স্যাডল থেকে খুলে এসেছে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান, রানা জয়স্টিক ঠেলে দিতেই সাড়া দিল সাবমারসিবল।

নীচের দিকে রওনা হয়ে গেছে।

এক সেকেণ্ড পর দেখা গেল নীল হয়ে উঠেছে চারপাশ।

দ্রুত নামছে সাবমারসিবল।

চুপ করে শুয়ে রইল রানা।

'শুনতে পাচ্ছ, রানা?' কিছুক্ষণ পর ভেসে এল নাসিমের কণ্ঠ।

'শুনছি, নাসিম ভাই। আমি পাঁচ শ' ফুটে। আলো নেই বললেই চলে।'

'মেগালোডনকে দেখতে পেয়েছ?'

সামনের দিকে চেয়ে আছে রানা। নীচে আবছা কী যেন। ম্লান সাদা আলোর মত। জিনিসটা মেগালোডন হয়ে থাকলে আরও বড় হওয়ার কথা।

'এখনও দেখতে পাইনি, নাসিম ভাই।' সাবমারসিবলের গতি বাড়াল রানা। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাংগেলে নামছে। টের পেল, কমে গেছে ভিতরের তাপমাত্রা। আরেকবার দেখল ডেপথ গজ।

আট শ' ষাট ফুট।

এবার দেখতে পেল মেগালোডন।

বেঁহুশ, উপরের দিকে তাক করে রেখেছে মুখ। প্রায় খাড়া ভাবে আঁধারে নেমেছে লেজ। একদমই নড়ছে না দানবী।

'ঘুমিয়ে কাদা, নাসিম ভাই।'

'ওটার মুখে পানি না গেলে ডুবে মরবে,' বললেন নাসিম। 'এবার টেনে নিয়ে যেতে হবে। পাশেই থাকো, রানা।'

'ঠিক আছে।'

চালু হলো নিতুর ইঞ্জিনগুলো, চারপাশে ধাতব ঘড়ঘড়ে আওয়াজ শুনল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর টানটান হলো কেবল, সাবের দিকে উঠতে লাগল মেগালোডন।

দেরি না করে চট্ করে গতিপথ থেকে সরে গেল রানা। কিছুক্ষণ পর থামল মেগালোডনের একপাশের গিলগুলোর কাছে। ওগুলো পাঁচটা খাড়া শাফটের দরজার মত। বন্ধ।

অচেতন মেগালোডনকে টেনে নিতেই তিরতির করে কাঁপতে লাগল ফুলকা বা কানকো, তারপর খুলে গেল পুরোপুরি।

আবারও শ্বাস নিতে শুরু করেছে মেগালোডন।

মুখে পানি ঢুকছে, বেরুচ্ছে গিলগুলো দিয়ে।

'স্বাভাবিক শ্বাস চালু হয়েছে,' জানিয়ে দিল রানা। 'এবার হার্নেসে আটকে নেব। কিন্তু তার আগে উপরে তুলতে হবে, নইলে রাখা যাবে না জালে। ...নাসিম ভাই, ডেভিডকে জানান, আরও পাঁচ শ' ফুট উপরে তুলতে হবে। খুব সাবধান, নইলে মাংস থেকে বেরিয়ে আসতে পারে হার্পুন।'

'ঠিক আছে, জানিয়ে দিচ্ছি।'

ক' মুহূর্ত পর ধীরে ধীরে উঠতে লাগল মেগালোডন। অনুসরণ করল রানা, প্রশংসা না করে পারল না দানবীর।

প্রকাণ্ড হাঙর। দেখতে দারুণ সুন্দর। বন্য। আবার একইসঙ্গে রাজকীয়।

এসব দানবকে বহু যত্নে সত্তর মিলিয়ন বছর ধরে তিলে তিলে নিখুঁত করেছে প্রকৃতি। ক্ষমতা দিয়েছে সাগরের সব প্রাণীর উপর।

এই শক্তিশালী সম্রাজ্ঞীকে ধ্বংস না করে রক্ষা করতে চাইছে ওরা, ভাবতে গিয়ে ভাল লাগল রানার।

সারফেস থেকে এক শ' তিরিশ ফুট নীচে থাকতে মেগালোডনকে টেনে তোলা থেমে গেল। মন্থর গতি জাহাজের পিছনে আসছে।

এবার সারফেসে উঠে এল রানা, খুঁজে নিল নিতুর জাল।

জিনিসটা প্রকাণ্ড, নিতুর কিলের পাশেই ঝুলছে।

সাবমারসিবলের রিট্র্যাকটেবল বাহুর থাবা ব্যবহার করে জাল ধরল রানা। জিনিসটা যেন প্যাঁচ খেয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রেখে খুব ধীরে ধীরে আবারও ডুব দিল।

সাবের নীচে চলেছে হার্নেস বা জাল, পিছনে ছড়িয়ে পড়ছে।

জিনিসটা বয়াওয়ালা ভারী কার্গো নেট, তলিয়ে গিয়ে ঘিরে

ফেলে টিউনাকে।

নাসিম এবং রানার পরামর্শে এই জালের চারপাশে রাখা হয়েছে বয়া। জাহাজ থেকে ফোলানো যায় বা চুপসে দেয়া যায়। এসব বয়া ব্যবহার করেই মেগালোডনকে নিয়ে যাওয়া হবে লেগুনের ভিতর। কাজ শেষে বয়ার বাতাস বের করে দিলেই খসে পড়বে জাল।

আট শ' ফুট গভীরতায় নেমে এসেছে রানা, অনেক উপরে অচেতন মেগালোডন। সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়ে সাবমারসিবল সামনে বাড়াল রানা। মুড়ে ফেলল দানবীকে লেজের দিক দিয়ে।

'নাসিম ভাই, আমি পজিশনে। এবার হার্নেসের বয়া ফোলাতে বলুন।'

'ঠিক আছে।'

এক সেকেণ্ড পর নড়ে উঠল পুরো জাল। উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে গোটা জিনিসটা। নীচ দিয়ে ঘিরে ফেলছে মেগালোডনকে। একটু পর মুড়ে নেয়া হলো বেয়াল্লিশ হাজার পাউণ্ডের হাঙরকে। চাপ কমে গেল হার্পুনের উপর থেকে। ভারী মেগালোডনকে ভাসিয়ে রাখছে বয়াগুলো।

'নেট ঠিকভাবেই কাজ করছে, নাসিম ভাই,' জানাল রানা।

'আমরা ওকে বেশি উপরে তুলব না,' বললেন নাসিম। 'এবার চলে এসো, রানা। ...না, আরেকটা কথা। ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেন অনুরোধ করেছেন, উঠে আসার আগে একবার দেখে এসো, কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে জাহাজের।'

'বেশ,' সাগরের সমতলে উঠে এল রানা।

ওর কাছ থেকে জাল বুঝে নিল কয়েকজন ডাইভার।

এবার সাবমারসিবল ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেল রানা। অজ্ঞান মেগালোডনের কাছ থেকে সরে দেখতে চলেছে জাহাজের তলি।

কয়েক মুহূর্ত পর দেখতে পেল ফ্রিগেটের খোল।

উপরের দৃশ্য দেখে রীতিমত গম্ভীর হয়ে গেল রানার চেহারা।

এইমাত্র নিতুর ডেকে উঠে এসেছে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান সাবমারসিবল।

দেরি না করে ওটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা।

হাজির হয়েছে নাসিম আহমেদ এবং অন্যরা। গম্ভীর সবার মুখ। আগেই জেনেছে কী অবস্থা।

'তা হলে তলির ওই ফাটল কমপক্ষে আট থেকে নয় ফুট চওড়া?' গম্ভীর মুখে বলল ব্র্যাডসেন।

'হুড়মুড় করে পানি ঢুকছে জাহাজে,' জানাল রানা।

এরই মধ্যে পনেরো ডিগ্রি কাত হয়ে গেছে নিতুর স্টারবোর্ড।

'এটা মাত্র শুরু, মিস্টার তামেশু,' মাথা নাড়ল ব্র্যাডসেন। 'মিস্টার রানার কথা অনুযায়ী ফরওয়ার্ড কম্পার্টমেন্ট সিল করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ওদিকটা পুরোপুরি ধসে পড়তে পারে।'

'সেক্ষেত্রে আমরা তলিয়ে যাব?' জানতে চাইলেন তামেশু।

জবাব দেয়ার আগে ভাবল ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেন, তারপর বলল, 'মনে করি না জাহাজ ডুববে। ক্ষতি থাকবে নির্দিষ্ট কম্পার্টমেন্টে। কিন্তু আরও ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। ওই অত বড় মাছ টেনে নিয়ে যাওয়া যথেষ্ট কঠিন, তার উপর ভেঙে গেছে একটা প্রপেলার। বলতে গেলে হামাগুড়ি দিয়ে বাড়ি ফিরবে নিতু।'

'লেগুনে পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগতে পারে, রিকি?' জানতে চাইল হ্যারল্ড ডেভিড।

'ভেবে বলতে হবে। এখন বাজে সাতটা। আশা করি আগামীকাল ভোরের আগে পৌঁছে যেতে পারব ওখানে।'

ক্যাপ্টেনের দিকে চাইল হ্যারল্ড, পরক্ষণে দেখল নাসিমকে।

'ডক্টর, মেগালোডনকে অতক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারবেন?'

'জানি না,' স্বীকার করে নিলেন নাসিম। 'আমি যে ডোজ দিয়েছি, ওটা বারো ঘণ্টা থেকে ষোলো ঘণ্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট।'

'নাসিম, আবারও ওটাকে ওষুধ ইনজেক্ট করলে?' জিজ্ঞেস করলেন তামেশু। 'ধরুন, দশ ঘণ্টা পর আবারও ওষুধ দিলেন?'

'মারা পড়বে,' আস্তে করে মাথা নাড়লেন নাসিম। 'বিশাল আকারের প্রাণী, ওকে বেশিক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখলে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হবে ওর নার্ভাস সিস্টেমের। জেগে উঠতে হবে, স্বাভাবিক শ্বাস নিতে হবে, নইলে এমনও হতে পারে, জ্ঞানই ফিরল না আর।'

অনিশ্চিতভাবে মাথা চুলকালেন তামেশু। 'তো, আমাদের হাতে অপশন নেই। ...জাহাজ চালাতে কতজন লাগবে, ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেন? আমরা যদি বেশ কয়েকজনকে নামিয়ে দিই, তাতে...'

'উপায় নেই,' মাথা নাড়ল ব্র্যাডসেন। 'একটা প্রপেলার নষ্ট, সাগর এসে উঠতে চাইছে জাহাজে। এ অবস্থায় সবাইকে দরকার আমার। বাড়তি লোক পেলে আরও ভাল হতো। যদি ত্যাগ করতেই হয় জাহাজ, তো সবাইকে নিয়েই নেমে যাব আমি।'

'কার্ডিয়াক মনিটর আমাদের জানিয়ে দেবে কখন জেগে উঠবে মেগালোডন,' বলল রানা। 'এক কাজ করলে কেমন হয়, আমি যদি অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানে করে ওটার উপর চোখ রাখি, হয়তো আগেই বুঝব কখন জেগে উঠছে। সেক্ষেত্রে জাল সরিয়ে নিয়ে ঝটপট সরেও যেতে পারব। ততক্ষণে লেগুনের খুব কাছে পৌঁছে যাব। যদি বাধ্য হই, গতি বাড়িয়ে মেগালোডনের কাছ থেকে জাহাজ নিয়ে সরে যাব আমরা।'

নাসিমের দিকে চাইলেন তামেশু। 'ওটা জেগে ওঠার পর কী আচরণ করবে?'

'মাথার ব্যথায় ভীষণ রেগে উঠবে,' বললেন নাসিম। 'আমি

অবাক হব না আমাদেরকে তাড়িয়ে নিয়ে লেগুনে ঢুকলে।'

'তার মানে বলতে চাইছেন, আমাদেরকে খুন করবে,' বলল হ্যারল্ড।

'সব বুঝেও তুমি নামতে চাইছ সাব নিয়ে, হঠাৎ ওই রাক্ষুসী হামলা করলে, তখন রানা?' জানতে চাইল মানামি।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আমি থাকব অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানের ভিতর, আমি বোধহয় তোমাদের চেয়ে নিরাপদে থাকব।'

নাসিমের দিকে চাইলেন তামেশু।

ভুরু কুঁচকে ভাবছেন ডক্টর। কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'রানা, ঝুঁকি কিন্তু অনেক।'

'আমার আপত্তি নেই।'

আস্তে করে মাথা দোলালেন নাসিম। 'ঠিক আছে, তো সাব নিয়ে ভোরের কিছুক্ষণ আগে থেকে ওটার উপর চোখ রাখতে পারো। ...আর এখন থেকে নজর রাখতে হবে কার্ডিয়াক মনিটরে। প্রথম ডিউটি দিচ্ছি চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিডের ওপর। গ্রাফে কোনও পরিবর্তন দেখলে দেরি না করে আমাকে বা রানাকে জানাবে।'

'বেশ,' মাথা দোলাল ডেভিড।

হঠাৎ করেই যেন সব কথা শেষ হয়ে গেল সবার।

তারও কয়েক মুহূর্ত পর দূরে গুড়গুড় করে উঠল মেঘ।

'বোধহয় ঝড় আসছে,' রানার পাশ থেকে বলল মানামি।

একটু আগে হেলিকপ্টার নিয়ে জাহাজের স্টার্নে নেমেছে বাড লিটলটন। চলে এসেছে অন্যদের কাছে। মানামির কথাটা শুনতে পেয়ে বলল, 'না, ম্যাম, ওই আওয়াজ একপাল হেলিকপ্টারের। নিউজ পেপার অফিসের। সবমিলে পাঁচটা। আরও আসছে। ভোরের আগে বহু মানুষের ভিড় হবে।'

কাজ থেকে মুখ তুলে টেলিভিশনের দিকে চাইল ডাক্তার ফিল ম্যাককমন। চতুর্থবারের মত শুনতে শুরু করেছে খবরটা।

'...আমাদের মাত্র দুই শ' ফুট নীচ দিয়ে অচেতন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ষাট ফুট দৈর্ঘ্যের প্রাগৈতিহাসিক কারকারোডন মেগালোডনকে। গত এক মাসে কমপক্ষে দুই ডজন মানুষ ও অসংখ্য হাঙর-তিমির জীবন কেড়ে নিয়েছে এই দানবী। আমরা যেখান থেকে দেখছি, চোখে পড়ছে ওটার তুষারের মত সাদা ত্বক। চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করছে। ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ নিতুর গতি এখন যেমন, তাতে বলা যায়, ওটা সিনোসুকা লেগুনের মুখে পৌঁছুবে ভোরের আগে। চ্যানেল সেভেন অ্যাকশন নিউজ সারারাত প্রচার করবে কারকারোডন মেগালোডনের খবর। নতুন আরও কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে পারবেন আমাদের মাধ্যমে। চ্যানেল সেভেন অ্যাকশন নিউজ, টনি হ্যাস্টন, রিপোর্ট করছি সরাসরি...'

'আমার কাজ প্রায় শেষ, ম্যাককমন,' বলল ক্যাপ্টেন স্কিলার।

এরা আছে লাভ অ্যাট সি ইয়টে, দু'জন মিলে এক্সারসাইয রুমে তৈরি করছে ডেপথ চার্জ।

স্কিলারের কাজ এখনও শেষ হয়নি। চার বাই দুই স্টিলের ব্যারেলের সঙ্গে আটকে দিচ্ছে ফিউজ।

'একই দৃশ্য বারবার দেখছেন,' বিরক্ত স্বরে বলল স্কিলার।

'আপনি জানতে চেয়েছেন মেগালোডন কত গভীরে,' বলল ডাক্তার। 'আপনি কি আশা করছেন সাঁতরে গিয়ে টেপ দিয়ে মেপে আসব?'

'তো জানা গেল?' কাজ থেকে মুখ তুলল স্কিলার। 'হারামজাদী আছে কত গভীরে?'

'ক্যামেরার অ্যাংগেল থেকে আঁচ করছি, ওটা আছে দেড় শ'

থেকে দুই শ' ফুটের ভিতর। আপনার ডেপথ চার্জের রেঞ্জ কত?'

'যথেষ্টর বেশি। গভীরতার কারণে সমস্যা হবে না ফিউজের। আর চার্জে থাকছে প্রচুর অ্যামাটল। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হবে। এসব নিয়ে ভাবতে হবে না আপনাকে। এখানে যে পরিমাণ আছে, একেবারে ভাজা হয়ে যাবে ওই মাছ। মূল সমস্যা হচ্ছে দানবটার কাছে গিয়ে চার্জ ফেলা। ওই কাজের দায়িত্ব নিয়েছে ম্যাক্স ডোনোভান। ...কিন্তু লোকটা কোথায়? কোথাও তো দেখছি না!'

'উপরের ডেকে,' বলল ফিল ম্যাককমন। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন, ওই লোক কখনও ঘুমায় না?'

'তাই আসলে,' মাথা দোলাল স্কিলার। 'আরও একটা ব্যাপার আপনি জানেন না, আমি নিজেও আজকাল আর ঘুমাতে পারছি না।'

ইয়টের স্টারবোর্ডের রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক্স ডোনোভান, নিথর কালো সাগরের বুকে ভেসে থাকা চাঁদের প্রতিবিম্ব চুপ করে দেখছে।

সিনোসুকা লেগুনের তিন শ' গজ দূরে নোঙর ফেলেছে লাভ অ্যাট সি। এখান থেকে পরিষ্কার চোখে পড়ছে প্রকাণ্ড খালের দু' পাশের সাদা কংক্রিট দেয়াল।

'দুই হারামজাদী শেষ করে দিয়েছে আমাকে,' বিড়বিড় করল ম্যাক্স। গ্লাস কাত করে মুখে ঢালল এক ঢোক নির্জলা জিন।

বহুদিন ঘুমাতে পারে না সে।

অ্যানি ল্যামবার্ট মারা যাওয়ার দু'এক দিনের ভিতরেই বুঝে গিয়েছিল, মোটেও ভালবাসত না ওকে ওই মেয়ে।

ওকে সিঁড়ির মত ব্যবহার করতে চেয়েছিল অ্যানি।

বদলে নিজে ও মৌজ করেছে।

ব্যাপারটা দেহের মাধ্যমে শোধবোধের ব্যাপার ছাড়া আর

কী!

কিন্তু যখন কুত্তিটা মরল, জড়িয়ে যেতে হলো ওকে।

মনে খুব কষ্টও লেগেছিল তখন।

বারবার মনে হয়েছিল, অ্যানির জন্য কিছু করার ছিল ওর।

নাহ্!

আসলে কিছুই করার ছিল না।

নিজের দোষে করুণ পরিণতি হয়েছে মেয়েলোকটার, তাতে ওর কী? সামান্য ফ্লার্টিঙের বিনিময়ে বহু কিছু আদায়ও করে নিয়েছে সে ওর কাছ থেকে।

এখন নির্দ্বিধায় বলতে পারবে ম্যাক্স, মস্ত লোভ করতে গিয়ে মরেছে বেটি!

খারাপ ব্যাপার হচ্ছে, শেষ করে দিয়েছে শালী ওকেও।

চোখ বুজলেই চলে আসছে ওই হারামজাদী!

বিকট চিৎকার করছে, মুখ থেকে বেরুচ্ছে তাজা রক্ত।

হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল ম্যাক্স।

ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের কারণে হারাম হয়ে গেছে ওর ঘুম।

নেভির পাক্কা দুই বদমাশের সঙ্গে মিশছে মাত্র একটা কারণেঃ ওই মেগালোডনটাকে মারতে চায় ওরা।

সত্যি যদি শেষ করতে পারে, হয়তো মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে ওই দানবীকে।

সেদিন যদি হয় ওর মুক্তি।

আর হাজির হবে না অ্যানি।

আবারও তখন ঘুমাতে পারবে।

'তুই জানিস না, অ্যানি, আমাকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছিস...' বিড়বিড় করল ম্যাক্স। এক ঢোকে শেষ করল জিন, সাগরে ছুঁড়ে ফেলল গ্লাস। টুকরো হয়ে গেল চাঁদের প্রতিবিম্বটা।

'মরুক সব! সকালে খুন করছি আমরা ওই পিশাচিনীকে!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি লক্ষ্য করে রওনা হলো ম্যাক্স। গেস্টরুমে চলেছে। এখন আর ইয়টের মাস্টার সুইটে ঢোকে না। ওখানে রয়েছে অ্যানির পারফিউম আর গলা ফাটানো চিৎকার, রক্ত।

গেস্টরুমের দরজা খুলে কুইন সাইযের খাটে ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাক্স। গিলেছে প্রচুর জিন। আশা করছে ঘুমাতে পারবে এবার।

সে রেলিং ছেড়ে সরে যাওয়ার তিরিশ সেকেণ্ড পর সাগর-সমতলে ভেসে উঠল তিন ফুটি ফ্লুরেসেন্ট সাদা একটা ডরসাল ফিন, আপন মনে চক্কর কাটছে ওটা স্যাংচুয়ারির কালো পানিতে।

সাতাশ

মনের অ্যালার্ম ওর ঘুম ভাঙিয়ে দিতেই সতর্ক হয়ে উঠল রানা, খুব ধীরে মেলল চোখ। শুয়ে আছে লাউঞ্জ চেয়ারে, উলের ব্ল্যাঙ্কেটের নীচে ওর পাশে মানামি সিনোসুকা।

দু'জনের তাপে উষ্ণ হয়ে আছে কম্বল।

আস্তে করে মেয়েটির ফিনফিনে চুলে হাত বোলাল রানা।

মিষ্টি সুবাস পেল।

কাত হয়ে শুয়েছে মানামি, বিড়বিড় করে বলল, 'ঘুমিয়ে পড়ো, রানা।' চোখ খুলছে না।

'সময় হয়ে গেছে, মানামি, এবার উঠতে হবে,' বলল রানা।

চট্ করে চোখ মেলল মানামি, ঘুরে চাইল। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা। 'উঠতে ইচ্ছে করছে না, রানা। এসো না আরও পাঁচ মিনিট ঘুমাই?'

'সারারাত এভাবে কাটলে মন্দ হতো না, কিন্তু হাতে সময় নেই।'

'আমি সত্যিই জেলাস,' আড়মোড়া ভেঙে হাসল মানামি। 'তুমি কিন্তু ওই মেয়ের সঙ্গে অনেক বেশি সময় কাটাতে চাইছ!'

'উঠে পড়ো,' চেয়ার ছাড়ল রানা, ঝুঁকে মানামিকে বুকে নিয়ে পরক্ষণে দাঁড় করিয়ে দিল। চট্ করে দেখে নিল ঘড়ি। সাড়ে চারটে। 'এবার চটপট ওয়েট সুট পরব। বোধহয় হ্যারল্ড ডেভিড খুঁজতে শুরু করেছে আমাকে।'

'ঠিক আছে, গ্যালিতে দেখা হবে,' বলল মানামি। 'রওনা হওয়ার আগে পেটে কিছু খাবার দেয়া উচিত তোমার।'

'না, ফিরে এসে ব্রেকফাস্ট করব। হ্যারল্ডকে বোলো আমাকে পাবে সাবমারসিবলের ভিতর।'

আরেকবার ঘড়ি দেখল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড।

মাসুদ রানা গেল কোথায়?

কার্ডিয়াক মনিটরের ডিজিটাল রিডআউট বলছে পঁচাশি বিট।

ধূসর হতে শুরু করেছে আকাশ।

মাথার উপর জোরালো আওয়াজ তুলছে সব মিডিয়ার হেলিকপ্টার।

'জ্বালিয়ে মারল হারামজাদারা,' বিড়বিড় করল হ্যারল্ড ডেভিড।

'মর্নিং, ডেভিড,' মিষ্টি হাসল মানামি। এইমাত্র ঢুকেছে ঘরে।

'বলতে পারো মাসুদ রানা কোথায়?'

'অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানের ভেতর। কখন তাকে নামিয়ে দেবেন সেজন্য অপেক্ষা করছে।'

'অপেক্ষা করছে? যিশু, গত নয়টা ঘণ্টা বসে আছি আমি!'

সিআইসি থেকে সরাসরি পাইলট হাউসে এল ডেভিড, ওখান

থেকে বেরুল ডেকে। দ্রুত পৌঁছে গেল সাবমারসিবলের কাছে।

ককপিটের ভিতর শুয়ে আছে রানা, প্রস্তুত।

লেক্সান কোনে দু'বার টোকা দিল হ্যারল্ড। বুঝিয়ে দিল কাজে নামবে। চারপাশ দেখল, নাসিম আহমেদ এখনও হাজির হয়নি।

ক্রেনের সিটে বসেই চমকে গেল ইঞ্জিনিয়ার।

'উহ্! এটা আবার কী!'

জিনিসটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরল সে।

'ও, ওটা আপনার কাছে? খুঁজছিলাম...' ক্রেনের পাশ থেকে বললেন নাসিম।

'কী এটা?' খোঁচা খেয়ে রেগে গেছে হ্যারল্ড।

জিনিসটা কালো, বহু পুরনো। খুব ধারাল। লম্বায় সাত ইঞ্চি।

'মেগালোডনের দাঁত,' বললেন নাসিম। 'ঠিক করেছি রানা রওনা হওয়ার আগে ওকে দেব।'

দাঁতটা বাড়িয়ে দিল ডেভিড। 'তা হলে যেখানে সেখানে রাখছেন কেন!'

ওটা নিয়ে সাবমারসিবলের পাশে চলে এলেন নাসিম, টোকা দিলেন নোজ কোন-এ।

চেয়ে আছে রানা।

'এটা তোমাকে দেব,' বললেন নাসিম। 'গুড-লাক চার্ম। বলতে পারো আমার একটা কুসংস্কার। ডাইভ দেয়ার সময় সঙ্গে রাখতাম। অনেক রাতে মনে পড়ল এটা তোমাকে দেয়া হয়নি।'

'আরেকটু হলে আমার পাছায় দুই নম্বর ফুটো হয়ে যাচ্ছিল,' মন্তব্য করল বিরক্ত ইঞ্জিনিয়ার।

সাবমারসিবলের পিছনের দরজা খুললেন নাসিম, রানার হাতে দিলেন মেগালোডনের দাঁত। দেরি না করে আটকে দিলেন হ্যাচ।

ক্রেন চালু করল হ্যারল্ড, একমিনিট পেরুবার আগেই রানাকে

নামিয়ে দিল সাগরে।

বাইরের দিকের বাতি জ্বেলে নিল রানা।

নিতুর খোল পেরিয়ে নেমে চলেছে সাবমারসিবল। আরও ক্ষতি হয়েছে জাহাজের, আরও কাত হয়ে গেছে একদিকে।

সাবমারসিবলের গতি বাড়াল রানা, দেখতে না দেখতে পৌঁছল তিন শ' ফুট গভীরতায়। পৌঁছে গেছে নিথর জানোয়ারটার বামে।

মেগালোডনের ম্লান সাদা আলো ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। পঞ্চাশ গজ আলোকিত, তারপর সাগরে নেমেছে আঁধার। অসংখ্য ছোট মাছ খেলছে দানবীর ত্বকের কাছে। নেটে আটকা পড়েছে জেলিফিশ। বাইরের বাতিগুলো নিভিয়ে দিল রানা। ঘুরিয়ে নিল সাব, স্থির করল মস্ত হাঙরের মাথার পাশে। তিনটে সাবমারসিবল একত্র করলেও ওই করোটির সমান হবে না।

সামান্য হাঁ হয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক হাঙরের মুখ। ভিতরে ঢুকছে পানি। মেগালোডনের ডান চোখের কাছে ভাসছে রানা। উল্টে আছে ধূসর-নীলচে চোখ, দেখা গেল শুধু সাদা অংশ।

'রানা!'

থমথমে নীরবতার ভিতর ভীষণ চমকে গেল রানা।

'মানামি, একেবারে ভড়কে দিয়েছ।'

রেডিয়োতে ভেসে এল মেয়েটির মিষ্টি হাসি। 'সরি, রানা।' সিরিয়াস হলো ও, 'এখনও প্রতি মিনিটে পঁচাশি বিট। কেমন লাগছে ওকে দেখতে?'

'ঘুমন্ত-ভয়ঙ্কর-সুন্দরী,' মন্তব্য করল রানা। মেগালোডনের পাঁচ গিল পর্দার পাশে থেমেছে। 'মানামি, আমরা লেগুনের কত দূরে?'

'চার মাইলের একটু কম। ক্যাপ্টেন বলেছে, আর বড়জোর দু'ঘণ্টা। রানা, তোমার কপাল মন্দ, দেখতে পেলে না দারুণ

সূর্যোদয়।'

'মনে হচ্ছে খুব সুন্দর একটা দিন শুরু হচ্ছে,' বলল রানা।

প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীটা কখন আসবে সেজন্য সারারাত তীরের কাছে নোঙর ফেলে অপেক্ষা করেছে একদল মানুষ।

এই দলে কয়েকজন বিজ্ঞানী আছেন, অন্যরা বেশিরভাগই টুরিস্ট বা উত্তেজনাকাঙ্ক্ষী দর্শক— ঐতিহাসিক ঘটনায় অংশ নিতে প্রাণের ঝুঁকি গ্রহণেও আপত্তি নেই কারও।

নানান যানে করে এসেছে এরা, ওয়েভ রানার থেকে শুরু করে ইয়টও এসে ভিড় করেছে। ছোট আউটবোর্ড বোট থেকে নিয়ে বড় মাছ-ধরা ট্রলারও হাজির। পৌঁছে গেছে আশপাশের পঞ্চাশ মাইলের সব ওয়েইল-ওয়াচিং কোম্পানির বোট। সাধারণ দরের চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশি ভাড়াতেও বোটে উঠেছে দর্শক। পাঁচ শ' ক্যামকর্ডারের মালিক ব্যাটারি ফুল চার্জ দিয়ে তৈরি!

আটচল্লিশ ফুটি মাছ-ধরা ট্রলারের রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে মোঁসিউ দো টুহোনো, বিনকিউলার দিয়ে দেখছে শীতের ধূসর দিগন্ত।

উত্তর-পশ্চিমে সিকি মাইল দূরে টয়োডা মেমোরিয়াল লেগুনের খাল।

ওখান থেকে বহু দূরে টুহোনো দেখতে পেল নিতুর বো।

বিনকিউলার নামিয়ে কেবিনের দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

'একুস্তে, ওরা শেষপর্যন্ত পৌঁছে গেছে,' অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলল। 'আমাদেরকে কতটা কাছে নেবে, ক্যাপ্টেন?'

মাথা নাড়ল একুস্তে। 'সরি, মোঁসিউ টুহোনো। বলে দিয়েছে ভীষণ বিপদ হতে পারে, কাজেই অগভীর পানি ছেড়ে সরবে না।'

'দোষ দিতে পারছি না তাকে।' চারপাশে চোখ বোলাল টুহোনো। সকালের প্রথম আলোয় দেখা যাচ্ছে কয়েক শ' বোট।

আস্তে করে মাথা নাড়ল সে। 'আমাদের অন্য বন্ধুরা সম্ভবত অতটা সচেতন নয়।'

ধুঁকতে ধুঁকতে অতি মন্থর গতি তুলে লেগুনের দিকে আসছে ফ্রিগেট নিতু, দেখল ডাক্তার ফিল ম্যাককমন। মোঁসিউ দো টুহোনোর মত উত্তেজনা নেই তার, কিন্তু পেটের পেশি টানটান, বুকে চাপা কষ্ট। ঘৃণা ও রাগে শক্ত হয়ে গেছে ঘাড়ের রগ ও কপালের শিরা।

'সময় হয়েছে, মিস্টার ডোনোভান,' দিগন্ত থেকে চোখ সরিয়ে বলল সে।

থ্রটল এনগেজ করল মিলিয়োনেয়ার। ধুপধুপ আওয়াজে চালু হলো লাভ অ্যাট সি। দূরের জাহাজের দিকে রওনা হয়ে গেল অত্যাধুনিক জলযান।

এইমাত্র ভোরের ধূসর চাদর ভেদ করে সাগরে ঢুকেছে সূর্যের সোনালি রশ্মি। আলো পড়েছে বিশাল ধবল দেহে, একটু পরেই লেগুনের ভিতর নিয়ে যাওয়া হবে মেগালোডনকে।

ওটার ডান চোখ থেকে পাঁচ ফুট দূরে ভাসছে রানার অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান।

মেগার অক্ষিকোটরে উল্টে আছে মণি।

'রানা,' রেডিয়ো করল মানামি, 'আমার মনে হয় কিছু ঘটছে মেগালোডনের।'

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে উঠল রানা। 'ব্যাখ্যা করো।'

'ধীরে পাল্‌স্ বাড়ছে। এইমাত্র ছিল সাতাশি, এখন নব্বুই...'

'রানা, আমি নাসিম,' গম্ভীর কণ্ঠ শুনল রানা। 'তামেশুর সঙ্গে আলাপ করার পর নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যদি লেগুনে ঢুকবার আগেই ওটা জেগে যায়, আমি হার্পুন ছুঁড়ব। বাঁচুক, চাই মরুক।

এত মানুষের জীবন নিয়ে খেলতে পারব না আমরা। সতর্ক থাকো, যাতে চট্ করে সরে যেতে পারো।'

এ ছাড়া অন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না নাসিম ভাই বা তামেশু, ভাবল রানা। জাহাজ নিয়ে লেগুনে ঢুকে যাওয়ার আগেই মেগালোডন জেগে উঠলে ভয়ঙ্কর বিপদ হবে।

ওটার খোলা চোয়ালের দিকে চাইল রানা।

এই শিকারি প্রজাতি সত্তর মিলিয়ন বছরের বেশি সময় ধরে টিকে আছে।

তার ভাবতে হয় না, মুহূর্তে হামলা করে।

পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে দেহের প্রতিটি কোষ।

সবই তার জানা।

প্রকৃতি স্থির করেছে, সাগরের আর সব প্রাণীর উপর প্রভুত্ব করবে সে।

'আমাদের বোধহয় উচিত ছিল তোমাকে বিরক্ত না করা,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'রানা!' তীক্ষ্ণ শোনাল মানামির কণ্ঠ। 'আমার আগের কথাটা শুনতে পাওনি?'

'সরি, কিছু বলবে...'

'আমাদের দিকে আসছে একটা ইয়ট,' গলা চড়ে গেল মানামির। 'আর পাঁচ শ' গজ! দ্রুত কমে আসছে দূরত্ব!'

'ওটা ডোনোভানের লাভ অ্যাট সি,' বললেন নাসিম।

'লাভ অ্যাট সি?' চমকে গেল রানা।

'হ্যাঁ।'

ম্যাক্স ডোনোভান কী করছে, ভাবতে শুরু করেছে রানা।

'বিনকিউলারে দেখছি ওর ইয়ট,' বললেন নাসিম। 'আমাদের স্টার্নের দিকে আসছে। ইয়টের ট্র্যানসমে ভারী স্টিলের ড্রাম রেখেছে দুই লোক। ...ফিল ম্যাককমন আর ফ্রেড স্কিলার।'

'এরা কী চায়, আঁচ করতে পারেন, নাসিম ভাই?' জানতে চাইল রানা।

'আমাদের সঙ্গে দূরত্ব তিন শ' গজ... দুই শ'...' আরেকবার স্টিলের ড্রামের দিকে চেয়ে চট্ করে বুঝে গেলেন নাসিম। 'রানা!' মানামির হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিলেন মাইক। 'সরাসরি তোমার দিকে আসছে ওরা! ডেপথ চার্জ! গভীর সাগরের দিকে রওনা হয়ে যাও!'

খপ্ করে জয়স্টিক ধরল রানা, ঘুরিয়ে নিল সাবমারসিবল, মেগালোনের পাশ থেকে সরে গিয়ে নামতে লাগল।

জয়স্টিক পিছিয়ে নিয়েছে বাড লিটলটন, ফ্রিগেট নিতুর ডেক থেকে প্রায় লাফিয়ে আকাশে উঠেছে ওর হেলিকপ্টার। কাত হয়ে বামদিকে সরে যাওয়ায় মনে হলো দেরি না করে আকাশ থেকে হামলা করবে লাভ অ্যাট সি-র উপর।

প্রথমে আওয়াজ পেল ম্যাক্স ডোনোভান, কয়েক সেকেণ্ড পর দেখল, কোত্থেকে হাজির হয়েছে যান্ত্রিক এক ফড়িং।

ওটা আসছে সোজা কলিশন কোর্স ধরে!

ভয় পেয়ে গেল মিলিয়োনেয়ার, বেসুরো চিৎকার করেই বামে ঘুরিয়ে নিল হুইল।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, কপ্টারের নীচের প্ল্যাটফর্মের থার্মাল ইমেজারের পা সোজা লাথি মারল লাভ অ্যাট সি-র রেইডার অ্যান্টেনার ঠ্যাঙে। সব উপড়ে অ্যালিউমিনিয়ামের নানান যন্ত্রাংশ ছিটকে পড়ল।

ইয়টের ডেকে পড়ছে সব, যেন আকাশ থেকে ঝরঝর করে নামছে ধাতব বৃষ্টি।

মাথা বাঁচাতে ডাইভ দিল ম্যাককমন ও স্কিলার। ছিটকে গিয়ে পড়ল আরেকদিকে। একাকী পড়ে রইল পাঁচ শ' পাউণ্ডের ডেপথ

চার্জ। ট্র্যানসমে বেকায়দাভাবে দুলছে ওটা। আর ঠিক তখনই বামে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল ইয়ট। ট্র্যানসমের উপর গড়াতে শুরু করেছে ব্যারেল, পরক্ষণে ঝপাস্ করে নেমে গেল সাগরে। ক্যানিস্টারের ছয় গর্তের ভিতর ঢুকল পানি, ভরে গেল পিস্তল চেম্বার, নীচের দিকে রওনা হয়ে গেল বোমা।

অ্যালিউমিনিয়ামের রেডার টাওয়ারের ভাঙা অংশ বিঁধেছে ম্যাককমন ও স্কিলারের পিঠে। ব্যথার ভিতর টের পেল, জাহাজ থেকে সরে যেতে শুরু করেছে ইয়ট।

উঠে বসল ফিল ম্যাককমন, মুখ তুলে উপরে চাইল। তার মনে হলো সরাসরি নাক নিচু করে নেমে আসছে হেলিকপ্টার!

ডেকের একফুট উপরে থামল ওটা, তেড়ে এল বো থেকে স্টার্নের দিকে।

'হারামজাদা বদ্ধ পাগল!' চেঁচিয়ে উঠল ফিল ম্যাককমন।

'শুয়ে পড়ুন!' পাল্টা চেঁচাল ফ্রেড স্কিলার।

জয়স্টিক পিছিয়ে নিয়ে চিৎকার করতে করতে এল বাড লিটলটন, সেই সঙ্গে বিকট হাসি। 'হোওওওও! বাডের আক্রমণ!'

'বুম!'

হামলা করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের আওয়াজে নিজেই ভীষণ চমকে গেল বাড, চরকির মত ঘুরে গেল কপ্টারের লেজ। কোনওমতে জয়স্টিক ধরে আকাশযান স্থির রাখল। আর তখনই শুরু হলো মুড়মুড় আওয়াজ। লাভ অ্যাট সি-র উপরের ডেকে গেঁথে গেছে ল্যাণ্ডিং গিয়ার, বিলাসবহুল স্টেটরুমের ছাত ছিঁড়ে নিয়ে দিশা হারিয়েছে কপ্টার। আর বাতাস কাটছে না রোটর। কিছু বুঝবার আগেই কাত হয়ে ঝপাস করে সাগরে নামল কপ্টার নিয়ে লিটলটন।

তিন শ’ বারো ফুট গভীরতায় রিলিয হয়েছে ডেপথ চার্জের স্প্রিং, পারকাশন ডেটোনেটর গেঁথে গেছে প্রাইমারে। তখনই বিস্ফোরিত হয়েছে অদক্ষ হাতে তৈরি বোমা। ভয়ঙ্কর এক ঝলকানি দেখা গেছে সাগরের নীচে, সেই সঙ্গে বিকট আওয়াজ। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বিস্ফোরণের বৃত্তের পঁচিশ ফুটের ভিতর, সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড শক ওয়েভ।

অদৃশ্য স্রোতের বিপুল শক্তি পাশ থেকে আঘাত হানল অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানে, গড়াতে গড়াতে বহু দূরে সরে গেল ডানাওয়ালা ক্রাফট। লেক্সান কোনে বেশ ক’বার আছড়ে পড়েছে রানা। চিড় ধরে গেছে ওর করোটিতে, জ্ঞান নেই বললেই চলে।

ভয়ানক বিস্ফোরণে জাহাজের খোলা সব জিনিস ছিটকে পড়েছে নানাদিকে, ফেটে চুরচুর হয়েছে কাঁচের বাল্‌ব্‌গুলো। দেরি না করে চিৎকার করে ক্রুদের নির্দেশ দিতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন।

এক্ষুনি সিল করা দরকার ইঞ্জিনরুম, কিন্তু মিডিয়ার সব হেলিকপ্টারের কারণে ওই হুকুম দেয়া কঠিন হলো।

ডেকে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে মানামি সিনোসুকা। সবার আগে রানার কথা ভেবেছে ও, দেরি না করে রেডিয়ো ট্র্যান্সমিটারে যোগাযোগ করতে চাইল।

‘রানা, কাম ইন, প্লিয...’ ওদিক থেকে সাড়া দিচ্ছে না কেউ। শুধু স্ট্যাটিক। ‘রানা... ডক্টর নাসিম, আমি কোনও সিগনাল পাচ্ছি না...’

‘মানামি,’ সিঁড়িঘরে উঠে দাঁড়িয়েছেন তামেশু সিনোসুকা। উপরের ধাপে উঠে এসে ধপ্ করে বসে পড়লেন।

ফেটে গেছে ভদ্রলোকের কপাল।

ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরল মানামি, রক্তে ভেসে গেল

ওর হাত। 'এক্ষুনি ডাক্তারকে আসতে বলুন কেউ!'

নিতুর স্পিকারের পাশ থেকে মাইক্রোফোন নিলেন নাসিম, দ্রুত বলতে লাগলেন যেন দেরি না করে এখানে চলে আসেন জাহাজের ডাক্তার। এবার ঝট্ করে মেগালোডনের কার্ডিয়াক মনিটরের দিকে ফিরলেন তিনি। ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাচ্ছে প্রতি মিনিটে এক শ'র বেশি হৃৎস্পন্দন চলছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের শীতল জলের স্পর্শে সচেতন হয়ে উঠল বাড লিটলটন। চট্ করে চোখ মেলল। বুঝতে দেরি হলো না, পানির নীচে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাত হয়ে আছে ও। ঝটপট খুলে ফেলল সিট বেল্টের রিলিয। আর তখনই ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল বিধ্বস্ত হেলিকপ্টার।

শক ওয়েভ মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর সিধে করে নিতে চাইল সাবমারসিবল।

ইলেকট্রিকাল সব পাওয়ার থেমে গেছে।

বিড়বিড় করে নিজের কপালের দোষ দিল রানা।

তারপর দু'পাশে দোলাতে শুরু করল শরীরটা।

ক্রমেই বাড়ছে দোল।

যেন পেণ্ডুলামের মত দুলছে সাবমারসিবল।

আরও কয়েক সেকেণ্ড পর কাত হয়ে গড়িয়ে গেল জলযান। লেজ তাক করল উপরের দিকে, আর নাক নীচের দিকে।

'নাসিম ভাই, কাম ইন!'

সাবমারসিবলের আর সব ইলেকট্রিকাল যন্ত্রের মতই থেমে গেছে রেডিয়োও।

সাবের ভিতর আবছা আলো।

ডানদিকে ম্লান ওই কিরণ দেখে চমকে গেল রানা।

ও ভাসছে মেগালোডনের চোখের বাস্কেটবল আকৃতির মণি থেকে ঠিক তিন ফুট দূরে।

নীল-ধূসর চোখ এখন খোলা।

ওটার অন্ধ চোখটা চেয়ে আছে রানার দিকে!

আটাশ

পালিশ করা কাঠের মেঝেতে শরীর টেনে চলেছে ম্যাক্স ডোনোভান, এখনও বুঝতে পারেনি কী ঘটেছে।

ভাসতে ভাসতে কোথায় যেন চলেছে লাভ অ্যাট সি।

দুই ইঞ্জিন এখন বন্ধ।

একটু দূরে হেলিকপ্টারের রোটর দেখতে পেল ম্যাক্স।

টুপ করে ডুবে গেল রোটর ঢেউয়ের নীচে।

'মর্ হারামজাদা,' বিড়বিড় করল ম্যাক্স। মোটরের সুইচ অন করল। চালু হলো না ইঞ্জিন।

'শালারা...' চুপ হয়ে গেল ম্যাক্স। কয়েক সেকেণ্ড পর গলা ছাড়ল, 'ম্যাককমন, স্কিলার! কোন্ জাহান্নামে আপনারা?' ডেকে বেরিয়ে এল নিজে, এবার ট্র্যানসমে দেখল লোকদুটোকে। জানতে চাইল, 'মরেছে ওই মেগালোডন?'

পরস্পরের দিকে চাইল ফিল ম্যাককমন ও ফ্রেড স্কিলার।

'মরার তো কথা,' বলল স্কিলার।

পুরো নিশ্চিত মনে হলো না তাকে।

'আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে মনে হচ্ছে?' বলল

ম্যাক্স।

'কপাল মন্দ,' বলল স্কিলার। 'বাধ্য হয়ে আগেই চার্জ ফেলে সরে যেতে হয়েছে। তখনই হামলা করল উন্মাদ লোকটা।'

'এবার দেরি না করে এখান থেকে সরে পড়া উচিত,' বলল ডাক্তার ম্যাককমন।

'তাতে সমস্যা আছে,' দাঁতে দাঁত চিপে বলল ম্যাক্স। 'ইঞ্জিন নষ্ট। আপনাদের ফালতু বোমার কারণে খুলে গেছে কোনও তার। আর নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আমি মিস্ত্রি নই?'

'যিশু! মিস্টার ডোনোভান, আপনি কি বলতে চান ওই মেগালোডনের সঙ্গে একই জায়গায় আটকা পড়েছি আমরা?' ঘনঘন মাথা নাড়ল ম্যাককমন, দৃঢ় হয়ে গেল চোয়াল।

'ফিল, ওই দানব শেষ, বিশ্বাস রাখুন আমার উপর,' বলল ফ্রেড স্কিলার। 'কয়েক সেকেণ্ড পর দেখবেন পেট আকাশে তাক করে ভেসে উঠেছে।'

প্রাক্তন সিও-র দিকে চাইল ডাক্তার ম্যাককমন, গম্ভীর সুরে বলল, 'স্কিলার, ওটা হারামি হাঙর। ওই জিনিসের লাশ ভেসে ওঠে না। সত্যিই যদি মরে থাকে, ডুবে যাবে সাগরের নীচে।'

আর তখনই বামদিকে ওরা শুনতে পেল ছলাৎ আওয়াজ।

যেন ডেবে গেল ইয়ট।

মইয়ের ধাপে হাত রেখে উঠে এল বাড লিটলটন।

'দারুণ সুন্দর সকাল, কী বলো, গাধার পোঁদসকল?' কথাটা বলল বাড মুড নিয়েই, কিন্তু পা পিছলে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ওদের পায়ের কাছে। মান-সম্মান থাকল না আর।

উপুড় হয়ে শুয়ে আছে রানা, সাবমারসিবল থেকে চেয়ে আছে মেগালোডনের খোলা চোখের দিকে।

কার্গো নেটে আটকা পড়েছে নিষ্প্রাণ অ্যাবিস গ্লাইডার-

ওয়ানের বামের মিডউইং।

নীল-ধূসর চোখে প্রাণীটা দেখতে পাচ্ছে না খুব কাছের ওই খুদে ডুবোজাহাজ।

একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, ভাবল রানা। কিন্তু নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে, ও এখানেই আছে।

এদিক ওদিক ভারী লেজ নাড়ল মেগালোডন।

সামনের দিকে যাওয়ার ইচ্ছে বোধহয়।

গিলের পর্দা চোখের কাছে এসে ঝট্ করে সামনে চলে গেল।

আগু-পিছু করল মস্ত স্নাউট।

জেগে গেছে ভয়ঙ্কর প্রাণী।

জোরে নড়ে উঠতেই জাল থেকে ছাড়া পেয়ে গেল অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানের ডানা।

লেজ উপরে তুলে উঠছে সাবমারসিবল।

নীচে চেয়ে আছে রানা।

হোঁচট খেয়ে সামনে বাড়ল মেগালোডন।

বুকের পাশের ফিনগুলোতে জড়িয়ে ফেলল কার্গো নেট।

রেগে গেল দানবী, একবার পাক খেল।

তারপর দ্বিতীয়বার, আরও ভালভাবে পেঁচিয়ে গেল ফাঁদে।

পাখনার তৈরি ঢেউ লেগে পিছিয়ে গেল সাবমারসিবল।

নিয়ন্ত্রণ করবার উপায় নেই, ওটার দানব আকৃতিটা আর দেখতে পেল না রানা।

আবারও নীচে তাক হলো সাবের নাক।

এবার দেখা গেল খেপে ওঠা মেগালোডনকে।

কার্গো নেটের ভিতর আটকা পড়েছে কানকো থেকে শুরু করে পেলভিক ফিন।

'ডুবে মরবে,' আপন মনে বলল রানা।

লেগুনের বাইরে নোঙর করা অসংখ্য বোটের অনেকেই দেখেছে, নির্দিষ্ট এক সুপার ইয়ট রওনা হয়েছিল সাগরের দিকে। যেন সম্মান দেখিয়ে ডেকে আনবে তামেশু সিনোসুকার জাহাজকে। সবাই খেয়াল করেছে, ওই দারুণ ইয়টকে ঠেকাতে হাজির হয়েছিল এক হেলিকপ্টার। হামলা করেছিল জলযানের উপর। তারপর নিজেই ছিটকে পড়েছে সাগরে। তখন ভয়ঙ্কর এক বিস্ফোরণ হয়েছিল। আর এখন দর্শকরা আরও কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। ধারণা করছে, ওই বিস্ফোরণে মারা পড়ে থাকতে পারে মেগালোডন। তাই যদি হয়, এই যে এত টাকা খরচ করে এসেছে ওরা, সব পানিতে যাবে।

একই চিন্তা ঢুকেছে কমপক্ষে বড় পনেরোটা ফিশিং বোটের দর্শকদের মনে। তারা চাপ দিয়েছে তাদের ক্যাপ্টেনকে। বাধ্য হয়ে সাহসী হয়ে উঠেছে ক্যাপ্টেনরাও।

কাত হয়ে আসছে জাহাজটা, তার দিকে রওনা হয়ে গেছে বোটগুলো।

দর্শকরা ছবি তুলবে প্রাগৈতিহাসিক দানবের।

ওটা জীবিত থাক বা না থাক।

ফ্রিগেট নিতুর আকাশে ভাসছে নয়টি মিডিয়া হেলিকপ্টার, ক্যামেরার ভাল অ্যাংগেল পাওয়ার জন্য নানাদিকে সরছে। পানির নীচের ওই বিস্ফোরণের ফলে কাহিনিতে নতুন মোড় তৈরি হয়েছে। প্রতিটি নেটওঅর্ক তাদের হেলিকপ্টার ক্রুদের নির্দেশ দিয়েছে, যে ভাবে পারো জানাও মেগালোডন বেঁচে আছে কি না।

চ্যানেল সেভেন অ্যাকশন নিউজের কপ্টারে আছে ডন রে, ক্যামেরাম্যানের কাঁধের উপর দিয়ে নীচে দেখতে চাইছে।

পানির নীচে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাদা ম্লান আলো।

কিন্তু প্রাণীটা বেঁচে আছে না মরেছে, বোঝা যাচ্ছে না।

ডনের বাহুতে টোকা দিল পাইলট, মাথার ইশারা করে দেখাল কপ্টারের অপর পাশ।

মেগালোডনকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে অসংখ্য বোট।

স্নাউটের ডগা থেকে শুরু করে লেজের ফিন পর্যন্ত মেগালোডনের রয়েছে খড়খড়ে ডার্মাল ডেণ্টিকল। ওগুলোকে বলা যায় ত্বকের দাঁত। শিরিশ কাগজের মত খসখসে চামড়া। ওটাও একটা প্রকৃতিদত্ত অস্ত্র। কার্গো নেটে মেগাটা মোচড়া-মুচড়ি শুরু করতেই ডেণ্টিকলগুলো করাতের মত দ্রুত ছিঁড়তে শুরু করেছে জালের দড়ি।

ওটাকে বারবার নড়তে দেখছে রানা।

ছাড়া পেতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দৈত্যটা।

সময় নষ্ট করল না রানাও, পরীক্ষা করতে হবে সাবের ফিউজ। কিছুক্ষণ পর ওর দিকে ঘুরে গেল মেগা, মস্ত হাঁ করল মুখ, দেখা গেল ত্রিকোণ দাঁতের বীভৎস মেলা।

আবারও সাবমারসিবলের পাওয়ার সুইচ অন করল রানা।

চালু হলো না মোটর।

উপরে উঠতে শুরু করেছে মেগালোডন।

নাসিম আহমেদ তৈরি রেখেছিলেন হার্পুন গান। তাক করা ছিল টার্গেটে। কিন্তু একটু আগে হ্যারল্ড ডেভিড জানাল, সে একাই নিখুঁতভাবে চালাতে পারবে কামানের মত ওই জিনিস। তখন দায়িত্বটা থেকে সরে গেছেন নাসিম।

এইমাত্র সেফটি অফ করে দিল হ্যারল্ড।

ক্রমেই উঠে আসছে মেগালোডন, মুখের ভিতর হু-হু করে ঢুকছে সাগরের পানি। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর দুনিয়াকে দেখাল নিজের সাদা চকচকে পেট।

হার্পুন গান ঝট্ করে ঘুরিয়েই ট্রিগার টিপে দিল হ্যারল্ড ডেভিড।

ক্লিক আওয়াজ হলো।

'মরুক শালা!' হায়-হায় করে উঠল ইঞ্জিনিয়ার।

পানির নীচের ওই বিস্ফোরণের ফলে জ্যাম হয়ে গেছে অস্ত্রের ভিতরের চেম্বার।

জাহাজের প্রত্যেকে বেরিয়ে এসেছে ডেকে। ব্যস্ত হয়ে পরছে কমলা লাইফ ভেস্ট। পাইলট হাউসে জাহাজের ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছে তামেশু সিনোসুকাকে। ওখানেই দাঁড়িয়ে নাসিম, মানামি ও সোনারম্যান পল।

'আপনার বাবার কপালের হাড়ে চিড় ধরেছে, মিস সিনোসুকা,' বলল ডাক্তার। 'দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।'

মাথার উপর বিকট আওয়াজ তুলছে মিডিয়ার কপ্টারগুলো. ওই তর্জনের উপর দিয়ে সোনার-ম্যানের উদ্দেশে বলল মানামি. 'রেডিয়ো করুন কপ্টারগুলোকে। একটা হয়তো নামবে জাহাজে। বলবেন, ইমার্জেন্সি। জাহাজে রোগী, হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে। ...ডাক্তার, আপনি বাবার পাশে থাকুন। আমি হ্যাঙার ডেক থেকে ঘুরে আসছি।'

পাইলট হাউস থেকে বেরিয়ে গেল মানামি, ছুটতে শুরু করেছে।

জাপানি সুন্দরীকে প্রথমে দেখল ডন রে, হেলিপ্যাডে দাঁড়িয়ে বারবার হাতের ইশারা করছে সে।

'ওকে আমি আগেও দেখেছি,' বলল ডন রে। 'কোথায়? ও, হ্যাঁ, ও-ই তো সিনোসুকার মেয়ে! ...ক্যাপ্টেন, নামতে পারবেন নিতুর ডেকে?'

'কোনও সমস্যা নেই।'

‘একমিনিট,’ বলল ক্যামেরাম্যান। ‘কান ফাটিয়ে দিল আমার প্রডিউসার, মেগালোডনের কাছে নিতে হবে ক্যামেরা। আপনারা যদি জাহাজে নামেন, সকালে নাস্তার সময় পোচ ডিমের বদলে আমার বিচি ভেজে খাবে সে।’

‘পরিস্থিতি বুঝতে হবে তোমাকে,’ বলল ডন রে। ‘জাহাজটার উপর হামলা করছে মেগালোডন। কাজেই...’

‘তাই আরও জরুরি ওখানে ল্যাণ্ডিং না করা, তা হলে হয়তো মেগালোড...’

‘নিতু থেকে ডিসট্রেস কল পেলাম,’ বলল পাইলট। ‘আহত এক লোককে তীরে নিতে অনুরোধ করছে। রেডিয়োম্যান বলল, ওই আহত লোক জাহাজের মালিক তামেশু সিনোসুকা। সিরিয়াস ভাবে আহত।’

‘কপ্টার নামান,’ নির্দেশ দিল ডন রে।

ভুরু কুঁচকে ভয়ঙ্কর চেহারা করে ডনকে দেখল ক্যামেরাম্যান। ‘মর্, শালা!’

হ্যাঁচকা টানে তার হাত থেকে ক্যামেরা কেড়ে নিল ডন রে, ওটা বের করে দিল পাইলটের খোলা দরজা দিয়ে। ‘আমরা হয় নামব, নইলে তোমার ক্যামেরা খাইয়ে দেব মেগালোডনকে।’

একমিনিট পেরুনোর আগেই নিতুর প্যাডে নামল কপ্টার।

ফ্রিগেট নিতুর নীচে পাগলের মত চক্কর কাটছে মেগালোডন। জাহাজের খোলের ভাঙা প্লেট, ভিতরের লবণাক্ত পানি, নতুন তৈরি গ্যালভ্যানিক কারেন্ট, ইলেকট্রিকাল ইমপালস— সব মিলে ভয়ঙ্কর রাগিয়ে দিচ্ছে তাকে।

মেগা বুঝে নিয়েছে, এক্ষুণি হামলা করতে হবে!

চুপচাপ দরদর করে ঘামছে রানা। সাবমারসিবলের ব্যাটারির লুয কানেকশন খুঁজছে ও হাত বাড়িয়ে। চোখে দেখছে না

ওদিকটা। ধারণা করছে, খুলে গেছে পিছনের প্যানেলের কোন কানেকশন।

হঠাৎ জোরালো ঢেউ দুলিয়ে দিল অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানকে।

উপরে উঠে গেল সাবমারসিবল।

পরিষ্কার দেখতে পেল রানা মেগালোডনটাকে। ওটার কাণ্ড দেখে ভীষণভাবে চমকে গেল ও।

স্নাউট ভরে দিয়েছে ওটা নিতুর ভাঙা খোলে।

ভয়ঙ্কর সংঘর্ষের কারণে হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে হয়েছে জাহাজের প্রায় সবাইকে। খোলের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ক্যাঁচকোঁচ ধাতব গোঙানি।

'হারামজাদী ডাইনী...' অভিশাপ দিতে শুরু করেছে ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন। 'খেয়ে ফেলছে আমার জাহাজ! লাইফবোটে ওঠো সবাই! পাইলট, জাহাজ থেকে সরিয়ে নিন মিস্টার সিনোসুকাকে! পানিতে রক্ত না মিশলেই ভাল!'

খবরের চ্যানেলের পাইলট চট্ করে দেখল ডন রে এবং ক্যামেরাম্যানকে। 'যদি আহত লোক নিতে হয়, আপনাদের একজনকে নেমে যেতে হবে।'

ডন রে-র দিকে চেয়ে ভয়ঙ্কর অশুভ হাসি দিল ক্যামেরাম্যান। 'আশা করি সাঁতার জানো তুমি, মিস্টার?'

পেটের ভিতর ফড়ফড় শুরু করেছে প্রজাপতি, টের পেল সাংবাদিক। তবে তর্ক না করে নেমে পড়ল কপ্টার থেকে। ডাক্তার এবং মানামি মিলে কপ্টারের পিছনের সিটে তুলে দিল তামেশু সিনোসুকাকে। কাত হয়ে যাওয়া ডেকে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল ডন রে।

কয়েক সেকেণ্ড পর উড়াল দিল কপ্টার, রওনা হয়ে গেল তীর লক্ষ্য করে।

'তুই শালা জানিস না কীসের মধ্যে পড়লি,' বিড়বিড় করে নিজেকে গাল দিল ডন রে।

পোর্টের রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাক্তন ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার। বগলে প্রায় ভরে ফেলেছে ডাক্তার ফিল ম্যাককমনকে, যেন বয়া পেয়েছে। 'আমরা বোধহয় ডুবে যাচ্ছি!'

'আরে ধূর!' চারপাশ দেখল ম্যাককমন। 'ডোনোভান আর লিটলটন কই?'

'বোধহয় মরেই গেছে। তাই যদি হয়, কপাল ভাল ওদের।'

'ওদিকে যোডিয়াক,' রাবার রাফট দেখাল ডাক্তার। 'আসুন।'

ক্রমেই পানিতে ভরে উঠছে লাভ অ্যাট সি। চক্কর কাটার মত করে ধীরে ধীরে ঘুরছে একই জায়গায়। দু'জনের জন্য সাগরে নামানো কঠিন মোটরযুক্ত রাফট। কিছুক্ষণ পর ঝপাস্ করে রাবারের নৌকা নামল পানিতে।

ম্যাককমনের দিকে চাইল স্কিলার। 'নামুন।'

রেলিং টপকে রাফটে নেমে পড়ল ডাক্তার, তারপর প্রাক্তন ক্যাপ্টেন। পঁয়ষট্টি হর্সপাওয়ারের আউটবোর্ড মোটর চালু করল সে। থ্রটল দাবিয়ে দিতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন। সাগরে নাক তুলল যোডিয়াকের বো, ঢেউ পেরিয়ে ছুটল তীরের দিকে। ওদিক থেকে আসছে একের পর এক ছোট-বড় বোট।

'ওগুলো থেকে সাবধান!' জোরালো হাওয়ার উপর দিয়ে বলল ডাক্তার ম্যাককমন।

সরে যাওয়ার বিশেষ সুবিধা নেই স্কিলারের। তীরের দিক থেকে আসছে একগাদা বোট। গতি কমাল সে, ওই বোটগুলোকে পাশ কাটিয়ে তীরের দিকে যেতে চাইল।

আর তখনই সাগরের নীচ থেকে তীরের মত লাফিয়ে উঠল বিশাল মেগালোডন। একটুর জন্য ম্যাককমন ও স্কিলারের

যোডিয়াকটাকে মুখের ভিতর পুরতে পারল না। প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের পিঠে চাপল রাবারের রাফট, পরক্ষণে ঝটকা খেয়ে উড়ে গেল আকাশের দিকে।

পনেরো ফুট উপর থেকে ছেঁড়া পুতুলের মত চার হাত-পা ছড়িয়ে সাগরে নামল ম্যাককমন ও স্কিলার।

মেগালোডনের দু'পাশে পড়েছে দু'জন।

ওই ভয়ঙ্কর দানবের আকস্মিক আগমনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ছুটে আসা দুই মাছ-ধরা ট্রলার বাঁক নিয়ে গেঁথে গেল অন্য জলযানের বুকে। সাগরে তৈরি হলো ভাসমান সব বোটের বড়সড় স্তূপ। নিয়ম মেনে নিজেদেরকে রক্ষা করতে চাইল অন্য বোট। চেঁচামেচি করছে পাইলটরা, সরতে শুরু করেছে। নানাদিক থেকে ধাক্কা-গুঁতো খেয়ে টলমল করতে লাগল জলযানগুলো।

ওই আর্মাডার পঞ্চাশ ফুট উপরে ঝুপ্ করে নেমে এল অবশিষ্ট আট হেলিকপ্টার, এত গোলমালের ভিতর আরও ঝামেলা হয়ে দাঁড়াল বিকট আওয়াজ।

খকখক করে কাশতে কাশতে ভেসে উঠল ফ্রেড স্কিলার। সাঁতার কাটতে শুরু করেছে কাছের এক প্লেযার ক্রাফটের দিকে।

ওই বত্রিশ ফুটি স্পিডবোটে আছে সতেরোজন যাত্রী ও সোনালি রোম অলা এক রিট্রিভার কুকুর।

দু'হাতে খামচে ডেক ধরে উঠতে চাইল স্কিলার, কিন্তু পাটাতন উঁচু হওয়ায় সেটা সম্ভব হলো না।

যাত্রীরা তাকে দেখেনি, শোনেওনি সাহায্যের চিৎকার।

চারপাশে হেলিকপ্টারের বিকট আওয়াজ।

কয়েক সেকেণ্ড পর দূরে একটা মই দেখল স্কিলার, রওনা হয়ে গেল ওদিকে।

কিন্তু মাত্র তিন সেকেণ্ড পর উঠে এল বিশাল এক খোলা মুখ, স্কিলারকে টেনে নিয়ে যেতে চাইল সাগরের নীচে।

রোদে উষ্ণ মই খপ্ করে ধরতে পেরেছে স্কিলার, প্রাণপণে ঝুলে থাকতে চাইল। আর তখনই হাঁটু থেকে কাটা পড়ল তার দুই পা অবশ্য বেরুতে পেরেছে রাক্ষুসীর মুখ থেকে। ক্ষত থেকে গলগল করে সাগরে পড়ছে রক্ত। বোটের প্রপেলারের কারণে নানাদিকে ছিটকে যাচ্ছে লাল তরল।

শিকার হারিয়ে বোকা হয়ে গেছে মেগালোডন। টের পেল চারপাশে প্রচুর রক্ত। দ্বিধান্বিত হয়ে ডুব দিল সে।

বিকট চিৎকার জুড়েছে ফ্রেড স্কিলার, এখনও ঝুলছে মইয়ের ধাপ থেকে

চিৎকার শুনতে পেয়েছে বোটের স্টার্নের যাত্রীরা, দেরি না করে ঝুঁকে এল তারা. দু'কবজি ধরে টেনে তুলে নিল স্কিলারকে।

তাকে শুইয়ে দেয়া হলো চওড়া ফাইবারগ্লাসের ট্র্যানসমে।

আর তখনই আবারও সাগর ভেদ করে উঠল মেগালোডনের মস্ত মাথা। বাঁকা হয়ে মুখ খুলল ওটা, চোয়াল নেমে এল ট্র্যানসমে. আস্তে করে কামড়ে ধরল গুরুতর আহত স্কিলারকে, তারপর আকাশে ছুঁড়ে দিল।

হাঁ করল ষাট ফুটি মেগালোডন, যেন প্রশিক্ষিত কুকুর, মালিকের ছুঁড়ে দেয়া বিস্কুট ধরবে— স্কিলারকে মাঝ আকাশেই খপ করে ধরল ওটা, মুখে পুরে বুজে ফেলল মুখ। এক সেকেণ্ড পর আবারও নেমে গেল ঢেউয়ের নীচে। এখন আর চোয়ালের ভিতর নেই লোকটা। পরক্ষণে ডুবে গেল দানবী।

নতুন করে চিৎকার দিল না কেউ। হতবাক হয়ে গেছে, নিজ চোখে দেখেছে কীভাবে খেয়ে ফেলা হলো আস্ত মানুষকে!

এই দুর্যোগের মাত্র চল্লিশ ফুট উপরে চক্কর কাটছে সংবাদ চ্যানেল বা খবরের কাগজের আট কপ্টার। নীচের কাণ্ড দেখে ভীষণ ভয় পেয়েছে পাইলটরা। প্রথমবারের মত বুঝেছে, ওই মেগালোডন কতটা বড়। পাইলটরা বুঝে ফেলেছে, দেরি না করে

উপরে তুলতে হবে কপ্টার। সবাই একইসঙ্গে পিছিয়ে নিয়েছে জয়স্টিক। ভুলে গেছে, তাদের মাথার ওপর ঘুরছে আট সেট রোটর।

যখন-তখন সাগর থেকে উঠে আসবে দানব, কিন্তু পাইলটরা ভাবেনি বিপদ আসতে পারে উপর থেকেও।

উঠবার সময় কোনাকুণি সংঘর্ষ হলো দুই কপ্টারের, চুরমার হলো রোটরগুলো। ফলে শুরু হলো মারাত্মক বিপর্যয়। নানাদিকে ছিটকে গেল শ্র্যাপনেলের মত ভাঙা রোটর। সামান্য জায়গায় সরতে গিয়ে রক্ষা পেল না একটা কপ্টারও। দুই সেকেণ্ডের এদিক ওদিকে ছিটকে গেল সব, ভেঙে পড়ছে। আর তখনই তৈরি হলো আগুনের মস্ত কুণ্ডলি। নীচের সাগরে ঝরে পড়ল ধাতুর টুকরো, জ্বলন্ত গ্যাসোলিন ও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

ভাঙা কপ্টার ও ক্ষতিগ্রস্ত সব বোটের পঞ্চাশ ফুট নীচে ঘুরছে মেগালোডন। নেমে আসা ধাতব টুকরো পরখ করে দেখছে। আশপাশে মাংস থাকলে চট্ করে পেটে পুরছে। আরও সচেতন হয়ে উঠছে ওটা।

বড় ক্ষুধা!

বড় ক্ষুধা তার!

উনত্রিশ

একেবারে কাত হয়ে গেছে এককালের দুর্দান্ত প্রতাপশালী ইউনাইটেড স্টেটস নেভির রণতরী নিতু। ওটাকে তলিয়ে দিতে

চাইছে সাগরের ঢেউ। তেইশজন ক্রু ঠাসাঠাসি করে বসেছে দুই লাইফবোটে। ডুবন্ত জাহাজের ঘূর্ণিপাক থেকে বাঁচবার জন্য বৈঠা মেরে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে রাফট। আউটবোর্ড মোটর চালু করা হয়নি। তা হলে হাজির হতে পারে শ্বেত-আতঙ্ক।

চোখে অশ্রু নিয়ে প্রিয় জাহাজের দিকে চেয়ে আছে ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন।

সাগর সমতলে মাসুদ রানার চিহ্ন পাওয়ার জন্য চারপাশে চোখ রাখছে মানামি। কিন্তু কোথাও ভেসে ওঠেনি অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান।

মানামির পাশে আক্ষরিক অর্থেই থরথর করে কাঁপছে ডন রে, প্রার্থনা করছে বিড়বিড় করে। জাহাজের ক্রুরাও ওই একই কাজে ব্যস্ত।

মানামির আরেক দিকে হাঁটু গেড়ে বসে আছে হ্যারল্ড ডেভিড, যেন পাথর হয়ে গেছে।

একটু দূরে দেখা গেল নাসিম আহমেদকে। তিনি যেন আশঙ্কা করছেন যে-কোনও সময়ে দেখা দেবে শ্বেত-দানবী।

বৈঠাধারীদের পাশে দাঁড়িয়েছে রিকি ব্র্যাডসেন, চেয়ে আছে আধ মাইল দূরের সব বোট ও বিধ্বস্ত কপ্টারের জঞ্জালের দিকে।

'কুত্তি, শুয়োরণী,' বিড়বিড় করে বলল সে। নিজের নাবিকদের দিকে চাইল। 'আমরা কি মোটর চালু করব, না অপেক্ষা করব? ....হ্যারল্ড?'

'জানি না,' বলল ইঞ্জিনিয়ার।

'যে-কোনও যান্ত্রিক আওয়াজে ছুটে আসতে পারে ওই মেগালোডন,' বললেন নাসিম। 'এসব বোট কত দ্রুত চলে?'

'আমরা যেভাবে ঠাসাঠাসি করে বসেছি, দশ থেকে পনেরো মিনিট লাগবে তীরে পৌঁছুতে।'

নাবিকরা আশা নিয়ে চেয়ে আছে ক্যাপ্টেনের দিকে।

‘একমিনিট,’ বলল মানামি। ‘রানা বা ডক্টর নাসিমের কথা মনে আছে আমার। দু’জনই বলেছেন ইঞ্জিনের কম্পন শুনে বিরক্ত হয় মেগালোডন। আগে এদিক থেকে দূর হোক ওটা, তার আগে ইঞ্জিন চালু করা ঠিক হবে না।’

‘আর ওটা যদি এদিক থেকে না সরে?’ জানতে চাইল এক নাবিক। ‘আমার তিন ছেলে-মেয়ে। বউ-বাচ্চা নির্ভর করে আমার বেতনের উপর।’

আরেকজন বলল, ‘আপনারা কি ভাবছেন আমরা এখানে অপেক্ষা করব, যাতে আমাদেরকে খেয়ে ফেলতে পারে ওটা?’

মাথার উপর হাত তুলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড। চট্ করে নাসিম ও মানামিকে দেখে নিল। ‘নাসিম, মানামি, আমার কথা মন দিয়ে শুনুন। এতক্ষণে মারা গেছে মাসুদ রানা। আমরা যদি অপেক্ষা করি, আমাদেরকেও খেয়ে নেবে মেগালোডন।’ গুঞ্জন শুরু হলো নাবিকদের ভিতর। সায় দিচ্ছে তারা। ‘দেখুন ওদিকে কী ঘটছে। ওই রাক্ষুসি এখন লাঞ্চ করছে মানুষ দিয়ে। আমরা যদি এখানে থাকি, আমরা হব ডেযার্ট!’

স্তূপের মত এক জায়গায় থেমে যাওয়া বোটগুলোর উপর স্থির হলো সবার চোখ।

ওদিক থেকে ভেসে এল করুণ চিৎকার।

শুকিয়ে গেছে মানামির কণ্ঠ।

চট্ করে নাসিমের দিকে চাইল।

চোখ সরিয়ে নিলেন ডক্টর।

দু’ ফোঁটা অশ্রু তৈরি হলো মানামির দুই চোখে।

রানা হয়তো আহত, বা মারা গেছে, আর ওরা মানুষটাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে!

দূরে চেয়ে রইল মানামি। ওখানে পানির উপর উল্টো হয়ে ভাসছে এক সিগারেট স্পিডবোট। আবারও চিৎকার এল ওই

বোটের কাছ থেকে। মানামি বুঝল, আসলে চলে যেতেই হবে, এ ছাড়া কোনও উপায় নেই।

এসব ভাবছে, এমন সময় গর্জে উঠল দুই রাফটের ইঞ্জিন, আগে ছুটল রিকি ব্র্যাডসেনের রাফট, পিছনে দ্বিতীয়টা।

বিধ্বস্ত সব বোটকে এড়িয়ে দক্ষিণে যাবে ওরা।

দেরি না করে তীরে উঠবে।

একটা ট্রলার লক্ষ্য করে সাঁতরে চলেছে ফিল ম্যাককমন। বেদম ক্লান্তি ও ভীষণ ভয়ের কারণে এখনও রয়ে গেছে পানিতে। কয়েক সেকেণ্ড পর মাছ-ধরা ট্রলারের টিউনা নেট খপ করে ধরল সে। চোখ বুজে ফেলেছে, অপেক্ষা করছে মৃত্যুর জন্য।

মিনিট পেরিয়ে গেল।

'অ্যাই যে!'

চোখ মেলল ফিল ম্যাককমন, কণ্ঠ শুনে তার মনে হয়েছে পেশিবহুল কালো এক লোককে দেখবে ট্র্যানসমে।

ভুল হয়নি তার।

'এখন সাঁতারের সময় না, বুড়ামিয়া। অনেক হয়েছে, পাছাটা এবার দয়া করে বোটে তোলো।' প্রকাণ্ড এক পাঞ্জা খপ করে ধরল ম্যাককমনের লাইফ ভেস্ট, হ্যাঁচকা টানে তুলে নিল বোটে।

পানিতে তলিয়ে যাওয়া পাইলট হাউসের মেঝেতে জ্ঞান ফিরল ম্যাক্স ডোনোভানের। আবারও প্রায় অজ্ঞান হয়ে যেত। মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। জানা নেই এখনও কীভাবে ভেসে আছে লাভ অ্যাট সি। শেষবার সে দেখেছিল, শিপ-টু-শোর রেডিয়ো নিয়ে কাজ করছিল বাড লিটলটন।

'আমার কী হয়েছে?' দুই হাতে মাথা টিপে ধরল ম্যাক্স।

'আমার ধারণা তোমার ডেপথ চার্জের কারণে খুব রেগে গেছে

মেগালোডন,' মন্তব্য করল বাড। 'আমরা ছিলাম ইঞ্জিনরুমে, আর তখনই হামলা করল ওটা। তোমার অজ্ঞান দেহ তুলে এনেছি এখানে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ডুবছে এখন ইয়ট।'

'আর যোডিয়াক?'

'তোমার দুই বন্ধু নিয়ে গেছে ওটা।'

'শুয়োরের বাচ্চারা! প্রার্থনা করি, যেন কষ্ট পেয়ে মরে!' এই অতি দামি ইয়টে বেশ কয়েকটি ইণ্টারনাল পাম্প আছে। একটার কণ্ট্রোল খুঁজে নিল ম্যাক্স। চালু হয়ে গেল মোটর। দ্রুত কাঁপতে লাগল গোটা ইয়ট। বাইরে গিয়ে পড়ছে সাগরের পানি।

চট্ করে পাম্প বন্ধ করে দিল লিটলটন। 'অনেক বেশি আওয়াজ। বিপদ হতে পারে। এইমাত্র কোস্ট গার্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। আমরা ওদের ওয়েটিং লিস্টে আছি।'

'ওয়েটিং লিস্ট?'

'চারপাশে চেয়ে দেখো,' বলল বাড। 'উন্মাদ হয়ে গেছে ওই দানবী, ধ্বংস করছে একের পর এক বোট, খেয়ে ফেলছে যাকে সামনে পাচ্ছে!'

পাইলট হাউস থেকে বেরুল ম্যাক্স ডোনোভান, কণ্ট্রোল রুমে ঢুকে নেমে গেল তলিয়ে যাওয়া মাস্টার সুইটে।

প্রায় ডুবে গেছে ঘর।

শ্বাস আটকে পানির নীচে কী যেন খুঁজতে শুরু করেছে সে।

তিরিশ সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল।

একহাতে জ্যাক ডেনিয়েলস-এর ভরা একটা বোতল।

আবারও কণ্ট্রোল রুমে ফিরল ম্যাক্স, থরথর কাঁপছে শীতে।

ঘরের আরেক মাথায় ফ্রেমে ঝুলছে তার বাবার ছবি।

ওই ফ্রেম উপরে তুলল সে, ওদিকে ছোট দেয়াল-সিন্দুক। কমবিনেশন মেলাল। খট্ করে খুলে গেল ডালা। সিন্দুক থেকে নিল .৪৪ ম্যাগনাম রিভলভার।

আবারও পাইলট হাউসে ফিরে এল ম্যাক্স।

অস্ত্রটা দেখে হাসল বাড লিটলটন। 'আরে, তুমি দেখছি ডার্টি হ্যারি হয়ে উঠেছ! ওই জিনিস দিয়ে মেগালোডনকে খতম করতে পারবে?'

বাডের মাথায় রিভলভার তাক করল ম্যাক্স। 'না, পাইলট শালার শালা, তবে তোকে খুন করতে পারব অনায়াসে।'

ব্যাটারিহীন অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান নাক তাক করে আছে সাগরের মেঝের দিকে। দরদর করে ঘামছে রানা, ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে ওর জন্য শ্বাস নেয়া। ভয়ে একবারও দেখেনি ডেপথ গজ। ফুরিয়ে আসছে অক্সিজেন। সংযোগ খুলে যাওয়া ইলেক-ট্রিকাল কেবল লাগিয়ে নিয়েছে। হাতের সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে জং ধরা নাট ভাল মত টাইট দিতে চাইল। কিন্তু এক পাকের বেশি ঘুরল না নাট।

'আর সম্ভব না,' বিড়বিড় করল রানা। মুচড়ে রাখা কোমর সিধে করে নিল। শুয়ে পড়ল পাইলটের পজিশনে। ওর মনে হলো সমস্ত রক্ত চলে এসেছে মাথার ভিতর। 'এবার দেখা যাক ব্যাটারি কাজ করে কি না!'

নিঃশব্দে প্রাণ ফিরে পেল অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান, রানার মুখে লাগল ভেন্টিলেশন সিস্টেমের শীতল হাওয়া। জয়স্টিক ঠেলে দিল, সিধে করে নিল সাব। উঠছে সাগর-সমতল লক্ষ্য করে।

পরের সেকেণ্ডে চমকে গেল।

উঠে এসেছে সাগরের উপরে। তার মানে মাত্র কয়েক ফুট নীচেই ছিল অ্যাবিস।

নিতু এখন আর নেই। ডানে লাভ অ্যাট সি ইয়ট, এখনও ভাসছে, তবে ক্ষত-বিক্ষত। বোট-ট্রলার ইত্যাদির আর্মাডা দূরে।

মৌঁসিউ দো টুহোনো ও কয়েক শ' লোক অগভীর সাগরে বোট বা ট্রলার থেকে দেখছে, টয়োডা মেমোরিয়াল লেগুনের পাশে মন্টেরেই বে ক্যানিয়নে হঠাৎ হঠাৎ লাফিয়ে উঠছে কারকারোডন মেগালোডন। বিধ্বস্ত সব বোটকে চক্কর কাটছে ওটা।

হতভাগ্য অনেকে এসেছিল অজ্ঞান মেগালোডনকে দেখতে, পরে আর ফিরতে পারেনি তীরে।

যারা এখন আধমাইল দূর থেকে ওই দানবকে দেখে চমকে যাচ্ছে, কপাল নিয়ে এসেছে তারা। ছবি তুলছে বহু দূর থেকে।

একটু আগেও কেউ ভাবেনি এমনটা হতে পারে। কে জানত ব্যাপারটা মজার বিষয় নয়: খোলা সাগরে কাউকে পেলেই খেয়ে ফেলছে কারকারোডন মেগালোডন!

এরই ভিতর সবাই বুঝেছে, পানিতে থাকা মানেই ওই রাক্ষুসীর পেটে যাওয়া!

বোটের মালিকরা ভুলে গেছে কোন্ জেটি থেকে এসেছিল, বাঁক নিয়ে রওনা হয়ে গেছে তীর লক্ষ্য করে। কারও মনে সামান্যতম দ্বিধা নেই। সাগরের অগভীর পানিতেও থাকতে চাইছে না তারা, সাঁই-সাঁই করে বোট চালিয়ে উঠে পড়ছে পাথুরে সৈকতে।

মাত্র তিন মিনিটের ভিতর টুহোনোর ট্রলার ছাড়া আশপাশের পানিতে একটা বোটও থাকল না।

বসের দিকে এল একুস্তে। 'ক্যাপ্টেন রাজি হয়েছে এই অগভীর পানিতে থাকতে।'

বিনকিউলার দিয়ে চারপাশ দেখে নিল টুহোনো। 'তার মানে অন্যদের মত সৈকতে গিয়ে উঠবে না?'

হাসল অ্যাসিস্ট্যান্ট। 'বলেছে, ক'দিন আগে রং করিয়েছে, এখন খোলে দাগ ফেলতে চায় না।'

টুহোনো দেখল নিতুর দুই লাইফবোট আসছে। স্যাঙাতের

দিকে চাইল, 'সবকটা মরবে।'

'ক্যাপ্টেন বলেছে কোস্ট গার্ড রওনা হয়েছে।'

তখনই হঠাৎ কেঁপে উঠল ট্রলার, চালু হয়ে গেল ইঞ্জিন ফাট্-ফাট্ আওয়াজ তুলে।

'জলদি থামাও ক্যাপ্টেনকে,' বলল টুহোনো, 'ইঞ্জিন বন্ধ না করলে ওই মেগা হাঙর চিবিয়ে খাবে আমাদেরকে।'

সাগর-সমতল থেকে বিশফুট নীচে ত্রিশ নট গতি তুলে ছুটছে রানার অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডে ম্যাসাকার হওয়া এলাকায় পৌঁছে গেছে।

ধীরে ধীরে অতল সাগরের মেঝেতে নেমে চলেছে ছোট তিনটে স্পিডবোট। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ফাইবারগ্লাসের খোল। একবার ওখানে চক্কর কাটল রানা, বুঝে গেল এদিকে কেউ নেই। মানুষ যারা পেরেছে পালিয়েছে, বাকিদের ধরে খেয়ে ফেলেছে মেগালোডন। আবারও সারফেসের দিকে ফিরল রানা। উপরে কী দেখবে ভাবতে ভয়ই লাগছে ওর।

বিশ-পঁচিশটা নৌযানের ফ্লোটিলা ছিল ওখানে।

এখন আছে শুধু ফাটা ফাইবারগ্লাস, বিধ্বস্ত কেবিন, কাঠের ডেক ও ভাঙা খোল।

সাতটা মাছ-ধরা বোট আস্ত দেখল রানা।

ডেকে বসে থরথর করে কাঁপছে যাত্রীরা।

মাথার উপর হাজির হয়েছে কোস্ট গার্ডদের রেসকিউ কপ্টার। একে একে তুলে নেবে সবাইকে।

আপাতত ক্রন্দনরত এক অর্ধোন্মাদিনী মহিলাকে তুলে নিচ্ছে হার্নেসে করে।

বোটের অন্যরা ধাক্কাধাক্কি করছে পরেরবার প্রথম সুযোগ পাওয়ার জন্য।

কারকারোডন মেগালোডন এখন কোথায়, ভাবল রানা।

আবারও নেমে গেল সাগরের তিরিশ ফুট গভীরতায়।

আবর্জনা বা জঞ্জালে ভরা চারপাশ, দৃষ্টি অস্পষ্ট।

রানা টের পেল, ধক-ধক করছে ওর হৃৎপিণ্ড। আবারও চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে। আর তখনই দেখল ওই লেজ।

তীব্র গতি তুলে ওর কাছ থেকে সরে যাচ্ছে মেগা।

এক সেকেণ্ডে ধূসর হালকা কুয়াশায় হারিয়ে গেল।

দেরি না করে সাগর-সমতলে উঠে এল রানা, দূরে দেখল ঢেউয়ের ভিতর উঠছে-নামছে উঁচু, ধূসর ডরসাল ফিন।

তীরের দিকে চলেছে মেগালোডন!

ত্রিশ

মাত্র আধমাইল দূরে তীর, ছুটে চলেছে নিতুর দুই লাইফবোট, এমনসময় প্রথমবারের মত দেখা গেল ছয় ফুটি ডরসাল ফিন। ওটা হাজির হয়েছে দ্বিতীয় লাইফবোটের পিছনে।

তারপর হঠাৎ করেই হারিয়ে গেল পানির নীচে।

উঠে দাঁড়িয়ে পিছনের লাইফবোটে চোখ রাখল ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন, লোকগুলোকে হাতের ইশারা করে জানাল দক্ষিণ দিকে যেতে। সোনারম্যান পলের কাঁধে টোকা দিল। বোটের হুইলে সে, চলেছে উত্তরদিকে। বুঝে গেল, দুই লাইফবোটের আরোহীদেরকে আলাদা হয়ে অন্যদিকে যেতে হবে।

দুই বোটের কেউ জানে না, সাগরের আশি ফুট তলে মাথা

নাড়ল মেগালোডন, খুবই দ্বিধান্বিত। এইমাত্র তার চেতনা বলেছে, কাছেই আছে শিকার। কিন্তু পরক্ষণে ওই একই চেতনা বলেছে: ওখানে আছে দুটো শিকার।

কাজেই বিরক্ত হয়ে হামলা করবার সিদ্ধান্ত নিল।

নীচ থেকে সাদা কী যেন উঠে আসছে, দেখতে পেল মানামি ও নাসিম আহমেদ। তখনই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল সব। বিস্ফোরণ হলো। ঝলসে উঠল উজ্জ্বল নীল আকাশ, পরক্ষণে উপর থেকে সাগরে ঝরঝর করে পড়তে লাগল একের পর এক দেহ। ঝপাস্ ঝপাস্ করে নামছে বরফের মত ঠাণ্ডা পানিতে। থেমে গেছে উল্টে যাওয়া বোটের ইঞ্জিন।

কয়েক সেকেণ্ড পর ভেসে উঠল বারোটা মাথা, কাশতে শুরু করেছে বেদম। উল্টে যাওয়া বোট ধরে ভাসবার জন্য পাশে চলে গেল ওরা। সূর্যের আলোয় চকচক করছে কাঠের খোল। প্রাণের ভয়ে চারপাশে চাইল সবাই, আঁকড়ে ধরেছে বোট।

মাত্র বারো ফুট দূরে চক্কর কাটছে উঁচু সাদা ডরসাল ফিন। ওটার মালিক বুঝে নিচ্ছে এবারের খাবারটা কেমন হবে। পানি-সমতলে অলস ভঙ্গিতে ঘুরছে বেয়াল্লিশ হাজার পাউণ্ড ওজনের মেগালোডন, ওটার বিপুল আকারের কারণে তৈরি হচ্ছে স্রোত। ফলে ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করেছে উল্টানো লাইফবোট, সেই সঙ্গে মানুষগুলো।

মাথা কাত করে ভেসে উঠল মেগা, মুখ সামান্য খুলতেই হুড়হুড় করে ভিতরে ঢুকল পানি।

নীরবে দেখছে সবাই।

রাক্ষুসীর দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না কেউ।

ওটার তৈরি স্রোতের ভিতর ঘুরছে ওরা।

ভীষণ পিছলা লাইফবোটের খোল থেকে ফস্কে গেল এক

খালাসির হাত। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। মেগালোডনের তৈরি স্রোতের টান খেয়ে পিছাতে শুরু করেছে। প্রাণপণে সাঁতার কাটছে বেচারা, চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে, কিন্তু এগুতে পারছে না সামনে। একবার রাক্ষুসীর খোলা মুখের দিকে চেয়ে বুঝে নিল কী ঘটবে।

থেমে গেছে কারকারোডন মেগালোডন, এদিক ওদিক নেড়ে পানি থেকে উপরে তুলল মাথা। যেন সুযোগ দিচ্ছে শিকারকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য।

খালাসি টের পেল, নীচের স্রোত আগের চেয়ে কম। প্রাণপণে সাঁতরাতে চাইল সে।

কিন্তু এক সেকেণ্ড পর অন্যদের চিৎকার শুনল।

ঘুরে চাইল লোকটা।

ত্রিকোণ স্নাউট বুজে দিল সূর্যের সব আলো।

একবার মাত্র ফিসফিস করে প্রার্থনা করতে পারল মানুষটা, পরক্ষণে এক গ্রাসে তার পুরো দেহ গিলে নিল মেগা।

বাকি এগারোজন যেন ডুবন্ত ইঁদুর, খামচা-খামচি করে উঠতে চাইছে উল্টে যাওয়া বোটে।

আউটবোর্ড ইঞ্জিনে উঠল ডন রে, নিজেকে তুলে নিয়েছে অন্যদের চেয়ে উপরে। কাঠের খোল ধরে উঠতে গিয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিডের দু'হাতের নখগুলো। বুঝে গেল, এভাবে টিকবে না।

শিকারি হাঙর ধীরে ধীরে চক্কর কাটছে। নতুন করে আগের চেয়ে জোরালো স্রোত তৈরি করল।

এবার আর প্রতিরোধ করতে চাইল না চিফ ইঞ্জিনিয়ার। একবার ভাবল স্ত্রীর কথা— পার্কিং লটে ওর জন্য অপেক্ষা করবে ক্যারি। কথা দিয়েছিল ও, এটা হবে ওর শেষ অভিযান। বিশ্বাস করেনি বউ।

মানামিকে দেখতে পেল সে।

চিৎকার করছে মেয়েটা।

'হ্যারল্ড! সাঁতার কাটুন!' বোট থেকে সরে এসেছে দুঃসাহসী মেয়েটা, জোরালো স্ট্রোকে রওনা হয়েছে। পিছন থেকে ধরে ফেলল হতাশ ইঞ্জিনিয়ারের হাত, ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

'না, মানামি, ছেড়ে দাও! ফিরে যাও বোটে...'

'পাগলামি করবেন না!'

'মানামি... হায় ঈশ্বর... বড় দেরি...'

দু'জনের দিকেই রওনা হয়েছে মেগালোডন, পানিতে ভাসা তক্তার মত অলস ভঙ্গিতে আসছে। কাত করে রেখেছে মুখ। ওদিক দিয়ে ঝর্নার মত পানি ঢুকছে।

পুরু স্নাউটের উপর মনোযোগ রেখেছে মানামি, ওখানেই আছে কালো অ্যামপুলি অভ লোরেনযিনি।

হঠাৎ করেই মুখ বিস্তৃত করল ওটা, দেখা গেল চকচকে সাদা দাঁতগুলো। কয়েকটা দাঁতে আটকে আছে মানুষের মাংস।

আরও হাঁ করল মেগা, আর তখনই প্রাণপণে সাঁতার শুরু করল মানামি ও হ্যারল্ড ডেভিড। কারও ইচ্ছে নেই নাস্তা হওয়ার।

লালচে মাড়ি দেখাল ওটা, পুরো বেরিয়ে এসেছে দাঁতগুলো।

সাঁতারের ফাঁকে পিছনে চাইল মানামি।

মস্ত ভুল করেছে।

মনোযোগ হারিয়ে ফেলেছে সাঁতার কাটবার।

অবশ হয়ে আসতে চাইল ওর দেহ।

কানেও শুনতে পেল না পরিচিত ঝিরঝির আওয়াজ।

সাগর থেকে ছিটকে উঠেছে সাড়ে ছয় শ' পাউণ্ড ওজনের সাবমারসিবল এবং তার সুঠামদেহী পাইলট।

সরাসরি মেগালোডনের খোলা চোয়ালে গুঁতো দিল রানা।

পানির ভিতর ঝটকা খেয়ে উপরে উঠল দানবীর মাথা, গলে পড়ল বাম চোখ, কোটর থেকে ছিটকে বেরুল রক্ত।

আবারও সাগরে নেমে গেছে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান, ঘুরেই সরে গেল মেগার পিছনে।

'আয়,' চেঁচাল রানা। 'আয়, ধর্ আমাকে!'

ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত ঘুরল উন্মত্ত মেগালোডন, ঢেউয়ের নীচে ডুব দিয়েই ধাওয়া শুরু করল রানাকে।

সাব নিয়ে ঘুরে গেছে রানা, পরক্ষণে দেখল সামনে হাজির হয়েছে গ্যারাজের দরজার মত মস্ত মুখ। তীরের মত বামে সরতে শুরু করেছে রানা, বেরিয়ে যেতে চাইল খোলা মুখের পাশ দিয়ে।

তখনই খপ্ করে মুখ বন্ধ করল মেগা।

কিন্তু ভিতরে থাকল শুধু সাগরের নোনা পানি।

ভীষণ রেগে গেল ওটা, ঝট্ করে ঘুরেই টার্গেট লক্ষ্য করে রওনা হলো ষাট-ফুটি টর্পেডোর মত।

নিজের স্পিড দেখে নিল রানা— চৌত্রিশ নট। সর্বোচ্চ গতি, কিন্তু তবুও এগিয়ে আসছে মেগালোডন।

এবার কোথায় যাওয়া যেতে পারে?

দানবীকে সরিয়ে নিতে হবে মানামি এবং অন্যদের কাছ থেকে।

সাবের টেইল ফিনে জোরালো গুঁতোর আওয়াজ পেল রানা।

পৌঁছে গেছে মেগালোডন।

হঠাৎ করেই ডানদিকে বাঁক নিল রানা, পরক্ষণে উপরে চলল অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান নিয়ে।

বাতাস কেটে উড়ুক্কু মাছের মত ভেসে উঠেছে ছোট্ট জলযান।

পিছনে লেগে আছে মস্ত মেগালোডন, উঠে এসেছে সেটাও, বাতাসে খপ করে বন্ধ করেছে মুখ, পানি থেকে উঠে এসেছে

কোমর পর্যন্ত।

দূরের ঢেউয়ে নামবার সময় ঝপাস করে নামল রানার সাবমারসিবল।

পিছনে প্রায় উড়ে এল মেগাও, বড় একটা হাম্পব্যাক তিমির চেয়েও অনেক জোরালো আওয়াজ তুলে নামল সাগরে।

জয়স্টিক দাবিয়ে দিয়েছে রানা, এবার নীচে ডাইভ দেবে...

কিন্তু কিছুই ঘটল না!

উড়ে নামবার সময় আবারও খুলে গেছে ব্যাটারির কেবল!

ক্যাপসুলের ভিতর কোমর ঘুরিয়ে পিছনে চাইল রানা। হাত গিয়ে পড়ল ওই কানেকশনের উপর। আবারও গুঁজে দিল তার।

চালু হয়ে গেছে ইঞ্জিন।

বাড়তি সময় নেই, জানে রানা। সামনে বাম পা ছুঁড়ল, বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল থ্রটল।

তখনই লাফ দিয়ে ছিটকে সামনে বাড়ল সাবমারসিবল।

এক সেকেণ্ড আগে যেখানে ছিল, সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ল নয় ফুটি মস্ত মুখ।

সংকীর্ণ ক্যাপসুলে আবারও কোমর সোজা করে নিল রানা, ভাবল, ব্যাটারির কানেকশন ঠিক থাকলে বাঁচতেও পারি!

ঘাড়ের কাছে চলে এসেছে মেগালোডন।

ওটার মুখ সাবমারসিবলের খুব কাছে।

সাঁই করে বামে ঘুরল রানা, ডানদিকে দেখল ত্রিকোণ মাথা।

কণ্ট্রোল প্যানেলে টিপ্ টিপ্ করে জ্বলতে শুরু করেছে লাল একটা বাতি।

ফুরিয়ে আসছে ব্যাটারির পাওয়ার!

তীক্ষ্ণ বাঁক নিল রানা, কোথাও দেখল না মেগালোডনকে। গতি কমিয়ে আনল, দূরে শুনল টুইন ইঞ্জিনের ভারী আওয়াজ।

পরামর্শ শুনে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছিল ট্রলারের ক্যাপ্টেন। এবার দশমিনিট সম্পূর্ণ উল্টো কথা বোঝাবার পর সে নিশ্চিত হয়েছে, ট্রলারের সামান্যতম ক্ষতি হলেও সমস্ত ক্ষতিপূরণ দেবে এই ফরাসি মোঁসিউ দো টুহোনোর সংগঠন।

এরপর রওনা হয়েছে সে, এখন রেসের বোটের মত ছুটে পৌঁছে গেছে লাইফবোটের মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে।

টুহোনো সবার আগে ট্রলারে টেনে তুলল মানামিকে।

বেচারি দাঁড়িয়ে থাকতে চেয়েও ক্লান্তিতে ঢলে পড়ল ডেকে।

অতি উত্তেজনায় বমি করে ফেলল সাংবাদিক ডন রে।

হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা শুরু করেছে নিতুর বেশ ক'জন ক্রু, সেই সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিড।

কেউ ভাবতে পারেনি বাঁচবে।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন নাসিম আহমেদ। সাগরে চোখ। খুঁজছেন রানাকে।

কোথায় যেন হারিয়ে গেছে ভয়ঙ্কর কারকারোডন।

অবশ্য কয়েক সেকেণ্ড পর আবার দেখা গেল তাকে।

সাগরের পঁচিশ ফুট গভীর থেকে ছিটকে উঠেছে অতি প্রসারিত মুখ নিয়ে। খপ্ করে ধরল কাঠের লাইফবোট, শলার কাঠির মত মট করে ভেঙে ফেলল। ট্রলারের ডেকে বৃষ্টির মত ঝরল ভাঙা কাঠ। পরক্ষণে মেগালোডনের উপরের অংশ ঝপাস্ করে সাগরে নামতেই দশ ফুটি ঢেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রলারে।

কিছু করবার সুযোগই পেল না দো টুহোনো, ওই ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিল তাকে সাগরে।

চেঁচিয়ে উঠল মানামি, আর তখনই দেখল ঢেউয়ের ভিতর উঠে এসেছে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান।

ওটা আছে মাছ-ধরা ট্রলার থেকে মাত্র তিরিশ ফুট দূরে।

থেমে গেছে রানার সাবমারসিবল।

থেমে গেছে ইঞ্জিন।

মানামি জানে না, এ মুহূর্তে ব্যাটারি থেকে শেষ শক্তিটুকু নিংড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে রানা। যদিও বুঝে গেছে, আর লাভ নেই। ভোল্টমিটারের কাঁটা নেমে গেছে যিরোতে। পানিতে ডুবতে শুরু করেছে ভারী লেক্সান নোজ কোন। কর্কের মত ভাসছে বিকল সাবমারসিবল।

উল্টো অবস্থায় পাইলটের হার্নেসে শুয়ে আছে রানা। দেখছে শুধু ধূসর কুয়াশার মত সাগর। দপদপ করছে কপালের পাশের শিরা। বামে কীসের নড়াচড়া। অপেক্ষাকৃত ছোট কিছু, সাঁতরে চলেছে মাছ-ধরা ট্রলারের দিকে।

মেগালোডনটা কই, আনমনে ভাবল রানা। সাবমারসিবল থেকে বেরুতে হবে, গিয়ে উঠতে হবে ওই ট্রলারে।

রানা জানে না, নীচ থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে রাক্ষুসী, চেতনা তাকে বলছে, বারবার হুমকি দেয়া প্রাণীটা নিজেও আহত।

এক শ' ফুট দূরে থাকতেই গতি তুলতে লাগল মেগালোডন, মস্ত হাঁ করল, ঘ্রাণ পাওয়ার জন্য চওড়া হয়ে গেল নাকের পাটা।

সাদা ওই ভয়াবহ চেহারা আবারও দেখতে পেল রানা, পৈশাচিক মুখে হাসি-হাসি ভাব, ছুটে আসছে সাগরের আঁধার থেকে। এবার মৃত্যু, বুঝল রানা। এ-ও বুঝল, সামান্যতম ভয় নেই ওর মনে।

রানার মনে পড়ল জাপানি প্রবচন: যদি তুমি নিজেকে ও তোমার শত্রুকে ঠিক চেনো, তো এক শ'টা লড়াইকেও ভয় করার কিছু নেই।

'আমি চিনি আমার শত্রুকে,' মনে মনে বলল রানা।

ওটা সরাসরি পঞ্চাশ ফুট দূরে।

চওড়া করছে মুখ।

আর চল্লিশ ফুট...

তিরিশ...

ডানহাত সামনে বাড়িয়ে দিল রানা, খপ করে ধরল লিভার, ঘুরিয়ে দিতে শুরু করেছে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে।

বিশ...

আস্তে করে শ্বাস নিল রানা।

দশ....

উপরের চোয়াল সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে দানবী।

এক সেকেণ্ডের দশভাগের একভাগ সময়ে হঠাৎ কয়েকটা মুখ চোখের সামনে দেখতে পেল রানা। কন্ট্রর বুড়ো, সুলতা, সোহানা, রেবেকা, বন্ধু সোহেল, নতুন বন্ধু মানামি...

চিরতরে হারিয়ে গেল সবাই!

পরক্ষণে নিজের দিকে লিভার টেনে নিল রানা।

জ্বলে উঠল ফিউয়েল।

সামান্য সময়ের জন্য অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান হয়ে উঠল সত্যিকারের রকেট।

সরাসরি মেগালোডনের খোলা চোয়ালে ঢুকল ওটা।

বিদ্যুদ্বেগে রওনা হয়ে গেল গলার ভিতর দিয়ে।

কালো এক গহ্বর দেখল রানা।

অন্ধকার গর্তের ঠিক মাঝখানে রাখতে চাইল সাবমারসিবল।

গলায় ঢুকে যাচ্ছে ও।

এরপর নামল ঘুটঘুটে আঁধার।

গর্জন ছাড়তে ছাড়তে পিছলে চলেছে অ্যাবিস গ্লাইডার, পরক্ষণে নেমে গেল গলার সরু কানাগলি দিয়ে।

অ্যাবিস গ্লাইডারের মিডউইং চিরে দিল ওর গলার দু'পাশের দেয়াল।

ছিঁড়ে গেল কয়েক গজ নরম টিশ্যু।

হাইড্রোজেন কমবাশন-এর ফলে টর্পেডোর মত এগিয়ে চলেছে সাবমারসিবল। চলে এসেছে ওটার ইসোফেগাসে।

রানার মনে হলো, এত গতির কারণে বিধ্বস্ত হবে যন্ত্রটা।

দেরি না করে লিভারটা আবারও তুলে দিল ও।

সঙ্গে সঙ্গে থামল বার্ন।

অ্যাবিস গ্লাইডার থেমেছে অন্ধকার একতাল মাংসের উপর।

বড় করে শ্বাস ফেলল রানা। বুঝতে পারছে, এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

শুধু তাই নয়, ঢুকে পড়েছে স্বয়ং নরকের গেট দিয়ে!

একত্রিশ

সুনীল প্রশান্ত মহাসাগরের বুক থেকে বিস্ফোরণের মত ছিটকে উঠে এল কারকারোডন মেগালোডন, পানি ছেড়ে ভেসে উঠল কাস্তের মত লেজ। মুহূর্তের জন্য মারলিন মাছের মত আকাশে ভেসে রইল বিশ টনি দানবী, তারপর আবারও ঝপাস্ করে নেমে গেল নিজ রাজ্যে। মস্ত হাঁ করল, টের পেল ভীষণ জ্বলছে বুকটা।

আগেই ফুরিয়ে গেছে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানের ব্যাটারি, কিন্তু লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমকে একঘণ্টা চালু রাখবে ছোট ব্যাকআপ জেনারেটর। ঝাঁকুনি থেমে যেতেই বাইরের বাতিগুলো জ্বেলে দিয়েছে রানা।

মেগালোডনের পেটে আটকা পড়েছে ওর সাবমারসিবল।

মস্ত হাঙরের পাকস্থলীতে উষ্ণ বাষ্প তৈরি করছে সাগরের পানি, ওই ভাপ লাগছে লেক্সান কাঁচে।

চারপাশে লালচে দেয়াল, নীচে ঘুরপাক খাচ্ছে বাদামি কী যেন।

বাইরের দিকের তাপমাত্রা দেখে নিল রানা: ঊননব্বই ডিগ্রি।

'অবিশ্বাস্য!' ফিসফিস করল। মনকে সামলে রেখেছে, ভয় পেতে দেবে না নিজেকে।

গ্লাস কোনে ধুপধাপ লাগছে নিহত তিমির ক্ষত-বিক্ষত মাংস।

কেমন বমি এল, তবুও চেয়ে রইল ওদিকে।

ডলফিনের আধ খাওয়া লাশ, রাবারের বুট ও কয়েকটা কাঠের টুকরো দেখল। একদিকে নড়ছে তিমির থকথকে অর্ধেক হজম হওয়া মাংস। আরেক দিকে অন্যকিছু।

মানুষের আস্ত পা, হাঁটু থেকে ছেঁড়া।

কালচে কাদার ভিতর আতঙ্ক তৈরি করা এক দৃশ্য দেখল রানা: ওটা এক লোকের ঊর্ধ্বাঙ্গ, ভয়ঙ্করভাবে চিবানো। কাঁধের উপর এখনও রয়ে গেছে অক্ষত মাথাটা।

চিনল রানা।

এ লোক অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন ফ্রেড স্কিলার, খুব জ্বালিয়েছে ডক্টর নাসিম আহমেদকে। জোর করে এক সপ্তাহে তৃতীয়বার সাগরে নামিয়ে সমস্ত দোষ চাপিয়েছিল তাঁরই ওপর।

বমি সামলে নিল রানা।

ঠিক তখন হঠাৎ করেই একপাশে কাত হলো সাবমারসিবল। দেখা গেল পাকস্থলীতে বড় গর্ত। ওদিক দিয়ে গলগল করে নেমে গেল নাসিম আহমেদের কমাণ্ডিং অফিসারের লাশ।

ভীষণ যন্ত্রণার কারণে সাগরের গভীর থেকে আবারও ছিটকে আকাশে উঠেছে কারকারোডন মেগালোডন!

থম মেরে ট্রলারের ডেকে বসে আছে মোঁসিউ দো টুহোনো, এখনও স্বাভাবিক হয়নি শ্বাস-প্রশ্বাস। বিস্ময় ও ভয় নিয়ে চেয়ে আছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণীর দিকে।

সাগর তোলপাড় করছে ওটা।

দাপিয়ে চলেছে, বারবার ঝাঁকি খাচ্ছে, ছিটকে উঠছে।

কোনও কারণে বোধহয় ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে ওটার।

টুহোনোর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে মানামি সিনোসুকা, থরথর করে কাঁপছে দুই পা। দুই চোখে অশ্রু। নিজের চোখে দেখেছে ফিউয়েল ইগনাইট করেছে রানা। রকেটের মত এগিয়ে গিয়ে নিজ মৃত্যু নিশ্চিত করেছে। আর তখনই প্রথমবার মানামি বুঝেছে, জীবনের সবচে' বড় ভুল করেছে ও, ভালবেসেছে ওই দুঃসাহসী বাঙালি যুবককে। আর কখনও স্বাভাবিক হবে না ওর জীবন।

মাছ-ধরা ট্রলারের মালিকের সঙ্গে তর্ক করছে ক্যাপ্টেন রিকি ব্র্যাডসেন, বারবার বলছে ইঞ্জিনের শব্দে হাজির হতে পারে ভয়ঙ্কর প্রাণীটা।

উল্টে ব্র্যাডসেন ও টুহোনোকে ধমকাতে শুরু করেছে বুড়ো লোকটা। অবশ্য কিছুক্ষণ পর রাজি হলো ইঞ্জিন বন্ধ করতে।

গভীরে ডাইভ দিয়েছে কারকারোডন মেগালোডন, রকেটের আগুনের পুড়ে যাচ্ছে তার দেহের ভিতরটা। পেট থেকে উগরে বের করতে চাইল গিলে ফেলা জিনিসটা। বেরুল গলার রক্তাক্ত কিছু ইসোফেগাল টিশ্যু এবং পাঁচ ফুটি অ্যালিউমিনিয়াম অক্সাইডের দুটো টুকরো। মুখ থেকে আরও বেরুল অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানের ভাঙা একটা ডানা। খপ্ করে ওগুলোকে ধরল শিকারি, নিজের টিশ্যুর সঙ্গে ধাতুটাও গিলে ফেলল আবার।

সাত কোটি বছরেরও বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা সহজাত প্রবৃত্তি উপেক্ষা করা অসম্ভব।

প্রাগৈতিহাসিক হাঙরের পেটে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানে মনোযোগ স্থির রাখতে চাইছে রানা। মনে পড়ছে নাসিম আহমেদের আঁকা শ্বেত-হাঙরের ইন্টারনাল অ্যানাটমির ডায়াগ্রাম।

মেগালোডনের গলার সরু কানাগলি পেরিয়ে এসেছে ওর সাবমারসিবল।

ও আছে এখন পাকস্থলীর উপরের অংশে।

এবার কী করতে পারি? —ভাবল রানা।

ভিতরে বসে কীভাবে খুন করব জানোয়ারটাকে?

শান্ত হয়ে এসেছে ওর শ্বাস-প্রশ্বাস।

সেক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডটা পাগলের মত এমন ধুপধাপ আওয়াজ করছে কেন?

দুই সেকেণ্ড পর রানা বুঝল, ওই আওয়াজ ওর নিজের নয়।

হাঙরের ডায়াগ্রাম আবারও ভেসে উঠল চোখের সামনে।

গলার কানাগলি, তারপর পাকস্থলী... ওখানেই তো হৃৎপিণ্ড!

সামনের দিকে মস্ত লিভার, কানকোর নীচের অংশে দুই প্রকোষ্ঠের হৃৎপিণ্ড।

ওটা আছে পাকস্থলীর নীচের অংশে!

দ্রুত ভাবছে রানা।

গুছিয়ে নিচ্ছে নিজের পরিকল্পনা।

এখনও হয়তো বাঁচবার উপায় আছে।

হয়তো রোদ-বৃষ্টি-আলো-হাওয়ার স্পর্শ পাবে, আবারও দেখতে পাবে প্রিয় মানুষগুলোর মুখ।

কাঁধের উপর ভর করে কাত হলো ও, খুঁজে নিল সিট কুশনের নীচের ছোট কমপার্টমেন্ট।

ওখানে থাকবে ইমার্জেন্সি মাস্ক, রেগুলেটর আর ছোট একটা অক্সিজেন ট্যাঙ্ক।

কমপার্টমেন্ট থেকে সবই বের করে নিল রানা, মুখে পরে নিল মুখোশ, নিশ্চিত হলো অক্সিজেন ঠিকভাবে আসছে। এবার হাতে তুলে নিতে চাইল আণ্ডারওয়াটার ছোরা।

কিন্তু ওটা তো নেই! আনেনি সাথে?

নেই কেন?

ছোরা ছাড়া কীভাবে মেগালোডনের পুরু পেশি কাটবে?

ক্যাপসুলের ভিতর ছোরা খুঁজতে লাগল রানা।

না, কোথাও নেই!

কিন্তু কী যেন বাধল হাতে।

একটা চামড়ার পাউচ।

দিয়েছিলেন নাসিম আহমেদ।

চামড়ার পাউচ থেকে ফসিলাইয্‌ড্ দাঁতটা বের করে ওয়েট সুটের বেল্টে গুঁজল ও। এবার বুকের ভেলক্রো স্ট্র্যাপে আটকে নিল অক্সিজেনের ছোট সিলিণ্ডার। হাতে ফ্ল্যাশলাইট।

হ্যাঁ, এবার ও তৈরি।

সাবমারসিবলের পিছনের এস্কেপ হ্যাচ খুলল, সঙ্গে সঙ্গে হিস্ আওয়াজ তুলল রাবারের হাউসিঙের গোলাকার দরজা।

গরম, থকথকে তরল ঢুকছে সাবমারসিবলের ভিতর।

ঘিনঘিন করে উঠল রানার গা।

রেগুলেটরের মাধ্যমে বাতাস নিচ্ছে, তাই রক্ষা।

হ্যাচ গলে মাথা বের করল, আলো ফেলল ঘুটঘুটে আঁধারে।

মস্ত হাঙরের পাকস্থলীতে মোচড় খাচ্ছে শক্তিশালী সব পেশি।

অ্যাসিডের গন্ধে মনে হচ্ছে পুড়ছে কিছু।

নীচ থেকে উঠছে ঘন বাষ্প।

রানার উপস্থিতির কারণে জোরালো আপত্তি তুলল পাকস্থলী।

গড়গড়া ও তীক্ষ্ণ শিসের পর নিচু গর্জনের আওয়াজ এল।

এসবের উপর দিয়ে শোনা গেল হৃৎপিণ্ডের ধুপ-ধাপ শব্দ।

সর্বক্ষণ সংকীর্ণ ও প্রশস্ত হওয়া শক্তিশালী পেশি ছাড়া কিছুই নয় পাকস্থলীর উপর ও নীচের অংশ।

ডান পা নামাল রানা, এতে কাত হলো সাবমারসিবল।

মাংসপেশির মেঝেতে পা পড়তেই যেন পুড়তে শুরু করেছে চামড়া।

হ্যাচ দিয়ে বাম পা বের করে আনল রানা।

তখনই পায়ের নীচে ফুলে উঠতে শুরু করল পেশি।

দুই শ' সত্তর ডিগ্রি কাত হয়ে গেল মেগার পেটটা।

সড়াৎ করে পিছলে গেল রানা, চিত হয়ে পড়ল ধড়াস্ করে। টের পেল, রাসায়নিক সব তরল গলিয়ে দিতে শুরু করেছে ওর ওয়েট সুট। চার হাত-পায়ে উঠে বসতে চাইল। নীচে এবড়ো-খেবড়ো সব পেশি।

জ্বলতে শুরু করেছে দুই হাত।

নীচের দিকের পরিবেশ অন্যরকম।

কুয়াশার মত ভাপ জমছে মুখোশে।

শ্বাস আটকে হাঁটুর বাটির উপর ভর করে উঠে বসল রানা।

মুখ থেকে সরিয়ে ফেলল মুখোশ।

কাঁচের উপর সামান্য থুতু ফেলে ডলে পরিষ্কার করে নিল।

অ্যাসিডের কারণে জ্বলছে দুই চোখ।

মুখে মুখোশ আটকে নিয়ে বড় করে দম নিল রেগুলেটরে।

আগের চেয়ে সুস্থ মনে হলো।

তবে কাশতে শুরু করেছে।

চিন্তায় পড়ে গেল, হাঙরের পেটের নীচের দিক কোনটা?

তখনই আলাদা একটা চাপ অনুভব করল।

খপ্ করে ধরে ফেলল অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানের টেইল ফিন, নইলে আবারও ছিটকে পড়ত পিছনে।

আরেকটু হলে পিছলে ওর উপর নেমে আসত সাবমারসিবল।

চট্ করে সরে গেল রানা, তখনই কী যেন নড়ল।

ওদিকে আলো ফেলতেই দেখল চকচকে দুটো জিনিস।

ওগুলো অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানের ভাঙা ডানা, হজমকারী পেশিগুলোর মোচড়ের কারণে আরও ভিতরের দিকে চলে গেল।

আবারও মেগালোডন সিধে হতেই হিসাব কষল রানা।

পেশির দেয়ালে কান পাতল।

ওদিকের ধুপ-ধাপ আওয়াজ আরও পরিষ্কার শোনা গেল।

ভারী সাবমারসিবলের পাশে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা, শক্ত হাতে ছোরার মত করে ধরল প্রাগৈতিহাসিক মেগালোডনের দাঁত।

তীক্ষ্ণধার দিক বসিয়ে দিল পাকস্থলীর লাইনিঙে। কাটতে শুরু করেছে শক্ত পেশি।

পুরু মাংসের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসতে চাইল দাঁত। ফস্কে যেতে চাইল হাত থেকে।

আবারও লাইনিং দেখে নিল রানা, আবারও চালাল দাঁত।

নিজেকে শান্ত রাখতে চাইল।

মনে মনে বলল, আমি বেরিয়ে যাব এখান থেকে।

মরব না এখানে।

কিছুতেই না!

হাঁটু গেড়ে বসেছে, দুই হাতে শক্ত করে ধরেছে আদিম হাঙরের ভয়ঙ্কর অস্ত্র। পেশি কাটার সময় ব্যবহার করছে নিজের ওজন। প্রতিবার একটু একটু করে গভীর হচ্ছে মাংসপেশির গর্ত। চওড়া হয়ে উঠছে ফাটল ধরা টিশ্যু। তবে কাজ হচ্ছে বড্ড ধীরে। মাখনের ছুরি দিয়ে যেন কাটছে কাঁচা মাংস। চার ফুট দৈর্ঘ্যের পুরু চাপড়া মাংস কাটতে হবে।

এক জায়গায় গর্ত তৈরি হতেই আবারও ওখানে নামিয়ে আনছে দাঁত। ওর মনে হচ্ছে, দেখতে না দেখতে আবারও সুস্থ

হয়ে উঠছে ওদিকের পেশি।

মেগালোডন্ জানবেও না পাকস্থলী কাটছি, ভাবল রানা।

কিন্তু আসলে আপার ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট কাটা পড়ছে বলে বারবার খাবি খেতে শুরু করেছে ওটা।

খুব অস্থির হয়ে উঠেছে মেগা, বারবার সাগর-সমতলে উঠছে শত্রুর উপর হামলা করতে।

বামহাতে টগল সুইচ অন করে দিল ম্যাক্স ডোনোভান, চালু করে দিয়েছে লাভ অ্যাট সি'র পাম্প। কক করা ম্যাগনাম ডানহাতে তাক করেছে বাড লিটলটনের মাথায়।

'আবারও পাম্প চালু করলে?' বলল দক্ষ পাইলট, 'তুমি কিন্তু ডেকে আনছ মেগালোডনকে।'

'আসলে তা-ই চাই,' গুঁতো দিয়ে লিটলটনের মুখের ভিতর রিভলভারের মাযল পুরে দিল ম্যাক্স। বামহাতে আঁকড়ে ধরেছে ওর গলা।

ওই অবস্থায় বাডকে ইয়টের ডেকে তুলল সে।

সোনালী রোদ চারপাশে।

'ওই শয়তান হাঙর আমার সর্বনাশ করেছে! আর ওই হারামজাদী অ্যানি ল্যামবার্টও! ওই দুটো মিলে পাগল করে দিচ্ছে আমাকে! আর ঘুমাতে পারি না! বাঁচতে দিতে চায় না ওরা! আর তুই শালা...' বাড লিটলটনের মুখে আরও ঠেসে দিল ম্যাগনাম। 'তুই শালা এসেছিস হিরো হতে?'

পিছিয়ে গেল ম্যাক্স, ইশারা করল বাড লিটলটনকে। 'সোজা রেলিঙের দিকে যা!'

'কী বললে?' যেন কালা হয়ে গেছে বাড, কান পেতে আছে। যে-কোনও সময়ে হাজির হবে কোস্ট গার্ডদের কপ্টার।

ম্যাগনাম গর্জে উঠল।

ডেকে তৈরি হলো তিন ইঞ্চি বৃত্তাকার গর্ত।

'তুই শালা ওই বেশ্যা হারামি হাঙরকে বাঁচাতে চেয়েছিলি, এবার নিজেকে দিয়ে পেট ভরা শালীর!' আবারও গুলি করল ডোনোভান, এবার ফুটো করে দিয়েছে বাডের ডান পায়ের কাফ মাসল।

ডান পা অকেজো হতেই বসে পড়ল পাইলট। ক্ষত থেকে ঝরঝর করে পড়ছে রক্ত।

'পরেরবার পেটে গুলি করব, কাজেই দেরি না করে লাফ দে!'

একপায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলে গেল বাড রেলিঙের পাশে, ওটা টপকে সাগরে নেমে যাওয়ার আগে বলল, 'তুমি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছ!'

পাইলটকে সাঁতরে ইয়ট থেকে দূরে সরতে দেখল ম্যাক্স। চিৎকার করে বলল, 'নরকে দেখা হবে তোর সঙ্গে!'

যেন ভীষণ আগুন ধরেছে ওর পেটে ও বুকের পাখনায়। কেমন যেন করছে পেশিগুলো। নাড়িভুঁড়ি উল্টে আসতে চাইছে।

তা হলে কি খিদে লেগেছে?

তবে তো কিছু খেতে হয়!

খিদের আগুন?

লাভ অ্যাট সি থেকে স্থির কম্পনের আওয়াজ শুনছে মেগালোডন।

ওখানে শিকারের তাজা রক্ত মিশেছে সাগরে।

ওই নেশার মত ঘ্রাণ পাগল করে দিচ্ছে।

ইয়টের দিকে তেড়ে গেল ওটা। ভয়ঙ্কর এক গুঁতো দিল স্নাউট দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে লাভ অ্যাট সি'র স্টার্নে তৈরি হলো চোদ্দ ফুটি ফাটল। পরের সেকেণ্ডে ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল জলযান। পানি উঠছে হুড়হুড় করে।

বো-র কাছে লাউঞ্জ চেয়ারে শুয়ে আছে ম্যাক্স ডোনোভান, এরই ভিতর খালি করে ফেলেছে ডেনিয়েলস-এর দামি বোতল।

মাথা ব্যথা করছে ভীষণ।

বনবন করে ঘুরছে সবই।

'ভাল নেশা হয়েছে!' যুক্তি দিয়ে বুঝতে চাইল।

আবারও মাথা রাখল বামহাতের উপর।

ইয়টে পরের গুঁতো লাগতেই সচেতন হলো।

'আরে, শিট!' খপ্ করে ম্যাগনাম তুলে নিল হাতে, টলতে টলতে উঠে বসল।

খুব দ্রুত স্টার্নকে তলিয়ে দিচ্ছে বন্যা।

আগের চেয়ে জোরে ঘুরছে লাভ অ্যাট সি ইয়ট।

রেলিঙের উপর টলে পড়ল ম্যাক্স। তখনই দেখল ডরসাল ফিন। গুলি করল ওটা লক্ষ্য করে।

অন্তত দশ ফুট দূর দিয়ে গেল বুলেট।

'শালী হাঙর! তুই আমাকে ধরতে পারবি না! কক্ষনোও না!'

মোঁসিউ দো টুহোনোর কাছ থেকে নেয়া বিনকিউলারে চেয়ে আছেন ডক্টর নাসিম আহমেদ।

বিধ্বস্ত ইয়টের কাছেই ঘুরছে সাদা ডরসাল ফিন।

'একবার কি ঝুঁকি নেবেন, ক্যাপ্টেন?' বললেন নাসিম।

'না, সম্ভব নয়,' বলে দিল ট্রলারের মালিক। চালু করে ফেলল টুইন ইঞ্জিন। পরক্ষণে নীল ধোঁয়া ছেড়ে তীর লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল ট্রলার।

আধমাইল দূরে ঝট্ করে মাথা ঘোরাল মেগালোডন, খেপে উঠল মুহূর্তে, বুঝে গেল তেড়ে গিয়ে শত্রুকে খতম করতে হবে!

চোখ বুজে ফেলেছে ম্যাক্স ডোনোভান, এ-মুহূর্তে অনেক বেশি

ঘুরছে দুনিয়া। টের পেল, উপরে উঠছে সামনের ডেক। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। নেশার ভিতর বুঝতে চাইল পরিস্থিতি। ওর ইয়ট যেন দারুণ চরকি। পড়েছে সাগরের মস্ত কোনও ঘূর্ণিপাকে।

এবার চোখ মেলে সত্যিই দানবীকে দেখতে পেল ম্যাক্স।

ত্রিকোণ সাদা মাথা উপরে উঠছে!

মনে হচ্ছে, মস্ত হাঁ করেছে ওকে খেয়ে ফেলবার জন্য!

'মর তুই হারামজাদী, শালী!' হতাশ হয়ে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাক্স। পরক্ষণে মুখে পুরে দিল ম্যাগনামের নল, টিপে দিল ট্রিগার।

করোটি ফাটিয়ে ছিটকে বেরুল মগজ ও বুলেট।

লাভ অ্যাট সি'র স্টার্ন সাগরে ডুবে যেতেই তখনও ত্রিকোণ সাদা বো আকাশে উঠতে লাগল!

সাগরের এদিক থেকে আগেই সরে গেছে মেগালোডন।

বত্রিশ

হতক্লান্ত হয়ে উঠেছে মাসুদ রানা।

মেগালোডনের পেটে গুঁতোগুঁতি করছে পচা-গলা তিমির মাংস ও অন্যান্য আবর্জনা। বারবার চেপে আসতে চাইছে ওর উপর। ভুলেও ওদিকে চাইছে না। বলা যায় না আবারও কী দেখবে! বমি আসছে ওর কল্পনায় দুর্গন্ধের তীব্রতা আন্দাজ করে।

শেষপর্যন্ত ছয় ইঞ্চি পুরু পোক্ত পেশিকে ছিঁড়ে ফেলল প্রাচীন দাঁত।

ওই পুরু পর্দা বা দেয়াল ফাঁক করে মাথাটা ওপাশে নিল রানা, তারপর দুই কাঁধ। পরক্ষণে মেগালোডনের পেটের কুঠুরি থেকে ঢুকে পড়ল নতুন এক রাজ্যে।

একেবারেই আলাদা এদিকের পরিবেশ।

কার্ডিয়াক চেম্বার খুবই সংকীর্ণ, মাত্র এক ফুট জায়গা পেল রানা। সরু গলির ভিতর লালচে মাংস। এ প্রকোষ্ঠে নিজেকে ঠেসে ভরল ও। এখন পিঠেও চাপ দিচ্ছে ওটার শক্তিশালী পেশি।

ক্রল করে সামনে বাড়ল।

ডানহাতে জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইট। অন্যহাতে প্রাচীন সেই দাঁত।

ভারী ড্রামের মত ধুপ-ধাপ লক্ষ্য করে এগুতে শুরু করেছে ও।

সরু প্রকোষ্ঠ চওড়া হচ্ছে।

বাড়ছে হৃৎস্পন্দনের আওয়াজও।

কাঁপছে চারপাশের মাংসের দেয়াল।

আরও কিছুটা যাওয়ার পর উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, একবার ছোট হচ্ছে আবার কিছুটা বড় হচ্ছে পাঁচ ফুট ব্যাসের গোলাকার মাংসপেশি।

পুরু সব রক্তবাহী নালী থেকে ঝুলছে গোটা হৃৎপিণ্ড।

সৈকতের এক শ' গজ দূরে পৌঁছে গেছে মাছ-ধরা ট্রলার, এমনসময় বিশফুট পিছনে ভেসে উঠল মেগালোডন।

ওটার দিকে চুপ করে চেয়ে রইল ট্রলারের আরোহীরা।

সবাই ভাবছে, এবার কী ঘটবে।

আবার যদি হামলা করে, বাঁচবে না একজনও।

পরক্ষণে দেখা গেল ইঞ্জিনের স্পন্দনের উৎসে পৌঁছে গেছে ওটা। ভয়ঙ্কর এক গুঁতো দিল স্নাউট দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হলো দুই ইঞ্জিন। থেমে গেল ঘুরন্ত প্রপেলারগুলো।

স্রোতে ধীরে ধীরে আরেক দিকে ভেসে চলেছে ট্রলার।

মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে তীর।

'হারামজাদী শেষ করে দিয়েছে আমার ইঞ্জিন!' চেঁচিয়ে উঠল ট্রলারের মালিক। অভিযোগের দৃষ্টিতে চাইল টুহোনোর দিকে। 'সব দোষ আপনার! সব খরচ আপনাকেই দিতে হবে!'

আবারও ভেসে উঠেছে মেগালোডন, চক্কর কাটতে শুরু করেছে মাত্র বিশ ফুট দূরে। চলে এল ট্রলারের পোর্ট সাইডে, আস্তে করে স্নাউট ঠেকাল খোলে।

কয়েক সেকেণ্ড পর সাগর-সমতল থেকে তিরিশ ডিগ্রি উপরে উঠল ট্রলারের ওদিকটা। মেঝে কাত হতেই পানির দিকে পিছলে চলে গেল হ্যারল্ড ডেভিড, নাসিম আহমেদ, মানামি ও আরও তিন নাবিক।

ধরার মত কিছুই পায়নি ওরা।

ভয়ঙ্কর হাঙর আরও উঁচু করছে ট্রলারের বামদিকটা।

বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ, সাগর থেকে ওপরে উঠছে এত বড় নৌযান।

দুই নাবিক খপ্ করে ধরেছে ট্রলারের টিউনা জাল।

কিন্তু সাগরে পিছলে নেমে গেল নাসিম, ডন রে, মানামি ও তিন নাবিক।

ছলাৎ আওয়াজটা শুনেছে মেগালোডন।

দেহের পাশের অগভীর নালা আদিম হাঙরকে জানিয়ে দিয়েছে, সাগরে শুরু হয়েছে কম্পন। কী যেন নেমেছে পানিতে।

ট্রলার ঠেলা বন্ধ করল ওটা, সরে গেল।

চক্কর কাটতে শুরু করেছে।

চলে গেল মন্টেরেই-বে ক্যানিয়নের উপর।

গভীর পানিতে পৌঁছে শান্ত করতে চাইল বুক-পেটের জ্বলুনি।

তখনই স্থির করল, এবার হামলা করবে।

মেগালোডনের পুরু কার্ডিয়াক ধমনি দু'হাতে খামচে ধরেছে রানা।
ধুপধুপ করা প্রকাণ্ড হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে ওটার দেহে উষ্ণ তরল পাচার করছে অ্যাওর্টা।
আগের চেয়ে জোরে চলছে হৃৎপিণ্ড।
আওয়াজও বাড়ছে।
আর তখনই হঠাৎ করে ডাইভ শুরু করল দানবী।
সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা।

এতই ক্লান্ত, মানামি বুঝল সাঁতার কাটতে পারবে না।
অবশ্য লাইফ জ্যাকেটের কারণে এখনও ভাসছে।
পাশেই ডক্টর আহমেদ ও ডন রে, তারা ট্রলারের দিকে সরিয়ে নিতে চাইল মানামিকে।

সাগর এখানে পনেরো শ' ফুট গভীর।
মেঝের কাছে ভাসছে কারকারোডন মেগালোডন, বুঝে গেছে পালাতে চাইছে শিকার। বুক-পেটের জ্বলুনিও কমেছে।
সামান্য উপরের সাগরে উঠে এল সে।
পেটের দারুণ খিদের জ্বালায় বারবার হামলা করতে হচ্ছে।
ঠাণ্ডা পানিতে মুখ খুলল।
শিকার থেকে মাত্র এক হাজার ফুট নীচে আছে।

মানামিকে ট্রলারের কাছে নিয়ে গেছেন নাসিম।
তাঁর ও ডন রে-র জন্য দুটো লাইফ রিং ছুঁড়ে দিল মোঁসিউ দো টুহোনো।
অন্যরা উঠে পড়েছে ট্রলারে।
কেউ জানে না, মাত্র ছয় শ' ফুট নীচ থেকে তীরের মত উঠে

আসছে প্রকাণ্ড কারকারোডন।

ওই একই সময়ে অ্যাওর্টার উপর মেগালোডনের দাঁত দিয়ে ছুরির মত আঘাত হানছে রানা।

হাজার দিকে ছিটকে পড়ছে উষ্ণ রক্ত।

ওর ফ্ল্যাশলাইট ও মুখোশের কাঁচ ঘোলা হয়ে গেছে লাল তরলে।

তিনফুট চওড়া প্রকোষ্ঠে আঁধার নেমেছে।

থরথর করে কাঁপা প্রকোষ্ঠের সঙ্গে নড়ছে রানাও।

বারবার ওকে চেপে ধরতে চাইছে চারপাশের দেয়াল।

কারও জানবার কথা নয়, মাত্র চার শ' ফুট নীচে রয়েছে এখন মেগালোডন, হামলা করতে যাচ্ছে ট্রলারের উপর।

নৌযানের পাশে পৌঁছে গেছে ডন রে। তুলে নেয়া হলো তাকে।

মানামি ও নাসিমের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকজন নাবিক।

নাসিমকে আগে তুলে নিল দু'জন মিলে।

দুই হাত মাথার উপরে তুলল মানামি, উদ্ধারকারীদের হাত এত নীচে পৌঁছুল না।

পা নাড়বার ফাঁকে আরও উপরে হাত পাঠাতে চাইল মানামি।

আর মাত্র দুই শ' ফুট নীচে আদিম হাঙর।

সাগর-তলের দিকে চেয়ে আছে মোঁসিউ টুহোনো, নীচে দেখল ম্লান আলো জ্বেলে ছুটে আসছে ভয়ঙ্কর প্রাণীটা।

'জলদি ওকে তুলে নাও!' চিৎকার করে উঠল ফ্রেঞ্চম্যান।

গভীর পানিতে চোখ পড়ল মানামির, পরিষ্কার দেখল কালো পানি থেকে উঠে আসছে টিউব লাইটের মত আলো।

সরাসরি ওর পা লক্ষ্য করেই আসছে মেগালোডন!

অ্যাড্রেনালিনের স্রোত বয়ে গেল মানামির বুকে, প্রাণপণে পা নেড়ে ভেসে উঠতে চাইল। এবার খপ্ করে ধরতে পারল এক নাবিকের কবজি।

সাগরের পানির মাত্র এক শ' ফুট নীচে এখন মেগালোডন...

রাক্ষুসীর স্নাউটের তলে বেরিয়ে এল সমস্ত দাঁত, মাড়ি ও কানেকটিভ টিশ্যু, সামনে বাড়ল উপরের চোয়াল। দুই অন্ধ চোখ আঘাত থেকে রক্ষা পেতে চলে গেল কোটরের ভিতর।

এবার এক গ্রাসে লোভনীয় শিকারকে মুখে পুরে নেবে সে।

আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট...

মানামি বুঝল, পিছলে যাচ্ছে নাবিকের কবজি।

অন্য হাতে শক্ত করে লোকটার হাত ধরতে চাইল বেচারি।

কিন্তু ভারসাম্য রাখতে না পেরে আবারও ঝপাস্ করে পড়ে গেল সাগরে।

পিচ্ছিল ধমনিগুলো শক্ত করে ধরতে পারছে না রানা। এমন এক অ্যাংগেলে আছে কার্ডিয়াক চেম্বার, মনে হচ্ছে মেগালোডন উপরে উঠছে হামলা করবার জন্য।

রানার মনে পড়ল মানামির কথা।

কাজ থেকে মন সরাল না, বামহাতের ভাঁজে পেঁচিয়ে নিল পুরু ধমনি, দুই পা ঠেকিয়ে দিয়েছে উল্টো দিকের দেয়ালে। এবার প্রাণপণে নীচে টানতে লাগল স্পন্দিত মস্ত মাংসপেশি!

ডানহাতে আরও শক্ত করে ধরল প্রাচীন দাঁত, পরক্ষণে কচাকচ কেটে দিতে চাইল সব ধমনি।

সাগর-সমতল থেকে দশফুট নীচে গতি কমল মেগার। কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইল নষ্ট চোখদুটো, ঝিমিয়ে এল শরীরের সব পেশি। ভীষণ আক্ষেপের ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক নাড়ছে লেজ।

প্রকাণ্ড হাঙরটা কী করছে, কিছুই জানে না রানা— চিত হয়ে পড়ে আছে পুরো নিকষ আঁধারে।

গায়ে এসে পড়ছে বালতি বালতি উষ্ণ রক্ত।

বুকে চেপে বসেছে মেগালোডনের গাছের গুঁড়ির মত কেটে নামানো হৃৎপিণ্ড!

রেগুলেটরের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে চাইছে রানা।

ধুপ-ধাপ ড্রামের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু ক্রমেই রক্তে ভরে উঠছে মাংসপেশি ভরা এই প্রকোষ্ঠ!

ওজনদার হৃৎপিণ্ডের তলা থেকে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে বেরিয়ে এল ও, হাতড়াতে শুরু করেছে মেঝে।

শক্ত কী যেন লাগল হাতে।

হ্যাঁ, ফ্ল্যাশলাইট!

কাঁচ পরিষ্কার করল রানা, সামান্য বাড়ল আলো।

উপর থেকে ঝরঝর করে পড়া রক্তের ধারার ভিতর ক্রল শুরু করেছে রানা।

ফিরতে হবে মেগালোডনের পেটে।

মানামি জানে এবার নিশ্চিতভাবেই মরবে।

কিন্তু মৃত্যু যখন এল না, আবারও চোখ মেলল।

চোখ গেল নীচে— হাঁ হয়ে আছে মেগালোডন, ধীরে ধীরে নেমে চলেছে গভীরে।

রক্তের ধারা ঘিরে ফেলছে মানামির উরু ও কোমর।

'দড়িটা ধরো, মানামি,' বললেন নাসিম।

'আমি ঠিক আছি,' বলল ও। 'দয়া করে আমাকে একটা মাস্ক দিন।'

তর্কে গেলেন না নাসিম, স্নরকেল ও মাস্ক খুঁজে নিয়ে

ফেললেন মানামির হাতের কাছে।

মুখোশ পরে মাউথপিস ঠিক করে নিল মানামি, চাইল নীচে।

ধোঁয়ার মত লালচে লবণাক্ত পানি।

এবার পরিষ্কার দেখল মেগালোড্নের মুখের ভিতর থেকে উঠে আসছে রক্তের আস্ত নদী।

ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা।

আগেই থেমে গেছে ওটার লেজবিক্ষেপ।

মেগালোডনের পেট কোথায় থাকতে পারে, জানে রানা।

কিন্তু সমস্যা অন্যখানে: ওই পুরু মাংসের দেয়ালে কোথায় ছিল চেরা জায়গাটা?

বদ্ধ জায়গায় আটকা পড়েছে ও।

ফ্ল্যাশলাইটের বাতি ছোট্ট গোল আলো তৈরি করছে।

নিভেও আসছে দুর্বল রশ্মি।

বামহাতের তালুতে ফ্ল্যাশলাইটের নীচের অংশ ঠুকল রানা।

আলো একটু বাড়ল।

কয়েক মুহূর্ত পর নেহায়েত কপালগুণে চেরা জায়গাটা খুঁজে পেল ও। পার হয়ে যাচ্ছিল, প্রাচীন মেগার দাঁত গেঁথে গেছে কাটা মাংসে।

প্রথমে ওদিক দিয়ে বের করে দিল ডান পা, তারপর মাথা, শেষে দেহের অবশিষ্ট অংশ।

নিজেকে গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া লোক মনে হলো ওর।

আরে! কোথায় গেল অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান?

চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি শুরু করে চমকে গেল রানা।

হাঙরের পেটের অ্যাসিডে পুড়তে শুরু করেছে চার হাত-পা'র খোলা অংশ।

সামান্য আলো দিচ্ছে ফ্ল্যাশলাইট।

এই সামান্য আলোতে কিছুই হবে না।

সাবমারসিবলের বাইরে বাতি জ্বলবে, ভেবেছিল রানা।

এখন বুক কাঁপতে শুরু করেছে ওর।

সাবমারসিবল কি সড়াৎ করে তলিয়ে গেল ইনটেসটিনে?

এসব ভাবতে গিয়ে নিজেও পিছলে গেল ও, সরসর করে গিয়ে থামল হাঙরের পেটের নীচের দিকে। গেঁথে গেছে একগাদা আবর্জনার ভিতর। কিন্তু এর ফলে শক্ত কীসের সঙ্গে যেন ঠকাস্ করে ঠুকেছে মাথা।

জিনিসটা অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানের টেইল্ সেকশন।

সাব-এর নাক গুঁজে গেছে ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের মুখে।

টেইল সেকশন মোটা হওয়ায় ওদিকে চলে যেতে পারেনি।

দু'হাতে পিছনের হ্যাচ ধরল রানা, পিছাতে চাইল। মাংসের মেঝেতে কঠিনভাবে রেখেছে দুই পা। ওর রক্তে মিশছে অ্যাড্রেনালিন। ব্যয় করছে গায়ের সমস্ত শক্তি। কয়েক সেকেণ্ড পর ইনটেসটিনের মুখ থেকে উঠে এল সাবমারসিবলের নাক। পাশেই জমে থাকা প্রায়-হজম হওয়া খাবার জমল নীচের ওই বড় নালার ধারে।

মস্ত হাঙরের পেটে ভুতুড়ে আলো ফেলছে সাবমারসিবল।

মারা পড়েছে ওটা, এখন একটুও নড়ছে না কোনও পেশি।

ইনটেসটিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে পুরো হজম না হওয়া খাবার, আবারও ফিরছে পেটে। ওগুলোর চাপে উপরে উঠছে সাবমারসিবলের নাক।

সমস্ত শক্তি ব্যবহার করে টর্পেডো আকৃতির সাব ঘোরাতে চাইল রানা। ঘামতে শুরু করেছে দরদর করে।

কাজ করতে হচ্ছে অন্ধের মত।

কিছুক্ষণ পর ঘুরে গেল সাবের লেজ।

তিনফুট গভীর আবর্জনা বা হজম না হওয়া মাংসের স্তূপে

হাত ভরল রানা, টান দিয়ে খুলল বাইরের হ্যাচ। গলিত তিমি ও মানুষের মাংসের কথা ভুলে যেতে চাইল— মাথা ও হাত পুরল হ্যাচের ফোকর দিয়ে। কয়েক সেকেণ্ড পর উঠে পড়ল প্রায় শুকনো চেম্বারে। টানটান ওয়েট সুটে লেগে আছে পিচ্ছিল আবর্জনা। বন্ধ করে দিল পিছনের হ্যাচ। আট ফুটি ক্যাপসুলের ভিতর সোজা হয়ে দাঁড়াল। জ্বেলে নিয়েছে সাবমারসিবলের সামনের বাতিগুলো।

রানা জানে, মাত্র একবার সুযোগ পাবে।

আর ওই সামান্য ফিউয়েল ব্যবহার করে উঠে যেতে হবে মরা মেগালোডনের গলার ভিতর দিয়ে।

বামদিকে শরীর ঝাঁকাল রানা। অবস্থান ঠিক করে নিচ্ছে সাবের। ওটার নাক হতে হবে ঠিক গলির দিকে তাক করা।

কয়েক সেকেণ্ড পর পাইলট হার্নেসে নিজেকে আটকে নিল ও। এবার হাত বাড়াল ফিউয়েল ইগনাইট করবার ল্যাচের দিকে। ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ওটা ঘোরাল।

সামান্য পরিমাণ আছে হাইড্রোজেনের ফিউয়েল, কিন্তু সেটাই মেগালোডনের পেট পুড়িয়ে দেয়াল বেয়ে রকেটের মত তুলে দিল সাবমারসিবলকে।

শক্ত হাতে জয়স্টিক ধরে থাকল রানা।

তাক করেছে মুক্তি পাওয়ার গলি লক্ষ্য করে।

পিচ্ছিল পেট থেকে পানি ভরা গলা লক্ষ্য করে উঠছে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান।

বদ্ধ জায়গায় গুড়গুড় আওয়াজ তুলল রকেট ফিউয়েল।

পরক্ষণে হোঁচট খেয়ে থেমে গেল সাব।

বাইরের বাতির আলোয় সাগরের পানি ও রক্তে ভরা এক জায়গা দেখল রানা।

মরা শিকারি মাছের মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে পেটে ঢুকছে পানি।

সামনে গুহামত জায়গাটা গলার প্রবেশদ্বার।

ওখানে ঢুকতে পারবে না অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ান।

বুঝতে দেরি হলো না রানার, সাবের পিছনের মোটা অংশ আটকে গেছে হাঙরের পেটের উপরের মাংসপেশিতে।

সাব একটু নড়ে উঠতেই চমকে গেল ও।

আবারও বোধহয় নেমে যেতে শুরু করেছে পেটের ভিতর।

আবারও ফিউয়েল ল্যাচ টানল রানা...

কিছুই হলো না তাতে।

ফিউয়েল নেই।

এবার আর ঠেকাতে পারবে না, সাব আবারও পিছলে নামবে পেটের ভিতর।

প্রচণ্ড বিরক্তি ও হতাশা নিয়ে ডানহাত নীচে ছুঁড়ল রানা।

খটাস্ করে মুঠো লাগল ধাতব বাক্সে।

এস্কেপ পড!

বাক্সের ঢাকনি খুলল রানা। লিভার ধরেই টেনে দিল।

বিস্ফোরণের ফলে থরথর করে কেঁপে উঠল সাবমারসিবল, পিছনের ভারী টেইল সেকশন থেকে আলাদা হয়ে গেছে টর্পেডোর মত এস্কেপ পড।

মৃত মেগালোডনের পানি ভরা গলার দিকে রওনা হয়ে গেল রানা।

সাগরের পানিতে কর্কের মত ভাসবে পড।

উঠে যেতে পারবে সাগর-সমতলে।

মেগালোডনের গলা চওড়া হয়ে উঠেছে।

এস্কেপ পডের বাইরের বাতি দেখাচ্ছে সামনের দিক।

ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠছে রানা।

পানি ও রক্তের কুয়াশায় উঠছে পড, কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই।

বয়্যান্ট সিলিণ্ডারের গতি বেশ দ্রুত।

সামনে মরা মেগালোডনের মুখ।

কিন্তু বিশ টনি এ বন্দিশালা থেকে বেরুতে পারবে না মাসুদ রানা।

মরা মেগার দুই চোয়াল ও ধারাল নয় ইঞ্চি দাঁতগুলো ওর পড বেরিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুরো অন্ধকারে চুপ করে শুয়ে আছে রানা।

সামান্য আলো আসছে পডের বাইরে থেকে।

মেগালোডনের মুখ খোলা, কিন্তু হামলার ভঙ্গিতে সামনের দিকে বেড়ে নেই।

অর্ধেক বন্ধ নরকের দরজা।

মুখের গর্তটা আগের চেয়ে বেশ ছোট।

মেগালোডনের চোয়ালে ভাসছে রানার পড, ঠোকাঠুকি করছে ভয়ঙ্কর দাঁতগুলোর সঙ্গে।

মুখ বিকৃত করে বারকয়েক শরীর ঝাঁকাল রানা।

মেগালোডনের অর্ধেক বুজে যাওয়া মুখের গর্তে ঠিকভাবে বসে গেল লেক্সান পড।

ওটার ক্ষুরধার সব দাঁত ধরে রেখেছে রানার রক্ষা-কবচকে।

যদি খোলা না যায় চোয়াল, আটকা পড়বে পড ও রানা।

অর্থাৎ, বেয়াল্লিশ হাজার পাউণ্ড ওজনের মৃত মেগালোডনের সঙ্গী হয়ে নেমে যাবে অসহায় মাসুদ রানা অতল সাগরে।

নিশ্চিতভাবেই মরতে হবে ওকে!

তেত্রিশ

লেজ নীচে তাক করে নেমে চলেছে মৃত কারকারোডন মেগালোডন, মন্টেরেই-বে ক্যানিয়নের কালো জলের গভীরে হারিয়ে যাচ্ছে ম্লান সাদা আলো।

দানবীর মুখে আটকা পড়েছে অ্যাবিস গ্লাইডার-ওয়ানের সাত ফুটি এস্কেপ পড।

ত্রিকোণ সাদা গরাদের কারণে জেল থেকে বেরুতে পারবে না রানা।

প্রতি মুহূর্তে আরও উপরে চলে যাচ্ছে সাগর-সমতল।

চট্ করে একবার ডেপথ গজ দেখল রানা।

এগারো শ' ফুট।

দ্রুত নামছে মরা মেগালোডন।

দেরি না করেই যেভাবে হোক মুক্ত করতে হবে পড।

বুক ডনের মত ঝুঁকে গেল রানা। পিঠ দিয়ে গুঁতো দিল সাবমারসিবলের উপরের অংশে।

দানবীর দাঁতগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষ হলো পডের, কেঁপে উঠল থরথর করে।

মৃত্যু-চোয়ালে আরও ছয় ইঞ্চি এগোল পড মুক্তির দিকে।

উৎসাহী হয়ে উঠল রানা, আবারও পডের উপর অংশে গুঁতো দিল। প্রতিবারে সামান্য করে মুক্তির দিকে চলেছে ও।

দুই মিনিট পর হঠাৎ প্লাস্টিকে হাড় ঘষ্টানো আওয়াজ হলো।

আর তখনই মৃত্যু-চোয়ালের আলিঙ্গন থেকে টুপ করে বেরিয়ে এল পড। পরের সেকেণ্ডে হিলিয়াম বেলুনের মত উঠতে লাগল সাগর-সমতল লক্ষ্য করে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল রানা।

প্রতি মিনিটে ষাট ফুট উপরে উঠবে পড। ফলে সঠিক ভাবেই ডিকমপ্রেশন হবে।

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর শুকিয়ে গেল ওর গলা।

ক্ষতিগ্রস্ত এস্কেপ পডে দেখা দিয়েছে অসংখ্য চিড়।

আর সাঁতার কাটা সম্ভব নয় বাড লিটলটনের পক্ষে। ফুরিয়ে গেছে দম, এক পা গুলি খাওয়া, অন্যটা প্রায় অবশ। চক্কর কাটছে ভয়ঙ্কর ওই দানবী। অবশ্য একটু পর অবাক হলো, ওই ছয় ফুটি পাখনা নেই, সেখানে তিন ফুটি ত্রিকোণ এক ডরসাল ফিন।

তেরো ফুটি হাঙরকে বিরক্তি নিয়ে বলল বাড, 'সর্ এখান থেকে!'

বারবার ঢেউয়ের গায়ে লেজের চাপড় মারছে ওটা।

আর তখনই বাডের পাশে ঝুপ্ করে নেমে এল কী যেন্।

হতবাক হয়ে গেছে বাড।

মুখ তুলে চাইল।

আওয়াজটা দূরে ছিল, কিন্তু এইমাত্র মাথার উপর হাজির হয়েছে নেভির হেলিকপ্টার।

হার্নেসের ভিতর একহাত ভরে দিল বাড, ক্রুদের উদ্দেশে পাগলের মত নাড়ল অন্যহাত। চিৎকার করে বলল, 'ওরে আমার শালারা, তুলে নে আমাকে!'

পানির ভিতর থেকে ত্রিকোণ মাথা উঁচু করল হাঙর, আর তখনই বাডকে হ্যাঁচকা টানে তুলে নেয়া হলো আকাশে।

মুখ তুলে চাইল বাড, হেসে ফেলল। বিড়বিড় করে বলল, 'দেখো শালার কপাল, সেই ইউএস নেভিই বাঁচাতে চায় আমাকে! ঈশ্বরের ঠাট্টার শেষ নেই!'

সাগর চিরে তরতর করে উঠছে লেক্সান টর্পেডো, কিন্তু বাস্তব কথা হচ্ছে, মস্ত ঝুঁকির ভিতর পড়েছে গোটা এস্কেপ পড।

পাঁচ শ' নয় ফুট গভীর সাগরে হঠাৎ করেই রানার মাথার উপরের সামান্য ফাটল হয়ে উঠেছে দীর্ঘ নালা। অসহায় চোখে ওদিকে চেয়ে আছে রানা। শারীরিক ও মানসিকভাবে অতি ক্লান্ত। গোলচে ফাটল দেখা দিয়েছে পুরো সিলিণ্ডারে।

শয়তানি ভরা হাসি হাসি মুখ নিয়ে ক্যানিয়নের আরও গভীরে নেমে চলেছে কারকারোডন মেগালোডনের লাশ। দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে ম্লান আলো। তারপর সম্পূর্ণ হারিয়ে গেল আঁধারে।

আজ ক'বার মরতে মরতে বেঁচেছি, ভাবল রানা। কিন্তু এবার বাঁচতে আরও একবার কপালের দারুণ জোর লাগবে।

দুটো বিষয় মাথার ভিতর রাখছে রানা।

প্রথমত, পানির বিপুল প্রেশার।

দ্বিতীয়ত, শ্বাস নেয়ার অক্সিজেন।

এসব নিয়ে ভেবে যে লাভ আছে, এমন নয়।

যে কারণেই হোক, অনেক দ্রুত উপরে উঠছে পড।

ফলে, রক্তে তৈরি হচ্ছে নাইট্রোজেনের বুদ্বুদ।

এরই ভিতর উঠে এসেছে ও চার শ' ফুট গভীরতায়।

কাঁচের মিসাইলের মত উঠছে পড।

প্লাস্টিকে কয়েক জায়গায় বেশি ফাটল ধরেছে।

সরু রেখায় তিরতির করে ঢুকছে পড়ে পানির ধারা।

রানার জানা আছে, এস্কেপ পডের ফাটল আরও বাড়লে

হঠাৎ করেই প্রচণ্ড চাপের মুখে চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়বে সব।

হিসাব কষতে শুরু করেছে রানা।

ওর সর্বশেষ ডাইভ কত গভীরে ছিল?

কত গভীর পর্যন্ত নামতে পেরেছিল?

এক শ' বিশ ফুট?

না, এক শ' ত্রিশ!

তাতেই বা কী?

চট্ করে বুকের স্ট্র্যাপে আটকে রাখা অক্সিজেনে ট্যাঙ্কের দিকে চাইল রানা।

কোথাও ওর জন্য ভাল কোনও সংবাদ নেই।

তিন মিনিটের অক্সিজেনও নেই।

তিন শ' ফুট গভীরতায় হঠাৎ কাঁপতে শুরু করল টর্পেডো আকৃতির পড।

আতঙ্কিত শোনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হ্যারল্ড ডেভিডের কণ্ঠ, 'মানামি, এবার পানি থেকে উঠে এসো!'

পাত্তাই দিল না সাহসী মেয়েটি, পানিতে মুখ রেখে নীচে চেয়ে আছে। বাতাস নিচ্ছে স্নরকেলের মাধ্যমে।

মারা পড়েছে কারকারোডন মেগালোডন, কিন্তু মানামির মন কেন জানি বারবার বলছে: বেঁচে আছে রানা! বেঁচে আছে!

অনেক কালো গভীরে সাদা আলো হারিয়ে যেতে দেখছে ও।

ট্রলারের ক্যাপ্টেন ও রিকি ব্র্যাডসেন মিলে খুলে ফেলেছে একটা ইঞ্জিন। ট্র্যানসমে বসেছে মোঁসিউ দো টুহোনো, ভীষণ হতাশ বোধ করছে সে। এত চেষ্টা করা হলো, তবুও বাঁচানো গেল না মেগালোডনকে। এত লবিইং, বিপুল খরচ— সব ফালতু গেল।

পৃথিবীর সেরা ভয়ঙ্কর শিকারি প্রাণী... হারিয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে।

আমি আজ মারাও যেতে পারতাম, ফিসফিস করল টুহোনো। এতকিছু কীসের জন্য? নিজের খুনিকে রক্ষা করতে? এসব ভাবছি কেন? আমার বউকে কী বলত সোসাইটি থেকে: 'আহা, স্যারা, তুমি গর্বিতা বিধবা। খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছে দো টুহোনো, প্রায়-বিলুপ্ত প্রজাতির এক প্রাণীকে বাঁচাতে গিয়ে তারই খাবার হয়েছে।'

উঠে দাঁড়াল টুহোনো, আড়মোড়া ভাঙল। দূরে চেয়ে রইল।

পাশ থেকে কে যেন বলল: 'আরে! আরে! হাঙর!'

'জলদি তোলো মেয়েটাকে,' চেঁচিয়ে উঠলেন নাসিম।

প্রশান্ত মহাসাগরের বরফ-ঠাণ্ডা পানি ঢুকে ভরে উঠছে এস্কেপ পড।

এই বাড়তি ওজনের ফলে উপরে উঠবার গতি কমেছে।

ওয়েট সুট থাকার পরও শীতে কাঁপতে শুরু করেছে রানা।

চট্ করে একবার দেখে নিল ডেপথ গজ।

দুই শ' ফুট।

সিলিণ্ডারের মত এস্কেপ পডে ফাটল আরও বেড়েছে। কাঁপতে শুরু করেছে লেক্সান প্লাস্টিক। অসম্ভব হয়ে উঠছে সাগরের চাপ সওয়া।

যে-কোনও সময়ে চুরচুর হয়ে ভেঙে পড়বে চেম্বার।

চট্ করে উপরে চাইল রানা।

সারফেস দেখা যাচ্ছে না।

এত গভীরতায় এস্কেপ পড ভেঙে পড়লে মরতে হবে ওকে।

সাবধানে আবারও মাস্ক পরল রানা, তৈরি রাখল রেগুলেটর। ভেলক্রো ফিতায় আটকে নিয়েছে অক্সিজেনের

ট্যাঙ্ক।

বেশি গতি চাই না, নিজেকে বলল রানা। অলসভাবে উঠতে চাই।

কিন্তু খালি ট্যাঙ্ক উপরের দিকে টান দেবে ওকে।

এনার্জি খরচ করা চলবে না।

ভুলেও চোখ বোজা যাবে না।

ঘুমিয়ে পড়া একেবারেই নিষেধ।

নইলে হয়তো আর কখনও জেগে উঠতে পারবে না।

এখন যদি ভেঙে পড়ে পড, গভীর পানিতে মরতে হবে, ভাবল রানা।

মাছ-ধরা ট্রলারকে চক্কর কাটছে তিন ফুটি ওই ডরসাল ফিন। মানামিকে সতর্ক করতে প্রায় একইসঙ্গে গলা ছাড়ল সবাই।

মূল কথা: এক্ষুণি উঠে এসো ট্রলারে!

'সন্দেহ নেই বড় শ্বেত-হাঙর,' মন্তব্য করল টুহোনো। 'মাদি মনে হচ্ছে। তেরো ফুট হবে। পানিতে রক্তের ঘ্রাণ পেয়ে এসেছে। এখন আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত মানামিকে পানি থেকে তুলে নেয়া।'

ট্রলারের ক্যাপ্টেন নীচে চলে গিয়েছিল, আবারও বেরিয়ে এল ডেকে, হাতে শটগান।

মানামিকে ঘিরে চক্কর কাটতে শুরু করেছে ডরসাল ফিন।

হাঙরের মাথা লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করল ক্যাপ্টেন।

আর তখনই ঢেউয়ের নীচে তলিয়ে গেল মানামি।

এক শ' বেয়াল্লিশ ফুট গভীর পানির ভিতর ঠাস্ করে চুরমার হলো এস্কেপ পড। রানার উপর ঝাঁপিয়ে নেমে এল ভীষণ শীতল সাগর। ফলাফল: সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের দশ নম্বর

বিপদসঙ্কেতের মতই বেদম আতঙ্কের।

রানার নাক থেকে ছিটকে বেরুল রক্ত।

দেরি না করে হ্যাচের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ও।

ফাটল ধরে গেল ফেসপ্লেটে।

দুই পা নাড়তে শুরু করেছে ফ্রিস্টাইলের ভঙ্গিতে।

ট্যাঙ্কের কারণে অনেক দ্রুত উপরে উঠছে।

ডিকমপ্রেশন করবার সময় মোটেই পাবে না।

বাধ্য হয়ে সাঁতার কাটা বন্ধ করে দিল রানা।

কিছুক্ষণ পর আশি ফুট গভীর সাগরে উঠে এল, ততক্ষণে সীসার মত ভারী হয়ে গেছে ওর দেহ।

প্রায় ফুরিয়ে এসেছে অক্সিজেন।

বুকের স্ট্র্যাপে আটকে আছে ট্যাঙ্ক, অনেক হালকা হয়েছে।

উঠবার গতি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক।

বুকের ভেলক্রো স্ট্র্যাপে আটকানো ট্যাঙ্কের দিকে চাইল রানা, আর মেলতে পারছে না দুই চোখ, পাতাগুলো অনেক ভারী।

চড়চড় করে খুলে আসছে ভেলক্রো।

আবারও আটকে নিতে চাইল রানা, কিন্তু নড়ল না ওর অবশ হাত।

লোহার মত ভারী হয়ে উঠেছে ওর প্রতিটা অঙ্গ।

আটান্ন ফুট উপরে আকাশ-বাতাস।

ঠিক তখনই ফুরিয়ে গেল অক্সিজেন।

খুলে গেল ভেলক্রোর দু'প্রান্ত।

রানার বুক থেকে রকেটের মত উপরে রওনা হলো ট্যাঙ্ক।

চোখ বুজে ফেলেছে প্রায় অচেতন রানা, প্রাণপণে কামড়ে ধরল রেগুলেটর। হাতের নাগালের বাইরে ভাসছে ট্যাঙ্ক, ধরতে পারবে না। নিজেকে একবার মাতাল মনে হলো ওর।

তেত্রিশ ফুট গভীরে চেতনা লুপ্ত হতে শুরু করল।
মুখ থেকে খুলেই গেল রেগুলেটর।
সারফেসের দিকে ছিটকে গেল ট্যাঙ্ক।
কিছুই অনুভব করল না রানা।
কোনও ব্যথা নেই। ভয়ও নেই।
আনমনে ভাবল, আমি স্বপ্ন দেখছি?
চোখ তুলল। উপরে কত আলো!
উড়ছে ও। শরীর নেই, কিন্তু ভেসে চলেছে আলোর দেশে।
মৃত্যু এত আনন্দের, ভাবল রানা।
বুজে গেল ওর চোখ।

চৌত্রিশ

মাসুদ রানা আবারও পাতালের দিকে রওনা হতেই খপ্ করে ওর কবজি ধরল মানামি সিনোসুকা। দ্রুত নাড়তে শুরু করেছে পা। সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে রানাকে। ডানদিকে, উপরে চক্কর কাটছে শ্বেত-হাঙর। সেদিকে খেয়াল নেই মানামির, জীবনে এই প্রথম এত জোরে সাঁতার কাটছে।

সারফেসে ভেসে উঠতেই টান দিয়ে রানার মুখ উপরে তুলল মানামি। একেবারে নীল হয়ে গেছে রানা। শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনও চিহ্ন নেই।

ওদের দু'জনের মাত্র আট ফুট দূরে সাদা ডরসাল ফিন। পানি থেকে ভেসে উঠল ত্রিকোণ স্নাউট, শিকারের দিকে তেড়ে

এল হাঙর।

আর তখনই আকাশ থেকে নামল কঠিন নেটের জাল।

পরক্ষণে সীসার ওজনে সবদিক থেকেই আটকা পড়ল শিকারি মাছ।

জানোয়ারটা প্রাণপণে ছুটতে চাইছে।

কিন্তু প্রকাণ্ডদেহী জেলেও কম নয়, টেনে ধরে রেখেছে জাল।

ভালভাবে আটকা পড়েছে হাঙর।

এদিকে ট্রলারের পাশে রানাকে নিয়ে এসেছে মানামি।

অন্তত একডজন হাত এল ওকে এবং রানাকে তুলে নিতে।

ডেকের উপর রানাকে তুলতেই পাশে বসে পড়ল মানামি, প্রিয় মানুষটার মুখে মুখ রেখে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেয়া শুরু করল।

নাসিম আহমেদ ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে ভালভাবে ঢেকে দিল রানাকে, পরখ করে দেখল পালস।

হ্যাঁ, আছে, খুব দুর্বল।

মানামির দক্ষ চিকিৎসায় কেশে উঠল রানা, মুখ থেকে বেরিয়ে এল পানি। পরক্ষণে মাথা কাত করে হড়হড় করে বমি করল। মানামি একটু সরতেই রানা দেখতে পেল সোনালী সূর্য।

'তোমার নড়া চলবে না,' প্রায় নির্দেশ এল। রানার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে মানামি। 'রওনা হয়েছে কোস্ট গার্ডরা। আমাদের নিয়ে যাবে লেগুনে। ইন্সটিটিউটে আমাদের রিকমপ্রেশন চেম্বার আছে।' রানার দিকে চেয়ে হাসছে জাপানি ললনা, চোখে টলটল করছে অশ্রু।

ওর দিকে চেয়ে হাসল রানাও, ভুলে যেতে চাইল বেণ্ডের ব্যথা। একবার ভাবল, এটা স্বর্গ হলে মন্দ হতো না।

পানির পাঁচ ফুট নীচে নিজেকে ছাড়াতে না পেরে জালের ভিতর ধড়ফড় করছে হাঙর।

ট্রলারের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তর্ক জুড়েছে মোঁসিউ দো টুহোনো।

'ক্যাপ্টেন, ওটাকে মারতে দেব না,' গলা ফাটাল ফ্রেঞ্চ-ম্যান। 'ওটা প্রটেকটেড স্পিশিয!'

'আমার ট্রলারের অবস্থা দেখেছ?' পাল্টা বলল ক্যাপ্টেন। 'ওই মরা হারামজাদী আমার সর্বনাশ করেছে। ওটাকে যখন পাচ্ছি না, এটাকে নিজ হাতে শেষ করব। তারপর বিক্রি করব নিউ ইয়র্কের কোনও টুরিস্টের কাছে। কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেবে। শালার ফ্রেঞ্চ কোথাকার, তুমি দেবে কয় পয়সা?'

'হাত দাও ওই হাঙরের গায়ে, তুমি থাকবে জেলে—ঈশ্বরের শপথ!'

একটু আগে রেলিঙে ঠেস দিয়ে বন্দুক রেখেছিল ট্রলারের মালিক, তর্কে জড়িয়ে দু'জনের কেউ খেয়াল করেনি, বন্দুক গায়েব করে দিয়েছেন নাসিম আহমেদ।

'আরে শালার ফ্রেঞ্চ...' নতুন উদ্যমে বলতে শুরু করেছে ট্রলারের মালিক, কিন্তু থামতে হলো তাকে।

পৌঁছে গেছে এক শ' দশ ফুট দৈর্ঘ্যের কোস্ট গার্ড বোট। ওটা থেকে ট্রলারের উপর ফেলা হলো দড়ি।

ট্রলারের বো-র সঙ্গে দড়ি বাঁধল ক্যাপ্টেন ব্র্যাডসেন।

কয়েক সেকেণ্ড পর টানটান হয়ে উঠল লাইন, বোটের পিছনে রওনা হয়ে গেল ট্রলার। চলেছে টয়োডা মেমোরিয়াল লেগুন লক্ষ্য করে।

জালের ভিতরে বন্দি অবস্থায় চলেছে দুই হাজার পাউণ্ডের হাঙরটাও।

আগেই নিতু জাহাজটার জন্য খুলে দেয়া হয়েছিল মণ্টেরেই-

বে স্যাংচুয়ারির দিকে লেগুনের দরজা।

ট্র্যানসমে কাত হয়ে বসে আছে রানা, বেণ্ডের কারণে হাড়ে ও মাংসে ভীষণ ব্যথা।

'কী, রানা?' বলল মানামি। 'ব্যথা আরও বাড়ছে?'

'আর কতক্ষণ লাগবে পৌঁছুতে?' ব্যথা আরও বেড়েছে রানার।

তখনই লেগুনে ঢুকল ট্রলার।

নকল লেগুনের উত্তরদিকে ডক, ওখানে থামতে শুরু করেছে বোট এবং ট্রলার।

ডকে ওদের জন্য হুইল চেয়ারে বসে অপেক্ষা করছেন তামেশু সিনোসুকা, মাথায় ভারী ব্যাণ্ডেজ। পাশে আর্দালি। আরেকদিকে বাড লিটলটন।

রানাকে নামিয়ে নিতে হাজির হয়েছে কয়েকজন আর্দালি।

'আর বড়জোর একমিনিট, রানা,' বলল মানামি। 'এখনই পৌঁছে যাবে অ্যাম্বুলেন্স। বাবা আর আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

আস্তে করে মাথা দোলাল রানা। ব্যথায় অস্থির লাগছে ওর। বমি আসছে। মন বলছে মেগালোডনটা চিবাতে শুরু করেছে তার বীভৎস দাঁতগুলো দিয়ে।

এইমাত্র সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন নাসিম আহমেদ। রানার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। দেখিয়ে দিলেন স্টার্নের বামদিকের জাল।

ঝটকা-ঝটকি করছে মস্ত শ্বেত-হাঙর।

'রানা, এটাও মাদি,' বললেন নাসিম।

সন্দেহ নিয়ে নাসিমের দিকে চাইল রানা। কয়েক সেকেণ্ড পর বুঝে ফেলল কী বলেছেন ডক্টর। 'মেগালোডনের মেয়ে?'

'হ্যাঁ! কোনও সন্দেহ নেই!'

ডক্টর নাসিমের দিকে চেয়ে বিস্ফারিত হলো রানার চোখ।

কয়েক সেকেণ্ড পর এত ব্যথার ভিতরেও হেসে উঠল।

হাসছে মানামিও। দুই হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে।

মৃদু হেসে আরেকদিকে চলে গেলেন ডক্টর নাসিম আহমেদ।

দু'জনই হাসছে ওরা। রানা হাসছে, মানামি হাসছে— ভুলে গেছে আশপাশে অনেকেই আছে। মানামির লাজুক ঠোঁটে নেমে এল রানার ঠোঁট।

বেরিয়ে গেছে

মাসুদ রানা

টাইম বম

কাজী আনোয়ার হোসেন

গনগনে তপ্ত নিউ ইয়র্ক। বিখ্যাত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ধসে পড়ল শক্তিশালী এক বোমার আঘাতে। জড়িয়ে পড়ল রানা। কারণ, হুমকি দিয়েছে টেরোরিস্ট, ওকে ডেকে না আনলে আরও অনেক বোমা ফাটবে শহরে। ডিটেকটিভ চিফ ক্যাপ্টেন জেরেমি জনসনের সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখতে গিয়ে শুধু জাঙ্গিয়া পরে হারলেমের ক্রাইম জোনে যেতে হলো রানাকে। ডাক পিওনের মত ছুটছে ও শহরের এদিক থেকে ওদিক! এখানে-ওখানে-সেখানে ভয়ানক সব বোমা পেতে রেখেছে লোকটা! উড়িয়ে দিতে চাইছে কমিউটার ট্রেন, স্কুলের কচি শিশু ও নিরীহ জনসাধারণকে! আসলে কী চায় লোকটা? যখন বোঝা গেল সত্যিই কী চায়, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঠেকাতে গিয়ে অসহায়ভাবে বন্দি হলো রানা ও তার কালো বন্ধু জো মাইনার। এবার মরতে বসেছে দুজনই। বাইনারি বোমা দিয়ে ওদের সহ লোকটা উড়িয়ে দিল মস্ত জাহাজ। তা হলে কি এখানেই শেষ রানার... চিরতরে গুড বাই, মাসুদ রানা?

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

রানা দীপ্ত, মোবা: ০১৬৮৭২২২০০০
গ্রাম: শরীফগঞ্জ, পোস্ট: কান্দিপাড়া, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ-২২৩৩।

কাজীদা,

কী শুরু করেছেন আপনি? একের পর এক অসাধারণ বই লিখেই চলেছেন! আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আগামীতে 'কিলার ভাইরাসে'র মত বই লিখবেন না। আর একটু হলে তো আমরা মারাই যেতাম! একের পর এক শ্বাসরুদ্ধকর, কঠিন সব পরিস্থিতি। এত উত্তেজনা, সারাক্ষণ অস্থির ছিলাম, কী হতে না জানি কী হয় তবে যাই হোক, নিশাত আপাকে নিয়ে যা খেল দেখিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। আমি তো নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে তিনি মারা গেছেন।

রানা যখন ইউ.এস.-এর প্রেসিডেন্টকে নিয়ে মহাশূন্যে পৌঁছে গেল, তখন মনে হচ্ছিল আমি নিজেও যেন মহাশূন্যে চলে গেছি। ২য় খণ্ডের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লেখা চারটি লাইন আমার চমৎকার লেগেছে: 'চুপ করে রইল ও, মহাকাশে ভাসছে নীলচে গোলক। ওটার উপর দিয়ে নক্ষত্ররাজির দিকে চাইল। সাদা-নীল-লাল-হলুদ বিন্দুগুলো ঝকমক করছে! সংখ্যায় এত বেশি, অসহায় লাগে—আমি এতই ছোট, আর এই মহাকাশ ও চারপাশের সবকিছু এত বড় কেন?'

ভয়ে ছিলাম, কখন জানি রানার কী হয়ে যায়। এর আগে মাসুদ রানা সিরিজের যত বই পড়েছি, জেনেছি এই বইয়ের পর আরও বই বের হয়েছে। তার মানে, যেভাবে হোক সে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এ বইটি পড়ায় এতই মগ্ন ছিলাম যে, ভুলেই গিয়েছিলাম, মাসুদ রানা অমর! মৃত্যুকে কীভাবে ফাঁকি দিতে হয় তা সে ভালভাবেই জানে।

মাসুদ রানার কোন্ কোন্ বই সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে, তা উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম, তা সম্ভব নয়। মাসুদ রানা কেন ভাল লাগে, সে প্রশ্নের অনেকেরই সহজ উত্তর—প্রতিটি বইয়ের কাহিনি, প্রেক্ষাপট

অসাধারণ। কিন্তু যে জন্যে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে, তা হল—একটি ঘটনার পর কী ঘটবে, তা আমি কখনও সঠিকভাবে বলতে পরি না। যা চিন্তা করি, দেখা যায় কখনও তা হয় না। সবসময়ই একটা করে সারপ্রাইজ থাকে।

তিশাকে রানার জন্যে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। ভাল লেগেছে এটা জেনে যে, রানার মনও শেষপর্যন্ত বাঁধা পড়ল। আশা করছি বিয়ের আগ পর্যন্ত এদের সম্পর্ক কিস পর্যন্তই সীমিত থাকবে। আর আপনার কাছে আমার আকুল প্রার্থনা, তিশাকে একটু আগলে রাখবেন। রেবেকার মত করুণ পরিণতি যেন তার না ঘটে। পারলে তাকে বিসিআই-এ নিয়ে আসুন প্লিজ, মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানকে অনুরোধ করে।

শ্রদ্ধেয় বিদ্যুৎ মিত্রের প্রতিটি বই আমার খুব ভাল লেগেছে। ওঁর লেখনিতেও জাদু আছে। আমরা কি ওঁর আরও বই আশা করতে পারি? ওঁকে আমার এই ছোট্ট রিকোয়েস্টটুকু দয়া করে জানিয়ে দেবেন।

'বন্দি রানা' এবং 'হ্যাকার' দিয়ে যে যাত্রা শুরু করেছিলাম ২০১১তে, ২০১৩ তে এসে মাসুদ রানার ৪২৮টি মাইলফলকের ১৫৪টি পার করেছি মাত্র। শুধু কৌতূহলের বসে বই দুটো কিনেছিলাম, কেন সবাই মাসুদ রানার এত ভক্ত? পড়ে বুঝেছি, উত্তর পেয়েছি। কত দুঃসময়ে আপনার এ অনন্য সৃষ্টি যে আমাকে/আদেরদেরকে আনন্দ, সাহস এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, তা শুধু ভাষায় বোঝাবার নয়।

পরিশেষে ক্ষমা চাইছি, এত লম্বা চিঠি লিখেছি, তাও আবার এত দেরি করে। তবে শেষপর্যন্ত লিখতে পেরে খুব ভাল লাগছে। আপনার, মাসুদ রানার এবং সকল পাঠকের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

❋ আপনার চিঠিটা আমার মন ছুঁয়েছে। আমাকে ভাল বলার জন্য নয়, আপনার অনুভূতির গভীরতা উপলব্ধি করে। ধন্যবাদ।

বিপুল কুমার রায়, মোবা: ০১৭৩৬২৬৬৩৮১
১২৯০ ও. আর. নিজাম রোড, মেহেদীবাগ, চট্টগ্রাম।

অনেক কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কী আবার মনে করেন, তাই...

সেবা'র ব্যতিক্রমধর্মী বা ভিন্নধারার প্রয়াস মানবসভ্যতার জন্য এক অনন্য অবদান ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! মানবসভ্যতাকে অনেকেই অনেকভাবে এগিয়ে নেন। কেউ সেটা দেখতে পায়, কেউ পায় না। মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়, সেই চরম আর জটিল সত্যটুকু কে কতটুকু বোঝে, বুঝতে চায়!

কাজীদা, জীবনের মানে অনেকেই খোঁজে, আপনিও খুঁজেছেন নিশ্চয়ই। আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে জীবনের অর্থটা যদি একটু তুলে ধরেন, তাহলে বড্ড খুশি হই।

কাজীদা, আপনার জীবনে সবচেয়ে বড় স্বপ্ন কী ছিল? কতটুকু পূরণ হয়েছে. জানাবেন?

❋ জীবনের কোনও অর্থ নেই। আমার চাওয়া ছিল: সচ্ছলতা (সেজন্যই ব্যবসা) ও মানুষকে আমার ভাল লাগার ভাগ দেয়া (তাই লেখা)। চাওয়ার চেয়ে পাওয়ার পরিমাণ অনেক বেশি।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

০২/০৩/১৪ ডন কুইক্সোট-+ক্যাপ্টেনস কারেজিয়াস

(কিশোর ক্লাসিক ভলিউম) রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ/অনীশ দাস অপু

ডন কুইক্সোট: বীর নাইট ডন কুইক্সোট অভ লা মানচা। হাড় জিরজিরে শরীর, সরু কাঠির মত হাত-পা। প্রায় তাঁরই মত দেখতে তাঁর ঘোড়া—রোজিন্যান্ট। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। যখন দৌড়ায়, মনে হয় এই বুঝি উল্টে পড়ল।

এহেন ঘোড়ায় চেপে দিগ্বিজয়ে বেরোলেন ডন কুইক্সোট। সঙ্গে নিলেন ভুঁড়িঅলা পার্শ্বচর সাংকো পানযাকে। গাধায় চেপে পিছু পিছু চলেছে সে।

একের পর এক রোমহর্ষক বীরত্ব প্রদর্শন করে চললেন অকুতোভয় নাইট—ঝাঁপিয়ে পড়লেন ত্রিশটি দৈত্যের বিরুদ্ধে, নির্যাতিত কিশোরকে রক্ষা করতে এগিয়ে গেলেন, জাদুকরের হাতে বন্দিনী রাজকুমারীকে করলেন উদ্ধার—সব একা!

ক্যাপ্টেন কারেজিয়াস: হার্ভে চেনির বয়স পনেরো। বিরাট কোটিপতি পিতার একমাত্র সন্তান সে। বেপরোয়া, উদ্ধত। ইউরোপে যাচ্ছিল সে তার মাকে নিয়ে। হঠাৎ এক ঝড়ের রাতে জাহাজের ডেক থেকে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পড়ে যায় হার্ভে। তাকে উদ্ধার করে মাছ ধরার একটি জাহাজ। কিন্তু হুমকি-ধামকি দিয়ে বা বাবার ত্রিশ মিলিয়ন ডলার সম্পত্তির গল্প শুনিয়েও জাহাজের লোকদের মন গলাতে ব্যর্থ হয় হার্ভে। বুঝতে পারে, মাছ ধরার দীর্ঘ মৌসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পক্ষে বাড়ি ফেরা সম্ভব হবে না। জাহাজে হাড়ভাঙা খাটুনির চাকরি নিতে বাধ্য করা হয় হার্ভেকে। এক সময় তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে জাহাজের দুঃসাহসী ক্যাপ্টেন ডিস্কো ট্রুপের ছেলে ড্যানের সঙ্গে। ধীরে ধীরে তার সামনে উন্মোচিত হয় সাগর-জীবনের এক অজানা, রোমাঞ্চকর অধ্যায়। বদলে যেতে থাকে হার্ভে চেনি নিজেরই অজান্তে।

আরও আসছে

০৯/০৩/১৪ লোভের ফাঁদে+সামনে বিপদ+ষড়যন্ত্রের জাল

(ওয়েস্টার্ন ভলিউম) কাজী শাহনূর হোসেন/গোলাম মাওলা নঈম/সায়েম সোলায়মান

মাসুদ রানা

আদিম আতঙ্ক

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিখ্যাত প্যালিয়োনটলজিস্ট ডক্টর নাসিম আহমেদের লেকচার শুনতে গ্রেগ রনসন অডিটোরিয়ামে গেল মাসুদ রানা। ভদ্রলোক প্রিয় বন্ধু সোহেলের বড় ভাই। বেশকিছু কথা আগেই শুনেছিল, এবার নিজেই দেখল কোথায় হারিয়ে গেছেন ওদের সেই প্রাণোচ্ছল নাসিম ভাই। ওখানেই প্রথম দেখল ও জাপানি ললনা রূপসী মানামি সিনোসুকাকে। জড়িয়ে গেল ওরা আষ্টেপৃষ্ঠে।

নাসিমের অনুরোধে মস্ত ঝুঁকি নিল রানা। ডুব দিল প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম অঞ্চলে, যেখানে মাউন্ট এভারেস্টকে ছেড়ে দিলে টুপ করে তলিয়ে যাবে। সত্যি কি আছে সেখানে সেই প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী—বিশালকায় হাঙর কারকারোডন মেগালোডন? দেখতে গিয়ে মুশকিল হলো। সাত মাইল নীচ থেকে ওপরে উঠে এল সেই আদিম আতঙ্ক! হাঙর, তিমি কাউকে ছাড়ছে না। শেষে সাবমারসিব্‌ল্‌ সহ কোঁৎ করে গিলে নিল রানাকেই!

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০